শেরপুরের ইতিহাস

(অতীত ও বর্তমান)

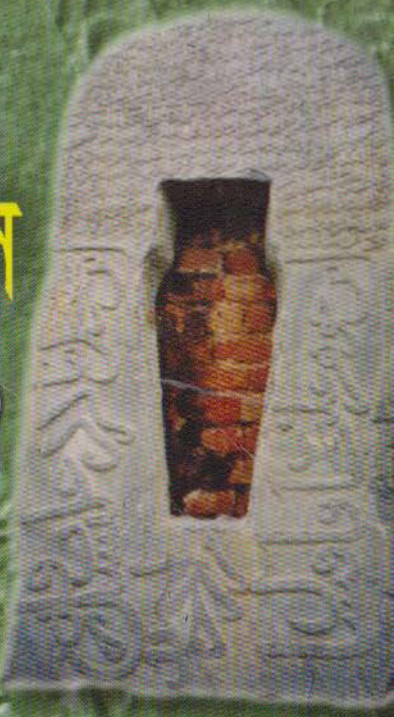

অধ্যক্ষ মুহম্মদ রোস্তম আলী

শেরপুরের ইতিহাস

(অতীত ও বর্তমান)

অধ্যক্ষ মুহম্মদ রোস্তম আলী

প্রকাশিকা

মিসেস সান্‌জিদা আখতার আলী

www.amarboi.org

“দই মিষ্টি ক্ষীরসা
রাজা– বাদশা শেরশাহ্
মসজিদ, মন্দির, মোর্চা ঘর
এ সব মিলেই শেরপুর”

উৎসর্গঃ-

মরহুম পিতা মাতা

ও

শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মন্ডলীকে

প্রকাশনায়ঃ-

মিসেস সান্‌জিদা আখতার আলী
হাম্‌ছায়াপুর পাঠান টোলা,
শেরপুর, বগুড়া, বাংলাদেশ।

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল ঃ- ১৯৯৯ এপ্রিল।

Sherpurer-Itihash

Publisled by- Sanjida Akhtar Ali, Hamchhayapur-Pathan tola,
Sherpur, Bogra, Bangladesh.

প্রচ্ছদ গ্রাফিক্স , বর্ণ বিন্যাস ও মূদ্রণ ঃ
বিমূর্ত প্রকাশনী ও প্রচারণী
থানা মোড় (দো'তলা) বগুড়া। ফোনঃ ০৫১-৭২১৫৬

Cover Graphics Design & Printed by:
Bimuerto Prokashoni & Procharroni, Bogra.
Phone: 051-72156

মূল্য ঃ ১৫০.০০ (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

Price : 150.00 T.K. Only

www.amarboi.org

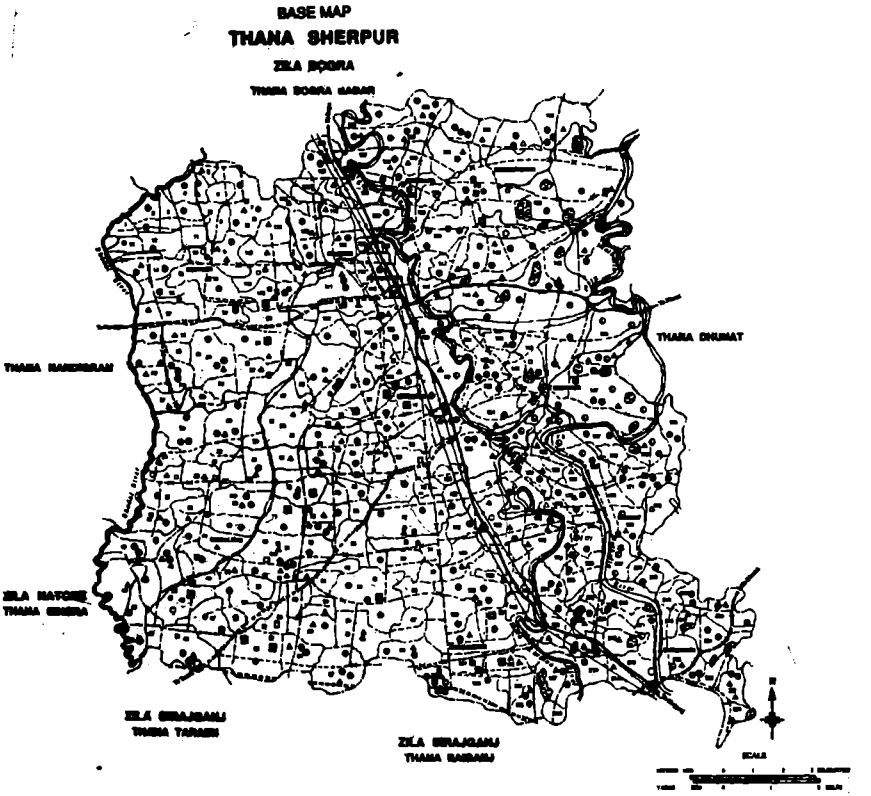

www.amarboi.org

প্রফেসর এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী
এম.এ.পি-এইচ.ডি
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
রাজশাহী,বাংলাদেশ

'শালিমার'
বিনোদপুর বাজার
রাজশাহী
ফোন ঃ ৭৫০০৪১-৪৯/৩৬২ (অফিস)
৭৫০৭৭৯০ (বাসা)
তারিখ ঃ ১৩/৪/৯৯

জনগোষ্ঠীর জীবনধারা ও কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে বিনির্মিত হয় ইতিহাস। যে জাতির ইতিহাস নেই সে জাতির কোন ভবিষ্যত কর্মপন্থা নেই। একটি ইতিহাস সচেতন জাতি বিশ্বে এমন স্থান করে নিতে সক্ষম হয় যা পরবর্তী প্রজন্মের জন্য অনুসরণীয় হয়ে থাকে। একটি দেশ ও জাতির পূর্ণাংগ ইতিহাস রচনা করার ক্ষেত্রে আঞ্চলিক ইতিহাসের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর মধ্যে বগুড়ার প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী।

বগুড়া শহরের ১২ কিলোমিটার উত্তরে মহাস্থান বাংলার প্রাচীন জনপদ পুন্ড্রবর্ধনের রাজধানী শহর হিসেবে এখনও তার কীর্তি ধরে রেখেছে। মহাস্থানের ন্যায় বগুড়া শহরের ২০ কিলোমিটার দক্ষিণে শেরপুরের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত। এই অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক যে সব উপাদান ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সেগুলোকে একত্রিত করতে পারলে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার পথ অনেকটা সহজ হবে বলে আমার বিশ্বাস। তাছাড়া এ অঞ্চলের ঐতিহাসিক কিছু ঘটনা সম্পর্কে যে সব জনশ্রুতি ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে সেগুলোর বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা থেকে ইতিহাসকোষে নতুন তথ্যের সংযোজন অসম্ভব নয়।

আমার প্রাক্তন ছাত্র এবং শেরপুর ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব মুহম্মদ রোস্তম আলী তার বহুদিনের লালিত বাসনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন শেরপুরের ইতিহাস রচনার মধ্যে দিয়ে। তিনি অনেক সময় ধরে উপাত্ত ও উপকরণ সংগ্রহ করেছেন এবং নিরপেক্ষভাবে সেগুলোর বিশ্লেষণ করে শেরপুরের আঞ্চলিক ইতিহাসের একটি অবকাঠামো দাঁড় করিয়েছেন। শেরপুর সম্পর্কে খন্ডিতভাবে এর পূর্বে কিছু কিছু গ্রন্থ রচিত হলেও সেগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য প্রশ্নাতীত নয়। ইতিহাসের একজন বিদগ্ধ ছাত্র হিসেবে জনাব আলী বিষয়সমূহের বিশ্লেষণ, বিন্যাস ও উপস্থাপনে যে পারদর্শিতা দেখিয়েছেন তা প্রশংসার্হ। তাঁর উপস্থাপিত সব মতামতের সাথে কেউ ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, তবে তার বস্তুনিষ্ঠতা প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। গবেষণার পথ রুদ্ধ নয়, বরং নতুন উদঘাটিত উপকরণের আলোকে তা গতিময় হয়ে উঠবে। অধ্যক্ষ রোস্তাম আলীর আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং তার রচিত গ্রন্থের বহুল প্রচার কামনা করি।

স্বাক্ষর

১৩/৪/৯৯
(ডঃ এ.কে.এম. ইয়াকুব আলী)
প্রফেসর
প্রাক্তন সভাপতি,
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ও
ডীন,কলা অনুষদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.amarboi.org

আমার কথা

ইতিহাস রচণা, ইতিহাসের স্বার্থেই- অন্যকোন মতলবে নয়। আকার আয়তনে শেরপুর একটি থানা শহর ব্যতীত নয়,কিন্তু এই টুকু শহর যে মহান ঐতিহ্যধারন করে আছে,তা বিশাল এক গ্রন্থেও সংকুলান হওয়ার কথা নয়। শেরপুর এক সময় ময়মনশাহী পরগনার সদর দপ্তর বা হেড কোয়ার্টার হিসেবে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল। উত্তর বঙ্গের প্রাচীন দিল্লী ও প্রবেশদ্বার নামে খ্যাত ও ঐতিহাসিক ভাবে স্বীকৃত এ শহরের গুরুত্বকে লঘু করে দেখার কোন অবকাশ নেই। পাল, পাঠান সেন-তুর্কান ও মুঘল শাসিত এবং জমিদারঅধ্যুষিত শেরপুর, এক ঐতিহাসিক গবেষণা স্থল ও সূতিকাগার রূপে বিবেচিত। এ স্থানের ইতিহাস গবেষনা কে বিশাল গ্রন্থনায় নিয়ে আসার আগে, যা বিশেষ বিশেষ ভাবে প্রয়োজন, তার অনেক কিছুই বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত। শহরটি যেন অতি প্রাচীন এক বোবা মানুষের মত। নিজে অনুক্ত হেতু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে অপলকনেত্রে। এর আপাদ মস্তকে হাত বুলিয়ে যেটুকু আঁচ অনুমান করা যায় তার বাইরে কল্পনা করা কঠিন। যতদূর সম্ভব, দীর্ঘদিন ঘাটা ঘাটি করে যে সম্ভার টুকু সংগৃহীত হয়েছে তারই আলোকে কলমের আচড়ে সন্নিবেশিত করা হলো এ গ্রন্থনায়। বাল্যকালে শেরপুরের মাটিতে পা রাখতেই এর ঐতিহ্যের কথা, নানান জনের নিকট শুনে স্থানটির ইতিহাস জানার জন্য অনুপ্রানীত হয়ে উঠেছিলাম। ঐতিহ্যময় এ মাটিতে বেড়ে উঠতে উঠতে শেষে, এর ইতিহাস রচণার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। এ অনুভীতিকে নাড়া দেন, ডাঃ আলহাজ্জ কে এম রহমাতুল বারি। প্রাথমিক উপাদান সংগ্রহ করে রচণায় হাত দেই দশ বছর পূর্বে। বগুড়ার সাবেক জেলা প্রশাসক জনাব শহীদুল আলম, একবার পান্ডু লিপি হতে কিংদংশ শুনে খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়েন। তিনি আমাকে শেরপুরের ইতিহাটি প্রকাশ করিতে উপদেশ দেন। বন্ধু মহলের অনেকেই উৎসাহিত করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা যায়নি। ইতিহাসটি রচনা করতে যেসব লেখকের গ্রন্থের সাহায্য গ্রহন করা হয়েছে, তাঁদেক কৃজ্ঞতা নিবেদন করছি। বগুড়া সরকারী আযিযুল হক কলেজের ইসলামি ইতিহাসের সাবেক অধ্যাপক, বন্ধুবর মাহফুজুর রহমান, রচণা কাজে পরামর্শ ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। শেরপুরের তরুণ লিখিয়ে আজিজুল হক বিপ্লব প্রয়োজনীয় কতিপয় ছবি সরবরাহ করে উপকৃত করেছেন। একই ভাবে স্নেহস্পদ তরুণ সাংবাদিক জনাব আব্দুল আলীম মূদ্রণকাজে সহযোগিতা দিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন।

নানান সীমাবদ্ধতার মধ্য দিয়ে গ্রন্থখানা প্রকাশের ব্যবস্থা করা হোল। ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের কোথাও কোথা, ধারাবাহিকতার প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, কিন্তু ছড়ানো ছিটানো তথ্য সমূহ মিলিয়ে দেখলে, তাই প্রশ্নটির জবাব হয়ে যাবে বলে বিশ্বাস করি। রচনা ও প্রকাশ কালের দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ায় কতিপয় বিষয় বাধ্য হয়ে পরিশিষ্টে আনীত হয়েছে। শেরপুরের মুক্তি যুদ্ধের বিষয়টি পৃথক এক অধ্যায়ে চিত্রিত হলো। এখানকার কোন অভিজ্ঞ মুক্তিযোদ্ধা কর্তৃক বিষয়টি উপস্থাপিত হলে হয়তঃ আরও অধিক বিশদ হতে পারতো, কিন্তু ভিন্ন কলমে লিপিবদ্ধ হওয়ায় এ ক্ষেত্রে ঘাটতি থেকে যাওয়া স্বাভাবিক। দামাল মুক্তিযোদ্ধারা, যখন জীবন বাজি রেখে বন বাদাড় আর ঝোপ ঝাড় মাড়িয়ে দেশের আনাচে কানাচে দুরন্ত গতিতে ছুটাছুটি করেছেন, আমরা তখন খাঁচা বদ্ধ পাখীর মত নিভৃতে ছটফট করেছি। কাজেই সেই সীমাবদ্ধতা এখন, রচনা ক্ষেত্রে খানিকটা আলো আঁধারী অবস্থা সৃষ্টি করেছে। শেরপুরের বীর মুক্তিযোদ্ধাদেক বিষয়টি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে অনুরোধ করছি। শেরপুরের ইতিহাস রচনায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সর্ব ক্ষেত্রেই বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ রীতি অচলম্বিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক (Pre- historic) ঘটনাবলী ইতিহাস সিদ্ধ নির্ঘন্ট পর্যন্ত উপনীত করতে কোন গোঁজা মিলের আশ্রয় নেয়া হয়নি। এ ক্ষেত্রে কোন ফাঁক ফোকড় পরিদৃষ্ট হলে, তা ভরাট করা কারুর দায়িত্বেই পড়েনা। শেরপুরে ইসলাম ও মুসলীম আগমন অধ্যায়টি সহজেই অনুমান করা যাবে। এ ক্ষুদ্র ইতিহাস গ্রন্থটি সুধী পাঠকদেক কতটা পরিতৃপ্ত করতে পারবে তা জানিনা। এতে ভুল ভ্রান্তির অবকাশ নেই, একথা ও দাবী করা যায়না। তবে এতদসত্বেও যদি এ ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি কিছুটা হলেও ইতিহাসে স্বাক্ষর বহন করতে পারে, তাতেই স্বার্থ রক্ষা হয়েছে বলে মনে করব।

আল্লাহ হাফিজ।

মুহম্মদ রোস্তম আলী

১৪/০৪/'৯৯

www.amarboi.org

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায়

১। শেরপুর পরিচিতি, প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব ৭-১৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

২। নামকরণ, অধিবাসীদের অবস্থান ও শহরের পরিবর্তিত অবস্থা ১৬-৩০

তৃতীয় অধ্যায়

৩। জমিদার পরিচিতি, জাতি-সম্প্রদায়, পেশা, ইত্যাদি ৩১-৪৪

চতুর্থ অধ্যায়

৪। শেরপুরে ইসলাম ও মুসলিম আগমন, প্রাচীনকীর্তি, মুসলিম পর্বাদি ও মাজার ৪৫-৭০

৫। ভবানীপুর ও ভবানী মন্দির ৭১-৭৪

পঞ্চম অধ্যায়

৬। শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৭৫-৮৯

৭। গ্রন্থাগার, ক্লাব, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ ৯০-১০৬

৬ষ্ঠ অধ্যায়

৮। সমাজনীতি (আমোদ-প্রমোদ, পোশাক-আশাক,সামাজিক অবস্থা ও বিচার-আচার) ১০৭-১১২

৯। সভা-সমিতি, দলীয় রাজনীতি, এলমে দ্বীন ও আলেম সম্প্রদায় ১১৩-১১৭

১০। গণস্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও চিকিৎসক ১১৮-১২০

১১। উৎপন্ন দ্রব্য, হাট-ঘাট, মেলা ও বাণিজ্য ১২০-১২৪

সপ্তম অধ্যায়

১২। পীরপাল, প্রাকৃতিক সম্পদ, আমদানী-রপ্তানী ইত্যাদি ১২৫-১৩১

১৩। সুভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ ও চৌর্য বৃত্তি। ফকির বিদ্রোহ ১৩১-১৪৮

অষ্টম অধ্যায় (পরিশিষ্ট)

১৪। মুক্তিযুদ্ধ ও শেরপুর ১৪৯-১৫৬

১৫। ৪৮'র বগুড়া ১৫৭-১৫৮

১৬। চল্লিশের আগের শেরপুর ১৫৯-১৬২

১৭। শহরায়ন ১৬৩-১৬৮

১৮। গাজি মিয়ার পীরপাল ১৬৯-১৭১

১৯। যমুনা সেতুর আগে ও পরে ১৭২-১৭৫

www.amarboi.org

শেরপুরের ইতিহাস

(অতীত ও বর্তমান)

বিশ্ব ইতিহাস স্রষ্টা মহানরাব্বুল আলামীনের মহান নামে আরম্ভ।

প্রথম অধ্যায়

শেরপুর পরিচিতি প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব

শেরপুর একটি নাম, একটি সনাতন পরিচয়, একটি অতীত চিত্রের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, একটি অভ্রান্ত উপাখ্যান ও সর্বোপরি ইহা এক মহাকালজয়ী ঐতিহাসিক প্রাচীন অধ্যায়। ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত এ নামটি কেবল বগুড়া জেলার অত্র স্থানেই সীমাবদ্ধ নহে বরং এছাড়া ও এ নামটির মাহাত্ম্য ও ঐতিহ্য খুঁজে পাওয়া যায় কাশ্মির, আফগানিস্তান, ভারতের বীরভূম ও বাংলাদেশের সিলেট ও ময়মনশাহী জেলাতে। তবে বৃহত্তর ময়মন শাহীতে অবস্থিত শেরপুর (বর্তমানে জেলা) নামটি নাকি তথাকার তদানীন্তন জমিদার শেরগাজির নামানুসারেই পরিচিহ্নত হয়েছে। যা হোক। যে মহান ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, এনামটির উদ্ভব হয়েছিল, সম্ভবতঃ তিনি হলেন আফগান বালক ফরিদখান। এ বালক বীর পরবর্তীকালে নরখাদক এক বিশালকায় হিংস্র ব্যাঘ্র হত্যা করে, শেরখান নামে অভিহিত হন। এবং এরপর ভারতের স্থায়ী মুক্তি কামনা করে, অগ্রাভিযানে অবতীর্ণ হন। এক পর্যায়ে আত্ম প্রতিষ্ঠা কামী মুঘলবীর হুমায়ুনকে পরাভূত করে, তিনি বিহার উড়িষ্যা, দিল্লী, ও বাংলা মুল্লুকের অবিসংবাদিত বীর ও সুশাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। সেই মহান বীরের সুশাসনে মুগ্ধ হয়ে, তখন বিভিন্ন স্থানের চিন্তাশীল জনগণ, অভিন্ন সুরে তাঁরই নামানুসারে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য স্থানকে ঐতিহাসিক ভাষায় পরিচিহ্নিত করেন, বগুড়া জেলার শেরপুর তম্মধ্যে অন্যতম।

শেরপুর একটি প্রাচীন নাম। এ নামটি আজ হতে প্রায় চারশ বছর পূর্বে ইতিহাসের পাতায় স্থান লাভ করে থাকবে। এর আগে এ স্থানকে যে নামে অভিহিত করা হতো, তা আমাদের জানা নেই। শেরপুরকে "উত্তর বঙ্গের দিল্লী" নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মূলতঃ শেরপুরের প্রাচীনত্ব পুরাতন দিল্লী অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। তবে তথ্যগত অভাবে এর সঠিক প্রাচীনত্ব নিরুপন করা এক সুকঠিন ব্যাপার বটে। খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চিন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন্থ সাং প্রাচীন পৌন্ড্রবর্দ্ধনে কালাতো (Kalato) নামে একটি সুবিশাল নদী অতিক্রম করে আসাম রাজ্যে প্রবেশ করেন বলে জানা যায়। হিউয়েন্থ সাংঘ কর্তৃক উল্লেখিত সেই নদীটিই যে আজকের করতোয়া এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই।

www.amarboi.org

পুরাতন তন্ত্রাদি সূত্রে জানা যায় যে এক সময় করতোয়া নদীদ্বারা বঙ্গ ও আসাম (কামরূপ) পৃথকৃত ছিল। কাজেই অনুমান করা যায় যে, প্রচীন বৌদ্ধ আমল হতেই শেরপুরের ঐতিহাসিক পরিচয় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

সুজলা, সুফলা বাংলার এ অংশটি কোন কালেই অপদানত ছিলনা। সম্পদ আহরণ ও সম্প্রসারণ কল্পে যারাই ভারতের এ অঞ্চলে পদার্পন করেছে, তারাই কমপক্ষে একবার শেরপুর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছে। গোটা উত্তর বঙ্গ যেকালে ঘোড়াঘাট হতে শাসিত হতো তখনও শেরপুরই ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান। ইতিহাসের জ্ঞাত-অজ্ঞাত অনেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীই শেরপুরকে তিলে তিলে শোষণ করেছেন কিন্তু কেউ একে ইতিহাসের পাতায় ধরে রাখার জন্য এত টুকু প্রয়াস পাননি কোন দিন। দিল্লীর সুলতানী আমলে বগুড়া তথা গোটা উত্তর বঙ্গ অনেক বারই সুলতানদের কবলিত হয়েছিল। অভিযান কালে কেউ কেউ শেরপুর ও মহাস্থানকে উপ রাজধানী ও সেনা ছাউনী রূপে ব্যবহার করেছেন। আসাম ও কোচ বিহার অভিযান কালে এ স্থানটি এক শক্তিশালী ঘাটি হিসেবে ব্যবহৃত হতো। কথিত আছে যে আসাম আক্রমণ কালে সেনাপতি মীর জুমলা (১৬৬১) বেশ কিছুদিন শেরপুর ও ভবানীপুরে বিশ্রাম গ্রহন করেন।

শেরপুরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ঢেড় বেশী হলেও এর প্রামাণ্য উপকরণ নিতান্তই কম, কারণ সমগ্র বাংলার ইতিহাসই ছিল কয়েকশ বছর পর্যন্ত উপেক্ষিত ও অনুল্লেখিত। এ সম্পর্কে Inscription of Bengal Volume iv এ জনাব শামছুদ্দীন আহমাদ বলেন" The reason is not far to seek. Not a single contemporary writer had left behind any consistant register of accounts of facts, not do the reigning sovereign of Bengal seen to have maintained state scribes to record the cronicles of their territory."

"অর্থাৎ এর কারণ খুঁজে বের করতে বেশী দুর যেতে হবেনা কারণ, সম সাময়িক কোন লেখকই ঘটনাবলীর কোন বলিষ্ঠ রেকর্ড সংরক্ষণ করেননি এবং রাষ্ট্রের শাসকগণও তাদের লেখকদের দ্বারা শাসিত ভূখন্ডের কোন রেকর্ড পত্র লিখে রাখেননি। রংপুর জেলা গেজেটির্য়াস পাঠে জানা যায়" আসাম, মনিপুর, কাছাড় ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট ও রংপুর জেলা, কামরূপ রাজ্য মধ্যে গণ্য ছিল। করতোয়া নদীটি ছিল কামরূপ রাজ্য ও মৎস্যদেশের (বাঙ্গালার) মধ্যবর্তী সীমানা ও পাবনা বগুড়ার পূর্বাংশ ও ইহার অন্তর্গত ছিল। নদীর পূর্ববর্তী স্থান এক কালে পানিতে নিমজ্জিত ছিল।"

www.amarboi.org

"বঙ্গদেশের গেজেটিয়ার লেখক হান্টার সাহেব বলেন, করতোয়া নদী খাতে পূর্বে একটি অতি বিরাট নদী প্রবাহিত হইত। রাজশাহীর বড়াল নদী পাবনা জেলার হু' ড়া সাগরে পতিত হয় এবং তাহা ব্রহ্মপুত্রের সহিত যুক্ত দেখা যায়।" "খৃঃ ৭ম শতকে চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েস্থ সাং কামরূপে আসেন। তিনি লেখিয়াছেন" কামরূপ তখন একটি ক্ষমতা সম্পন্ন রাজ্য ছিল। ইহাঁর পরিধি ছিল ২০০০ মাইল বিস্তৃত। প্রত্নতত্ব বিদ রমেশ চন্দ্র দত্ত আই সি, এস, এই বিস্তৃত ভূ- ভাগকে আধুনিক আসাম, মনিপুর, কাছাড়, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্টের সমষ্টি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।"

"প্রায় এই সময়ে কামরূপের পাশ্চিম সীমা ছিল বিশাল করতোয়া নদী। তখন বগুড়া, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি- ইত্যাদি জেলার কোন পৃথক পৃথক অস্তিত্ব ছিলনা। ইহার পূর্ব সীমানা ছিল কস্যক গিরিও তীর্থ শ্রেষ্ঠাদীক্ষু নদী ও দক্ষিণ সীমানা ছিল আড়ালিয়া, ঢাকা জেলা এবং ব্রহ্মপুত্র ও লক্ষ্যার সংগমস্থল। সম্ভবতঃ ঢাকা জিলার পূর্বাঞ্চলীয় নিম্নদেশ কামরূপেরই অন্তর্গত ছিল। হিমাচলের পাদবর্তী কক্ষগিরি ছিল কামরূপের উত্তরসীমা"। আমরা আরও জানতে পারি যে, সে আমলে পুন্ড্র বর্দ্ধন বা অনার্য পুন্ড্র রাজ্য, করতোয়া নদীর পশ্চিম তটভূমি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। করতোয়ার পূর্বাঞ্চল ছিল অথৈ সাগরের পানিতে নিমজ্জিত। পুন্ড্রবর্দ্ধন ও কামরূপের মধ্যে নৌপথে মানুষের যাতায়াত ছিল। পুন্ড্রবর্দ্ধনে পাল রাজাদের আমলে এক পূণ্যময় তীর্থ স্থাপিত হয়েছিল। কাল ক্রমে এই তীর্থ মাহাত্মে পুন্ড্র নগরীর নাম মহাস্থান নামে মশহুর হয়ে উঠে।

বাংলার পুরাবৃত্তকার পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় Sir charles lyeli's princles of geology গ্রন্থানুসারে উল্লেখ করেন" ৪৫০০ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশের অধিকাংশ ভূমি সাগরের পানিতে নিমজ্জিত ছিল। পরে বিভিন্ন নদীদ্বারা পলিমাটি রাশি সমুদ্রমুখে পতিত হইয়া প্রথমে উত্তর বঙ্গের দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও পাবনার পশ্চিমাংশ ও অন্যান্য কতিপয় জনপদ গঠিত হয়। উহার বহুশতাব্দী পরে নদীয়া, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা প্রভৃতি জিলা ক্রমশঃ গঠিত হইয়াছে। ময়মনসিং অঞ্চলের সমূদ্র গর্ভ হইতে জাগরনের তখন তো কোন কথাই উঠেনা।"বিদেশগত পর্যটক বৃন্দ যথা এবনে বতুতা, গোয়োস ডি বারোস, যাঁরা বাংলাদেশ সফর করে তৎসংক্রান্ত তদানীন্তন কালের ঘটনা দির যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন, প্রয়োজনের তুলনায় তা একান্তই অপ্রতুল এবং ছিটে ফোঁটা মাত্র। খাজা নিযামুদ্দীন আহমাদ ও মুহম্মদ কাসেম ফিরিস্তা, তাঁদের রচিত তাবাকাতে আকবরী ও তারিখে ফিরিস্তায় সুলতানী আমলের বাংলা সম্পর্কে যে বর্ণনা রেখে গেছেন তা মূল্যবান বটে কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে উহার

www.amarboi.org

যথার্থতা তেমন একটা বিবেচনা যোগ্য নয়। তাছাড়া বাংলা বলতে অধুনা বাংলাদেশ ও ভারতীয় পশ্চিম বাংলা পর্যন্ত সীমিত হলেও একটা কথাছিল। বস্তুতঃ তদানীন্তন বাংলা বলতে উভয় বাংলা ছাড়াও আসাম, ত্রিপুরা, উড়িষ্যা ও বিহারের কিয়দংশ ইহার অন্তর্ভূক্ত ছিল।

বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের লেখক জনাব ফজলুল হাসান ইউসফ উল্লেখ করেন যে, যুগে যুগে বাংলাদেশের আয়তন বদলাচ্ছে। এমন এক সময় ছিল যখন বাংলাদেশ বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও পশ্চিম বাংলার সবটুকু নিয়ে বাংলাদেশ বুঝাতো। আবার কখনো বাংলাদেশ বল্‌তে সমতট, রাঢ়, পুন্ড্র বর্দ্ধন, গৌড় ও তাম্র লিপ্তি রাজ্য বুঝাতো। মহাভারতের যুগে বাংলাদেশ মোদাগিরি, পুন্ড্র, কৌশিকী কচ্ছ, সুম্ম, প্রসুম্ম, বঙ্গ ও তাম্রলিপ্তি এসব বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। গুপ্ত সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজত্ব কালে বঙ্গ রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। সপ্তম শতাব্দীতে কর্ন ও সুর্বন রাজা শশাংক বঙ্গ রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করেন। ইউয়ান চোঙ্গের বর্ননায় দেখা যায়, তখনকার বঙ্গ রাজ্য কামরূপ, পুন্ড্র বর্দ্ধন, কর্ন, সুবর্ন, সমতট, তাম্রলিপ্তি, এ পাঁচ ভাগে বিভক্ত ছিল। বল্লাল সেনের সময় বঙ্গরাজ্য মিথিলা, রাঢ় (পশ্চিম বঙ্গ) বরেন্দ্র (উত্তর বঙ্গ– বাগড়ি বা বকদ্বীপ (মধ্য ও দক্ষিন বঙ্গ) ও বঙ্গ (পূর্ব বঙ্গ) এ পাঁচটি ভাগে বিভক্ত ছিল। মুসলমান আমলে সুবে বাংলা, সাতগাঁও, খলিফা বাদ, মাহমুদাবাদ, ফতেহাবাদ প্রভৃতি আঠারটি সরকার বা বিভাগের বিভক্ত ছিল।

বাংলার নাম করণ সম্পর্কে "বাংলাদেশে ইসলাম" গ্রন্থ প্রনেতা জনাব আব্দুল মান্নান তালেব (পৃ.১৩) উল্লেখ করেন "বাংলার সমগ্র জনপদ বিভিন্ন নামে ও বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলোকে একত্রিত করে বাংলা নাম করণ মাত্র কয়েকশত বছর আগের ঘটনা। মুসলমান শাসনামলেই সর্ব প্রথম এ সমগ্র এলাকাকে বাংলা বা বাঙ্গালা নামে অভিহিত করা হয়।

--- হিন্দের পুত্র বং (বঙ্গ) এর সন্তানেরা বাংলায় বসতি স্থাপন করেন। বং এর সংগে 'আল' শব্দ যোগ হওয়ার কারণ হচ্ছেঃ বাংলা ভাষায় 'আল'অর্থ বাঁধ। যাতে বন্যার পানি বাগানে অথবা আবাদী জমিতে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্য জমির চারিদিকে বাঁধ দেয়া হতো। প্রাচীন কালে বাংলার প্রধানেরা পাহাড়ের পাদদেশে নীচু জমিতে দশহাত "উচু ও কুড়িহাত চওড়া স্তূপ তৈরী করে তার উপর বাড়ী নির্মাণ ও চাষাবাদ করতেন। লোকেরা এগুলোকে বলতো বাঙ্গালা।

"রিয়াযুস সালাতীন" লেখকের এ বর্ননার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য কতটুকু নিহিত রয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও, এ দেশের আদিম অধিবাসীরা যে সেমিটিক দ্রাবিড় এবং মধ্য এশিয়া থেকেই তাদের আগমন ঘটেছিল, উপরন্ত

www.amarboi.org

বাংলায় আর্যদের অনুপ্রবেশ যে বহু পরবর্তী কালের ঘটনা এ সম্পর্কে ঐতিহাসিগণ একমত। কাজেই বং বা বঙ্গ থেকেই যে বঙ্গাল,বঙ্গালা ও বাংলা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য সেমিটিক ভাষায় 'আল' অর্থ আওলাদ, সন্তান সন্ততি ও বংশধর। এ অর্থে (বং+আল) বঙাল বা বঙ্গাল (অর্থাৎ বং এর বংশধর) শব্দের উৎপত্তি টাকে নেহায়েত উড়িয়ে দেয়া যায়না। বিশেষ করে খ্রীষ্টীব্দ ৮ম শতকে বা এর পূর্বে থেকে বঙ্গাল নামে একটি পৃথক দেশের উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এদেশটি দক্ষিণ সমূদ্রের নিকট বর্তীছিল। হতে পারে, এ দেশের অধিবাসীরা বং এর যথার্থ আওলাদ হবার দাবী দার ছিল। সম্রাট আকবরের শাসনামলে সমগ্র বাংলাদেশ সুবাই বাংগালাহ্ নামে পরিচিত হয়। ফার্সী বাঙ্গালাহ্ থেকে পতূগীজ BENGALA বা PENGALA এবং BENGAL শব্দের উৎপত্তি। বাংলা নামকরণ সম্পর্কে আবুল ফজল তাঁর আইনে আকবরী গ্রন্থে বলেছেন, এ দেশের প্রাচীন নাম বঙ্গ এবং এদেশের লোকেরা জমিতে উচু আল বেঁধে বন্যার পানি থেকে জমি রক্ষা করতো। সময়ের ব্যবধানে আল শব্দটি দেশের নামের সাথে যুক্ত হয়ে যায়। এভাবে (বঙ্গ + আল) বঙ্গাল শব্দের উৎপত্তি হয়।

রিয়াযুস্সালাতীন গ্রন্থ প্রনেতা ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন সলীম তাঁর গ্রন্থে বাংলা নামের উৎপত্তি সম্পর্কে ইতিহাসের এক অজ্ঞাত অধ্যায়ের উল্লেখ করেছেন। হযরত নূহ আলাইহিস্ সালামের যুগে যে মহা প্লাবন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে দুনিয়ার কাফের কুল সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। হযরত নূহ (আঃ) এর সাথে তাঁর অনুসারী মুষ্টিমেয় মুসলমানরাই রক্ষা পেয়ে যান। পরবর্তী কালে তাদের সাহায্যেই পুররায় দুনিয়ায় মনুষ্য বসতি শুরু হয়। এ মহা প্লাবনের পর হযরত নূহ (আঃ) এর পুত্র হাম, তাঁর মহান পিতার অনুমতি নিয়ে (পৃথিবীর) দক্ষিণ দিকে মনুষ্য বসতি স্থাপনের মনস্থ করেন। এই উদ্দেশ্য কার্যকর করার জন্য তিনি পুত্রদের দিকে দিকে প্রেরক করতে থাকেন। হামের প্রথম পুত্রে নাম হিন্দ, দ্বিতীয় পুত্রের নাম সিন্ধ, তৃতীয়ের হাবাস ও চতুর্থের জানায পঞ্চমের বার্বার এবং ষষ্টের নাম নিউবাহ্। যে সব অঞ্চলে তারা উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁদের নামানুসারেই সে সব অঞ্চলের নামকরণ করা হয়।, ------ হিন্দের চারপুত্র ছিল। প্রথম পুরব, দ্বিতীয় বং, তৃতীয়, দখিন, চতুর্থ নাহার।

আজকের শেরপুর, এক মহানগরীর স্মৃতি বিজড়িত একটি পরিত্যক্ত খন্ড উপশহর মাত্র। পূর্বে এটি ছিল ধনে জনে পরিপূর্ণ এক বিশাল নগরী। অতীতে এ জনপদের প্রশংসায় মুখরিত ছিল সারাটি গাংগেয় (সাবেক বাংলা) সমগ্র বঙ্গ ভূমি। এ নগরীর খোশ নাম ছড়িয়ে পড়েছিল পাক-ভারত বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে, দক্ষিণ ভারতের মালয়ে, সুমাত্রায় জাভায়, ব্রহ্মদেশ শ্যাম আর সিংহলের মত দূর দুরান্তরের দেশে, এমনকি পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তেও শেরপুরের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে

www.amarboi.org

আজকের ক্ষীণ স্রোতা করতোয়া, কিন্তু আদিতে ছিল এটি খরস্রোতা। কথিত আছে যে অধুনা বাবদুয়ারী ঘাট এককালে আন্তর্জাতিক মহানদী বন্দর রূপে বিবেচিত হতো। সেকালে এ নদীটির বিস্তৃতি ছিল এখান হতে মেহমানশাহীর শেরপুর পর্যন্ত প্রসারিত। এ নদী দিয়ে বানিজ্য তরী মালায় সিংহল, সুমাত্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করতো। তেমনি এর বিশাল ঘাটে এসে ভিড়তো ভিন দেশের রকমারি বাণিজ্য তরী।

কেউ জানেনা এ নগরটি কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে আজকের বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলা গুলো যে পুর্বকালে, প্রাচীন পৌন্ড্র বর্দ্ধনের অধীন ছিল তাতে দ্বিমতের, কোন অবকাশ নেই। পৌন্ড্রগণ ছিলেন এ বিশাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং এরা ছিলেন বিশ্বা মিত্রের সন্তান। বেদের অন্তর্গত শতপথ ব্রাহ্মণ পাঠে জানা যায় যে, সদানীরা নদী পর্যন্ত আর্য সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। সম্ভবতঃ বৈদিক, সদানীরাই, পরবর্তীকালে খরস্রোতা এবং অতঃপর করতোয়া নামে অভিহিত হয়ে থাকবে। এ প্রসঙ্গে ভারতে আর্য সভ্যতার বিস্তৃতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা উচিত মনে করি। অনেকে ঢালাওভাবে বৈদিক ও পুরাণ যুগের নামে আর্য সভ্যতাকে ফলাও করে দেখাতে প্রয়াস পান। কিন্তু বাস্তব প্রস্তাবে, ভারতে অনুপ্রবিষ্ট আর্য সভ্যতার নিজস্ব কোন স্বাতন্ত্র নেই। অপরাপর প্রাচীন জাতির প্রচলিত সভ্যতার স্কন্ধে ভর করে, যাযাবরেরা এখানে আগমন করে। এবং পরগাছার মত ভারতীয় জনমানবের রসে কষে প্রতিপালিত হয়ে, সমাজে একটা স্থান করে নেয়। এ বক্তব্যের অনুকূলে জনাব আব্দুল মতীন সাহের লিখিত "পৌন্ড্র বর্দ্ধনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য" প্রবন্ধের অংশ বিশেষ উল্লেখ করছি। "ভারতে আর্য্যসভ্যতার বয়স কত, তা নিয়ে যথেষ্ট মতদ্বৈধতা আছে। ভারতীয় আর্য সভ্যতার বয়স সম্ভবতঃ তিন হাজার বছরের বেশী হবেনা। তবে প্রাচ্য তত্ত্ববিদদের কেউ কেউ বয়সটা কে আরো পিছনের দিকে নিয়ে যেতে চান এবং খৃষ্টপূর্ব পাঁচ থেকে ছয় হাজার আগে এই সভ্যতার উম্মেষ কাল হিসেবে ধার্য করতে চান। অবশ্য আর্য সভ্যতার বয়স নির্ণয় ব্যাপারে তাঁদের প্রধানতম অবলম্বন "বেদ এবং পুরাণ" বিশেষ করে পুরাণ গুলোকেই প্রধানতম নিরিখ হিসাবে ধরে নিয়ে তারা আর্য সভ্যতার উম্মেষ কাল নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছেন এবং পুরানাশ্রয়ী গবেষণা থেকে সিদ্ধান্তে এসেছেন- ভারতে আর্য্য সভ্যতার উম্মেষ খৃষ্টের ছয়, থেকে সাত হাজার বছর আগেকার ঘটনা। এভাবে আর্য সভ্যতাকে প্রাগৈতিহাসিক যুগের দ্বার প্রান্তে ঠেলে দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করা হচ্ছে। "ভারতীয় আর্য সভ্যতা" পৃথিবীর সব চাইতে পুরাতন সভ্যতা এবং দুনিয়া তাবৎ প্রাচীন সভ্যতা তথাকথিত ভারতীয় আর্য সভ্যতার কাছে নানা ভাবে ঋণী।

www.amarboi.org

পৃথিবীর অন্য সকল সভ্যতাকে এই আর্য সভ্যতা লালন করেছে। গুরু মশাই গিরি করে সাবালক করে তুলেছে। কথাটা অন্তঃসার শূন্য হলেও শুন্‌তে মন্দ শোনায়না, অন্ততঃ রক্ত কৌলিন্যবাদ প্রতিষ্টিত করবার ব্যাপারে এ মতবাদের কার্যকারিতা মোক্ষম এবং আধুনিক কালে উগ্র ন্যাশনালিজ্‌ম যে প্রধান অবলম্বন একথা বলা বাহুল্য।

ভারতে আর্যদের আগমন"বর্বর মানব গোষ্ঠী" হিসাবে। যাযাবর আর্যরা যা দেখেছে তাই ধ্বংস করেছে, যা হাতে পেয়েছে, তাই চুরমার করেছে, নয় ছয় করে দিয়েছে। সভ্যতার ক্ষেত্রে তাদের প্রাথমিক অবদান এটাই। ভারতে "আর্য ভিন্ন" সভ্যতা গুলির ওপর তাদের যে সামরিক বিজয় তা দেখে তাদেরকে অপেক্ষাকৃত সভ্য বলে মনে করবার কোন উপায় নাই। ------- এভাবে বর্বর আক্রমন কারীর হাতে আক্রান্ত সভ্য সমাজের পরাজয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে নতূন কোন ঘটনা নয়। শক,হুন, পল্লব, উয়ুচি, কুশান, দরদ, পারদ ইত্যাদি বর্বর আক্রমন কারীদের হাতে বারবার রাষ্ট্র সমূহের পরাজয় তার অজস্র নিদর্শন।---- --- প্রাথমিক পর্যয়ে আর্যরা ভারতের বুকে মাত্র সামরিক বিজয় লাভই করেছিল। কিন্তু সভ্যতার ক্ষেত্রে তারাই আবার তাদের বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বিদের কাছে চরম ভাবে হেরে গিয়ে বিজিত প্রতিদ্বন্দ্বিদের কাছ থেকে সভ্যতার পাঠ গ্রহন করতে শুরু করে। বৈদিক যুগ থেকেই তার সূচনা (অর্থব বেদে তার ভুরি ভুরি নিদর্শন পাওয়া যাবে) আর পৌরাণিক যুগে তার ব্যাপক বিস্তার। সঠিক ভাবে বল্‌তে গেলে বলতে হয়, পৌরাণিক যুগটা হচ্ছে নির্বিচারে গ্রহন এবং আত্মসাতের যুগ। তবে রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা তাদের করায়ত্ত থাকায় যা কিছু তারা গ্রহন করেছে, তাকেই তারা নিজেদের সম্পতি, নিজেদের অবদান বলে জারি করবার সুযোগটা পেয়েছে। ঋগ্বেদের সাক্ষ্য থেকেই দেখা যায়, যাযাবর আর্যরা (আর্যশব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ গমন কারী বা যাযাবার) ভারতে আগমন করবার পর পনি (ফনিসিয়) রুম, রুশম, শ্যাবক, অজ, গঙ্গু, শিগ্র, বক্ষু, কৃপ, কপি, গান্ধার প্রভৃতি সুসভ্য জাতির সংস্পর্শে এসেছিল। আর এদের সাথে সহস্র সংঘর্ষ সত্বেও এদের কাছ থেকে সভ্যতার পাঠ গ্রহন করেছে ব্যাপক ভাবে। উল্লেখিত জাতি গুলি ছাড়াও যাদেরকে তারা রাক্ষস, অসুর দুস্য, পিশাচ, বৃক্ষ, কপি ইত্যাদি বিশেষণে আখ্যায়িত করেছে" শিশ্র; দেবায়' বলে যাদেরকে বিদ্রুপ করেছে, তাদের কাছ থেকে যে, কি ব্যাপক হারে সভ্যতার পাঠ গ্রহন করেছে, তার সম্যক পরিচয় প্রদান বক্ষ্যমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। -------- আপাতত;

www.amarboi.org

এইটুকুই যথেষ্ট যে, আর্য সভ্যতা বলে কোন বিশিষ্ট সভ্যতার আস্তিত্ব ভারতে ছিলনা। তবে তদানীন্তন ভারতের এবং ভারতের বাইরে, বিভিন্ন নব গোষ্ঠীর বিভিন্ন সভ্যতার অবদান এবং অপদান (যেমন লীঙ্গপুজা, পশুপূজা, সর্পপূজা, পাথর পূজা, প্রেতগূজা, বৃক্ষপূজা নদনদী পূজা, এক কথায়, প্যাগানিজমে একটা উৎকট সমাহার সৃষ্টি করে নিজেদের জীবন চর্চায় তাকেই ব্যাপকভাবে গ্রহণ করা) গুলির সমন্বয়ে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য মতবাদ যে একটা উৎকট সিনথিসেস (হজপচ সিনথিসিস) সৃষ্টি করেছিল, তাকেই যদি আর্যসভ্যতা বলে কেহ আত্ম প্রসাদ লাভ করতে চান, তবে সে কথা আলাদা।"

অধুনা উত্তর বঙ্গ আদিকাল হতে আদি শূরের আমল পর্যন্ত পৌন্ড্রবর্দ্ধন নামেই পরিচিত ছিল। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে আদিশূর জয়ন্ত যখন, পঞ্চ গৌড়ের অধিশ্বর হন, তখন হতে পৌন্ড্রদের পরিবর্তে গৌড় দেশ নামে অভিহিত হয়। কিন্তু রাজধানী পৌন্ড্রবর্দ্ধনেই থেকে যায়। অতঃপর তদ্বংশীয় রাজা প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর যখন একই সময়ে রাজত্ব লাভ করেন, তখন গৌড়দেশ দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। বরেন্দ্র শূরের অধিকৃত খন্ডের নামকরন হয়, বরেন্দ্র দেশ এবং এই অংশেই আমাদের আলোচ্য শেরপুর অবস্থিত। সেকালে মহানন্দা নদীর পূর্বকূল হতে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত বরেন্দ্র নামে অভিহিত হতো। অধুনা রাজশাহী জেলার গোদা গাড়ি থানাধীন দেব পাড়া গ্রামের সন্নিকট অবস্থিত বারিন্দা নামক স্থানে, রাজা বরেন্দ্র শূরের রাজধানী ছিল বলে অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ বরেন্দ্র শূরের বংশধরগণ পরবর্তীকালে, নাটোরে রাজধানী স্থানান্তরিত করে থাকবেন। তবে পাল বংশীয় নৃপতিদের রাজধানী বরাবর পোন্ড্র বর্দ্ধনেই ছিল বলে জানা যায়। ইতিহাস পাঠে আরও জানা যায় যে পরবর্তী কালে মহারাজ ধর্মপাল, ভূশুরকে পরাজিত করে পোন্ড্র বর্দ্ধন দখল করেন। এক্ষণে আমরা তানীন্তন কালে পদ্মার উত্তরে তিন জন রাজাকে একই সময় রাজত্ব করতে দেখতে পাই, ভূ-শূরের চারি পুরুষ অধঃস্তন প্রদ্যুম্ন শূরকে গৌড়ে, বরেন্দ্রশূরকে বরেন্দ্রে এবং পাল বংশীয় কোন নৃপতিকে পৌন্ড্র বর্দ্ধনে। উল্লেখিত বর্ণনা হতে অনুমান করা যায় যে, উত্তর বঙ্গের উত্তর ও পশ্চিমাংশ পালবংশের, দক্ষিণ পশ্চিমাংশ প্রদ্যুম্ন শূরের এবং দক্ষিণ পূর্বাংশ বরেন্দ্র শূরের অধিকারে ছিল। অতএব, আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে তৎকালে বগুড়া জেলার দক্ষিণাংশ কোন ক্রমেই পাল শাসনভুক্ত হয়নি। বরং উহা বরেন্দ্র শূরেরই অধিকারে ছিল। বিশ্বকোষের বর্ণনা মতে ভূশুর, রাজ্যচ্যুৎ হয়ে রাঢ় দেশে পালিয়ে যান। কিন্তু ইতিহাস সূত্রে প্রকাশ যে ভূ-শূরের চার পুরুষ

www.amarboi.org

অধঃস্তন দ্রদ্যুম্ন এবং বরেন্দ্রশূর উত্তর বঙ্গে স্বাধীনভাবে দীর্ঘ দিন রাজত্ব করেন। অতএব, বুঝা যাচ্ছে যে ভূ-শূর সাময়িক ভাবে উত্তর বঙ্গ পরিত্যাগ করলেও তার বংশধরেরা পুনরায় এখানেই প্রতিষ্ঠালাভ করতে সমর্থ হন।

কথিত আছে যে, মুসলমান শাসনের পূর্ব পর্যন্ত এ প্রদেশটি বরেন্দ্র নামেই অভিহিত হতো। কিন্তু মুসলমান আমলে এটি ভাতুড়িয়া নামে চিহ্নিত হয়। পশ্চিমে মহানন্দা ও পূনর্ভবা, দক্ষিনে গংগা, পূর্বে করতোয়া এবং উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট ইহাই ছিল চাকলে ভাতুড়িয়ার পরিসীমা। প্রকাশ থাকে যে, এক সময় রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর,দিনাজপুর, তথা গোটা উত্তর বঙ্গই ঘোড়াঘাট নামে অভিহিত হতো।

বর্ণিত আছে যে, বরেন্দ্র ব্রাহ্মণ বংশ সম্ভূত রাজাগনেশ গৌড় জয় করতঃ গৌড় সিংহাসন লাভ করেন। পরবর্তী সময় উক্ত ব্রাহ্মণ বংশীয় সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ এবং তৎপর তার পত্নী শর্বানী দেবী পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করে বসেন। রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ইহা নাটোরের রাজ বংশের পূর্ব রঘূনন্দের হস্তগত হয়। তদানীন্তন চাকলে ভাতুড়িয়া, ত্রিশটি পরগনা যোগে গঠিত এবং তিনটি তপ্পায় বিভক্ত ছিল, যথা, বিয়াস, কুসুম্বি, চাপিলা, তিন তপ্পে ভাতুড়িয়া। সম্রাট আকবরের আমলে (১৫৫৬-১৬০৬) চাকলে ভাতুড়িয়া সরকার বাজুহার অন্তর্ভূক্ত ছিল। প্রসাশন ব্যবস্থার সুবিধার্তে তৎকালে মৌজার সমষ্টিতে ডিহি, ডিহির সমষ্টিতে পরগনা, পরগনার সমষ্টিতে তপ্পা, তপ্পার সমষ্টিতে সুবা গঠিত হতো।

তদানীন্তন প্রশাসনিক শ্রেণী বিন্যাস মতে নিম্নে বর্ণিত ক্রম বিভাগ করলে শেরপুর গ্রামে পৌছানো যাবেঃ-

সুবে	বাংলা
সরকার	বাজুহা
চাকলে	ভাতুড়িয়া
তপ্পে	বিয়াস
পরগনে	মেহ্মানশাহী
ডিহি	সৈয়দপুর ও উলিপুর
কসবা	সৈয়দপুর তরফ, শ্রীরামপুর, ইত্যাদি।

শেরপুর

(রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, বিশেষ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)

www.amarboi.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

নামকরণ, অধিবাসীদের অবস্থান ও শহরের পরিবর্তিত অবস্থা

যে কোন ঐতিহাসিক স্থানের নামকরণ ও আর একটি অভিন্ন ইতিহাস বটে। তবে নামটিই ইতিহাসের সব কিছু নয়, কারণ, ইতিহাসের রয়েছে নিজস্ব এক পূর্নাঙ্গ অবয়ব আর নামটি হলো ইহার ধারক মাত্র। নামকরণের এই কথাটি শেরপুরের ক্ষেত্রেও একই ভাবে প্রযোজ্য।

শেরপুর নাম করনের পেছনে রয়েছে মজবুত ঐতিহাসিক ভিত্তি। বাস্তবে নামকরণ অপেক্ষা ইহার ঐতিহ্যই যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং সুপ্রাচীন এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সেই প্রাচীনত্বটি খুঁজে বেরকরা কেবল দুঃসাধ্যই নয়, বরং রীতমত এক অসম্ভব ব্যাপার। অধুনা শেরপুর অপেক্ষা প্রাগৈতিহাসিক শেরপুর ছিল সর্বাধিক সুপ্রসিদ্ধ। নাম করনের পূর্বেও এ স্থানটি তার নিজস্ব মহিমায় ছিল মূর্তমান। প্রাগৈতিহাসিক এই স্থানটির ভিন্ন কোন কোন নাম ছিল কি-না, তা বলা কঠিন। তবে সেই অজ্ঞাত যুগে যদি স্থানটি উত্তর বঙ্গের প্রবেশদ্বার অথবা বরেন্দ্র তিলক নামে অভিহিত করা হতো, তবে মোটেই বেমানান হতোনা নিশ্চয়।

অনুমিত হয় যে, এক সময়, বাংলাদেশের দক্ষিণাংশ ছিল সম্পূর্ণ রূপে বঙ্গোপসাগরের অতল গর্ভে নিমজ্জিত। বঙ্গোপসাগরের মোহনা হয়তঃ তখন শেরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিন্তু তাই বলে এর সর্বাংশ গ্রাস করতে পারেনি সাগর মোহনা। কথিত আছে যে, সমূদ্র মোহনা পরবর্তী কালে পিছু হট্‌তে হট্‌তে চট্টলাও খুলনা পর্যন্ত সীমিত হয়ে পড়ে এবংএই সুবাদে রাজশাহী জেলার সিংড়া হতে শুরু করে পাবনা পর্যন্ত অংশটুকু ঐতিহাসিক চলনবিল নামে অবশিষ্ট থেকে যায়।

প্রয়োজনের তাগিদেই নাম করনের প্রচলন বটে। সাধারনতঃ স্থানের গুরুত্ব অনুসারেই উহার নামটি স্থিরীকৃত হয়ে থাকে। শেরপুর, অন্য কোন ভিন্ন নামে অভিহিত হলে সেইটি এ স্থানের গুরুত্বের সহিত সংগতিপূর্ণ হতো কিনা সন্দেহ। স্থানটির আরও অধিক প্রাচীন কোন নাম পাওয়া গেলে, ঐতিহাসিক ভিত্তি রচণা করতে অবশ্যই সুবিধা সৃষ্টি হতো বটে- কিন্তু ঘটনাক্রমে নাম করনটি আরও পিছিয়ে থাকলে ইতিহাসের সূত্রগুলো আরও অস্পষ্ট হয়ে উঠতো বই কী? অবস্থানগত ভাবে স্থানটি এক সীমিত খন্ড বই নহে, কিন্তু ঐতিহ্যগত ভাবে ইহা যেন নিজেই এক অখন্ড উত্তর বঙ্গ আর কী? কারণ, অখন্ড উত্তর বঙ্গ বল্‌তে এক

www.amarboi.org

সময় শেরপুর, ঘোড়া ঘাট, আর রাজশাহী কেই বুঝানো হতো। তাছাড়া শেরপুর তখন উত্তর বঙ্গের একমাত্র প্রবেশদ্বার বলে বিবেচিত এবং উত্তর বঙ্গের উত্তর সীমান্ত পর্যন্ত উপনীত হতে হলে তখনকার দিনে শেরপুরের রাস্তা ধরেই অগ্রসর হতে হতো। বরেন্দ্রভূমির অন্যতম অংশ হিসেবে, শেরপুরের একটা স্বতন্ত্র পরিচিতি ছিল। অধুনা বার দুয়ারী ঘাট যেকালে মহানদী বন্দর রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেছিল, প্রাচীন শেরপুর নগরী ছিল তখন, বিশ্ব মানচিত্রের এক উল্লেখযোগ্য নাম।

অবস্থানগত ভাবে শেরপুরের আর একটি বিশেষ দিক এই যে, করতোয়া নদীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ইহার পাললিক অংশে প্রাচীন কালের কোনই কীর্তি মাত্র নেই। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যেন, তৎকালে পাললিক অঞ্চলটি জলা ভূমিতে পরিনত থাকায় কেবলমাত্র করতোয়া নদীর পাশ্চিম পার্শ্বস্থ লালমাটির বরেন্দ্র অঞ্চলটিই ইহার মুখ্য অংশ রূপে বিবেচিত হতো। আর তাই প্রাচীন কীর্তি সমূহ কেবল অত্র অঞ্চলকে ঘিরেই গড়ে উঠেছিল।

আরও ধরে নেয়া যেতে পারে যে, বৌদ্ধ আমলে এবং তারও পূর্বে শেরপুরের প্রশাসনিক অবস্থান বর্তমান স্থলের পরিবর্তে এখান হতে প্রায় ছ' মাইল পশ্চিমে জামুর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। প্রমান স্বরূপ প্রাচীন জামুর ধাপও দারু গ্রামে অবস্থিত পুরাকীর্তি সমূহের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া বিশাল পুরের অদুরে অবস্থিত পুরাকীর্তি গুলি ইহার সাক্ষ্য বহন করে। সম্ভবতঃ সেকালে অধুনা শেরপুর কেবল এককভাবে প্রখ্যাত নদীবন্দর রূপেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল, আর এর দূরবর্তী অংশে গড়ে উঠেছিল প্রশাসনিক কর্মস্থল।

শেরপুর নামটিই এর সঠিক ঐতিহ্যের অন্যতম প্রকাশক। এ নামটি অবিতর্কিত হলেও এ সম্পর্কে অল্প বিস্তর আলোচনা ও পর্যালোচনা অবকাশ আছে বই কী? আমাদের এই উপমহাদেশের উল্লেখযোগ্য অনেক ক'টি স্থানই শেরপুর নামে ইতিহাসে স্থান লাভ করেছে বহুযুগে পূর্বে। অন্যত্র যে কারনেই হোক, তবে উত্তর বঙ্গের বগুড়া জেলায় অবস্থিত ঐতিহাসিক শেরপুর নগর যে সম্রাট শেরশাহের নামেই পরিচিহ্নিত ও প্রবর্তিত হয়েছিল এতে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। আমরা জানিযে, পাঠান নৃপতি শেরশাহ শূরী ছিলেন এক অবিসংবাদিত ও পরম জনপ্রিয় সম্রাট। বাংলার জনগণ তাঁর প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। সীমিত সময়ের মধ্যে তিনি এখানকার জনগনের কল্যানার্থ অনেক অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। এজন্যই তার সুনামের নজরানা হিসেবে বগুড়া জেলায় এ স্থানটি শেরপুর নামে পরিচিহ্নিত হয়েছে। তদানীন্তন বাংলার পূর্তগীজ গভর্নর ভনডেন ব্রুক কর্তৃক বিরচিত বঙ্গ ভূমির মানচিত্রে, তিনি শেরপুরকে Ceerpoor Mirt অর্থাৎ

www.amarboi.org

sherpur Murcha নামে উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া সমসাময়িক অপরাপর ঐতিহাসিকগন ও এ স্থানটিকে শেরপুর নামেই উল্লেখ করেছেন। সম্ভবতঃ ১৫৪০-১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময় এ স্থানটির নাম করণ হয়ে থাকবে। ঐতিহাসিকগণ অনুমান করেন যে, শেরশাহ অথবা তাঁর কোন সেনাপতি এই নামটি প্রবর্তন করে থাকবেন। কেউ কেউ অনুমান করেনযে 'সির'শব্দ হতে শেরপুর নামের উৎপত্তি হয়েছে। মধ্য যুগীয় অনেক গ্রন্থে শেরপুরের স্থলে সেরপুর উল্লেখিত হয়েছে। সম্ভবত তারা 'সির' শব্দকেই অনুসরণ করে থাকবেন। কারণ, হযরত শাহ্ তুরকান শহীদের সির বা মস্তক এখানেই সমাধিস্থ হয়েছে এবং শেরপুরের মুসলীম ইতিহাসে তা যে কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা অপেক্ষা বহু গুণে গুরুত্বপূর্ণ। নাম করণের পরবর্তী কারণটি উল্লেখযোগ্য হলেও আদৌ গ্রহন যোগ্য নয়। কারন, 'সির'শব্দটির রূপান্তর সিরমোকাম ও সেরুয়া গ্রামের নামেই সীমাবদ্ধ, এর বাইরে নয়। অন্যকথায় শেরপুর নামের উৎপত্তি অন্য কোন শব্দ হতে হয়নি বরং হয়েছে শেরশাহ এবং একমাত্র শেরশাহ্ নাম হতেই।

শেরপুর অংশে ঐতিহাসিক করতোয়া নদী (বর্ষাকালে)

আমরা জান্তে পাই যে, মেহমানশাহী জেলায় অবস্থিত শেরপুর (বর্তমান জেলা) হতে আলোচ্য শেরপুরকে পৃথক করে দেখানোর জন্য প্রথমোক্তটি দশকাহনিয়া ও দ্বিতীয়টি মোরচা শেরপুর নাম করণ হয়। সংযোজনের কারণ স্বরূপ উল্লেখিত হয়ে থাকে যে, সেকালে বরেন্দ্রী শেরপুর হতে বৃহত্তর মেহমানশাহীস্থ শেরপুর পর্যন্ত তদানীন্তন করতোয়া নদী সুবিস্তৃত থাকায়, এখান হতে সেখান পর্যন্ত নৌযান যোগে যাতায়াত করতে হতো এবং মাথাপিছু কমপক্ষে দশ কাহন খেয়া

www.amarboi.org

মাশুল দিতে হতো। তাই ওটি দশ কাহনিয়া নামে অভিহিত হলো। অনুরূপভাবে সম্রাট আকবরের আমলে বরেনদ্রী শেরপুরে একটি সামরিকঘাটি স্থাপন করে সুদীর্ঘ একটি মোরচা বা পরিখা দ্বারা তা সুরক্ষিত করা হয়েছিল। তাই এর নাম করণ হলো "মোরচা শেরপুর"। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে উভয় স্থানের নাম করণ শেরশাহের নামানুসারেই হয়েছে। হযরত শাহ তুরকান শহীদের 'সির' শব্দ এস্থলে সম্পৃক্ত অনুমিত হলেও আদপে এটি শেরপুর নামের কোন অঙ্গ, সম্পূরক অথবা পরিপূরক ও হতে পারেনা।

এ স্থানের অপর দুটি জন শ্রুত নাম সোণাপুর ও "বার দুয়ারী" লোকমুখে শোনা যায়। কথিত আছে যে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে তৎকালে নাটোর রাজগণ, তাঁদের সুবিস্তীর্ন জমিদারী গঠন করে তুলেছিলেন এবং তারা এখানে বার দুয়ারী নামে একটি তহ্সীল কাছারী স্থাপন করে ছিলেন। তাইতো এর অপর নাম বারদুয়ারী শেরপুর। সোণাপুর সম্পর্কে জনশ্রুতি ব্যতীত অন্য কোন প্রমান উল্লেখ করা সম্ভব নয়। বলা হয়ে থাকে যে, সেকালে একবার এখানে প্রচুর স্বর্ণ সম্পদ পাওয়া গিয়েছিল অথবা এস্থানটি এক সময় প্রাচ্যের স্বর্ণ ব্যবসায় কেন্দ্রে পরিনত হয়েছিল। তাই একে সোনাপুর নামে আখ্যায়িত করা হয়। কেহ কেহ "সোনাভান" পুথি কেতাবে উল্লেখিত সোণাপুর কে শেরপুরের আদিনাম বলে কল্পনা করেন। কোন কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে শের (ব্যাঘ্র) শব্দ হতে শেরপুর নামের উৎপত্তি হয়েছে। কারণ এককালে এখানকার জংগলে অসংখ্য ব্যাঘ্র বাস করতো। বস্তুতঃ নাম করনের এসব অবতারণা, কথার কথা বই আর কিছুই নহে।

শেরপুরের অপর আর একটি নাম সেলিম নগর। এ নামটি ঐতিহাসিক প্রমাণ বহির্ভুত নহে। বগুড়ার ইতিহাস পুনেতা শ্রী প্রভাস সেন শেরপুরও সেলিম নগর সম্পর্কে নিম্নোল্লেখিত বক্তব্য রেখেছেন। " বগুড়া শহরের প্রায় ছয় ক্রোশ দক্ষিণে করতোয়া নদীর পশ্চিম তটে শেরপুর নামক প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন শহরটি অবস্থিত। উহা পরগণে শেরপর মূর্চ্ছা প্রকাশ্য মেহমান শাহীর অন্তর্গত এবং ২৪.৪০" উত্তর নিরক্ষ ও ৮৯.২৩" পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যগত। ১৫৯৫ সালে বিরচিত আইনে আকবরী নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে আমরা এই স্থানের উল্লেখ প্রাপ্ত হই। আকবর নামাতেও বহুবার "সেরপুর মুর্চ্ছা" বলিয়া এই স্থানের উল্লেখ আছে। অদ্যাপি ইহা অপভ্রংশে সেরপুর মরিচা নামেই অভিহিত হয়ে থাকে। এখানে সম্রাট আকবরের পুত্র সেলিমের (পরে বাদশাহ জাহাঙ্গীর) নাম অনুসারে রাজা মানসিংহ কর্তৃক "সেলিম নগর" নামে একটি দুর্গনির্মিত হয়েছিল।

www.amarboi.org

"---------১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজশাসন কর্তা ভনডেন ব্রুক (Von- den Brouch) এতদঞ্চলের একখানি মানচিত্র অংকণ করেন। এই মানচিত্রে বোয়ালিয়া হইতে পূর্বোত্তর দিকে বর্তমান রাজশাহী, পাবনা, বগুড়া, বঙ্গপুর জেলার মধ্যদিয়া আসাম পর্যন্ত যে একটি প্রশস্ত রাজপথ পরিলক্ষিত হয় উক্ত পথের পার্শ্বে তৎকালিন প্রধান প্রধান স্থান গুলির নাম লিখিত হইয়াছে। এই স্থান গুলির মধ্যে "সেরপুর মুর্চ্চা" অন্যতম। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে সেরপুর তৎকালে একটি সুপ্রসিদ্ধজনপদ, বলিয়া পরিগণিত হইত।" ভনডেন ব্রুকের উক্ত মানচিত্রে সেরপুর মুর্চ্চা কে Ceerpoor Mirt বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে।

রাজা মানসিংহ ছিলেন সম্রাট আকবরের অন্যতম সেনাপতি। তিনি ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হতে ১৬০৬ পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলীয় (বঙ্গদেশীয়) কমান্ডের প্রধান সেনাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাজা মানসিংহ শেরপুরে মোর্চা (ফার্সি ভাষায় পরিখাকে মোর্চা বলা হয়) স্থাপন করত এখানে একখানি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। আজিও আমরা মানসিংহ নির্মিত প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে পাই।

এই প্রাসাদটি অধুনা সির মোকাম ও সেরুয়ার মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত ছিল। পূর্বে উহা মিরগঞ্জ নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে উক্ত প্রাসাদের প্রায় সবটুকুই মৃত্তিকা গর্ভে প্রোথিত থাকায় সনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বন বিভাগ উক্ত স্থানে ফরেষ্ট নার্সারি গড়ে তুলেছেন হেতু, উহার অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছে। সংরক্ষণের অভাবে এই অমূল্য পুরাকীর্তিটির অবক্ষয় ঘটেছে। তবে উহা এখনও সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। অধুনা শেরপুর মূল শহরটি প্রাচীন পরিখা বরাবর অবস্থান করছে। অধুনা সির মোকাম হতে শুরু হয়ে নদীর পশ্চিম তীর বরাবর মির্জাপুর পর্যন্ত প্রাচীন সেই মোর্চা বা পরিখাটি প্রলম্বিত ছিল। কথিত আছে যে তদানীন্তন দক্ষিণ বঙ্গের বার ভৌমিকের অন্যতম ব্যক্তিত্ব, যশোহরের প্রতাপাদিত্য কে শায়েস্তা করনার্থই শেরপুরের উল্লেখিত দুর্গটি নির্মিত হয়েছিল। তৎকালে, বর্তমান পাৰনা ও সিরাজগঞ্জ জেলার অধিকাংশ স্থানই যশোহর জেলার অন্তর্ভুক্ত এবং উহা রাজা প্রতাপাদিত্যের শাসনাধীন ছিল। মূলতঃ রাজাপ্রতাপাদিত্যকে বশীভূত করার জন্যই মুঘল সেনাধ্যক্ষ এখানে আস্তানা গড়ে তুলেছিলেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সেকালে মেহমান শাহী পরগণার সদর দপ্তর বা হেড কোয়ার্টার মোর্চা শেরপুরেই অবস্থিত ছিল। এই শেরপুর মোর্চার অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন ও বিতর্ক তুলেছেন, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস লেখক, শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয়। তিনি উল্লেখ করেন" আইনে আকবরীর সেরপুর মুর্চা, ময়মনসিংহ,

www.amarboi.org

বগুড়া বা মুর্শিদা বাদের সেরপুরের মধ্যে কোন্‌টি তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়না"। তিনি শেরপুর মোর্চা কে মুর্শিদাবাদের অন্তর্ভূক্ত করে দেখাতে চান। কিন্তু আইনে আকবরীতে দেখা যায় যে, উহা মেহমানশাহী পরগনায় অবস্থিত এবং বগুড়া জেলার অন্তর্গত। গ্লাড উইন অনুদিত আইনে আকবরীতে লিখিত হয়েছে"

Mehman shahy, Commonly called sherpur Murcha" অর্থাৎ মেহমান শাহীকে সাধরণ্যে শেরপুর মোর্চা বলা হয়ে থাকে। সুতরাং নিখিল বাবুর অনুমান মোটেই গ্রহনযোগ্য নয়।

অধুনা ধড়মোকাম ও সেরুয়ার দক্ষিন পশ্চিম পার্শ্বে যে উচ্চ স্তূপটি পরিলক্ষিত হয় এবং যেখানে বর্তমানে একটি হাওয়া খানা নির্মিত হয়েছে উহা আদপে একটি বৌদ্ধ ধাপ। পূর্বে উক্ত ধাপটি অবিভক্ত ছিল কিন্তু পরবর্তী কালে (১৯৭৬) শেরপুর-ঢাকা মহাসড়ক মির্মিত হওয়ায় এক্ষণে উহা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। বর্নিত ধাপটি বাহ্যতঃ মাটির টিলা বৎমনে হলেও মূলতঃ উহা ছিল পাকা দালান কোঠার সমষ্টি। সম্ভবতঃ উহা হিউয়েন্থ্ সাঙ্গ কথিত বিংশতি সংঘা রামের একটি হয়ে থাকবে। হিউয়েন্থ্ সাঙ্গ পৌন্ড্র বর্দ্ধনের মধ্যে ২০টি সঙঘা রাম প্রত্যক্ষ করেছেন বলে উল্লেখিত আছে। সঙঘারাম বল্‌তে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির ও সংসৃষ্ট অপরাপর দালান কোঠা বুঝানো হচ্ছে। সুতরাং দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যেতে পারে যে, প্রাচীনকালে বৌদ্ধগণ এখানে এক বিশেষ সংস্কৃতি ও দীর্ঘস্থায়ী শাসন ব্যববস্থা প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন। প্রাচীন সঙঘারামের নিদর্শন ছাড়া এখানে আরও অনেক বৌদ্ধ নিদর্শন প্রমাণিত হয়েছে।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে প্রাচীন শেরপুর মোর্চা সেকালে এক মহাসমর ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছিল। এখানে মানসিংহের সহিত দুর্ধষ আফ্‌গানদের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধের বিবরণ মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের ভাষায় নিম্নরূপঃ-"উড়িষ্যা হইতে মোগল দিগকে বিতাড়িত করিয়া আফগানেরা বাঙ্গালা পর্যন্ত ধাবিত হয়। ------ সেই সময় বিশ হাজার আফগান, ওস্‌মানের পতাকা মূলে সমবেত হইয়াছিল। সেরপুর মুর্চার পশ্চিম প্রান্তরে উভয়পক্ষের ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া উঠে। আফগানদিগের সহিত বহু সংখ্যক রনহস্তী ছিল। সর্বাগ্রে সেই সমস্ত মদোন্মত রণহস্তী স্থাপিত হইলে, মোঘল ও রাজপুতগণ তাহাদের প্রতি গোলা বৃষ্টি আরম্ভ করায়, হস্তীগণ বিকট আর্তনাদ করিতে করিতে ছত্র ভংগ হইয়া পড়ে এবং আফগানগণও উপর্য্যুপরি আক্রান্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। মোগল ও রাজপুতগণ কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাৎধাবন করে, তাহারা উড়িষ্যা মুখে অগ্রসর হয়"।

www.amarboi.org

মোরচা শব্দটি শেরপুর নামের বহুল প্রচলিত অবিচ্ছেদ্য অংশ। এক কালে মোর্চা ব্যতীত শেরপুর নাম অবোধ গম্য ছিল। এই শেরপুরে আমরা আরও তিনটে মোর্চার উল্লেখ দেখতে পাই-যথা, গ্রাম মোরচা, বন মোরচা ও পান মোরচা। শেরপুরের দক্ষিন পূর্বাংশ গ্রাম মোরচা, মধ্যাংশ পান মোরচা ও উত্তর পশ্চিম প্রান্তে বন মোরচা অবস্থিত। শেরপুরের দক্ষিণ ও পূর্বাংশ সৈয়দপুর এবং উত্তর ও পশ্চিমাংশ উলিপুরের অন্তর্গত।

আমরা মুঘল আমলের বিভিন্ন পর্যায়ে শেরপুর মোরচার উল্লেখ দেখতে পাই। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। তদানীন্তন পূর্ব বাংলার দ্বাদশ ভৌগিকদের অন্যতম ঈসাখাঁন ও অধীনস্থ বিদ্রোহী মাসুম আফগানকে পরাভূত করনার্থ দিল্লী সরকার কর্তৃক শাহবাজ খাঁন প্রেরীত হন। সুচতুর ঈসাখাঁন আসন্ন বিপদের ইংগিত পেয়ে মাসুম খাঁনকে শেরপুর (দশকাহনিয়া) অভিমুখে প্রেরন করেন। মুঘল প্রতিনিধিশাহ্বাজ খাঁন পূর্ব বাংলায় উপস্থিত হয়েছে শুনে, ভৌমিক নেতা মাসুম খাঁন রণেভংগ দিয়ে উড়িষ্যায় আশ্রয় গ্রহন করেন। দিল্লী সরকারের পাল্টা আক্রমণ প্রতিহত করা অসম্ভব ভেবে ঈসা খাঁন, সাময়িকভাবে সংঘর্ষ এড়িয়ে চলেন। এদিকে অবস্থা শান্ত বুঝে শাহবাজ খাঁন, বাংলার শাসনভার ওয়াজির খানের উপর ন্যস্ত করে, বিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এবার সুযোগ বুঝে ১৫৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ঈসাখাঁন পুনরায় (১৫৮৬-৮৭) বাংলার মসনদে জেঁকে বসেন। অবস্থা বেগতিক বুঝে শাহরাজখাঁন, বিপুল সেনা সৈন্যসহ পুনরায় ঈসা খাঁন কে আক্রমণ করেন। উভয় পক্ষে প্রচন্ড সংঘর্ষের পর রণক্লান্ত মুঘল বাহিনী শেরপুর মোর্চায় প্রত্যাবর্তন করেন। অনুরূপ ভাবে স্যার এইচ ইলিয়ট বিরচিত History of India গ্রন্থে সেরপুর মোরচার কথা উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন " Isa was too cautious to leave his own country but he induced Masum to advance to sherpur. A detachment of the rebels over ran the country as far as Malda, and to within twelvess kos of Tanda. Wazirkhan did not feel sufficient confidence to go out and attack them, but he held his ground and secured that important city. The royal massengers now arrived and turned shahbaz khan back with words of censure. He was told that, if more forces were neccssary. Raja Todormal and other chiefs should be ordered to join him, but he replied that his army was now numerous and the men full of ardour. On the 18th December he entered Bengal-------- After the country was clear of the rebels, the Amirs returned to sherpur Miraja"

www.amarboi.org

অর্থাৎ ঈসাখাঁন দেশত্যাগ কালীন সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করেন এবং মাসুম খাঁনকে শেরপুর অভিয়ানের নির্দেশ প্রদান করেন। বিদ্রোহীদের একাংশ মালদহ আক্রমন এবং তন্দার বিশ ক্রোশ অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। গত্যন্তর না দেখে (দিল্লীর প্রতিনিধি) ওয়াজির খান পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে গুরুত্ব পূর্ণ শহরটি পুনরুদ্ধার করেন। এরই মধ্যে সম্রাটের রাষ্ট্রদুত সমরাঙ্গনে উপস্থি হন এবং ওয়াজির খানকে ভৎর্সনা ও রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দেন। আরও অধিক সেনা-সৈন্য ও রাজা টোডর মল ও অন্য সেনাধ্যক্ষের প্রয়োজন হবে কিনা প্রশ্ন করা হলে, ওয়াজির খান বীরত্ব ব্যঞ্জক উত্তরে বলেন যে, তার বাহিনী যথেষ্ট শক্তি শালী ও এখনও রণক্লান্ত নহে। ---- অতঃপর বাংলায় প্রবেশ করে শত্রুমুক্ত করে ফেলেন এবং আমির, বিজয় বেশে মোরচা শেরপুরে প্রত্যাবর্তন করেন।

শেরপুর মোরচা ব্যতীত পাবনা জেলায় ও অনুরূপ একটা নামের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পাবনা জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ "রাবণ হ্রদ"বা চলনবিলের উত্তরাংশে মরিচ পুরান নামে একটি স্থান আছে। মরিচ পুরাণ ও তন্নিকটবর্তী হুন্ডিয়ান নামকস্থানে একদা ফৌজদারের বিচারালয় ছিল। সম্ভবতঃ এ স্থান হতে সেনানিবাস স্থানান্তরিত হলে, মোরচা পুরানা নাম হয়ে, পরিশেষে মরিচপুরান নামের উৎপত্তি হয়ে থাকবে। বর্ণিত মরিচ পুরানের নিকটবর্তী কলম মরিচ ও সুবুদ্ধি মরিচ নামে আরও দুটি পল্লী মহল্লা রয়েছে। চলনবিলে অবস্থিত পল্লীত্রয়ের" মোরচা নাম করণের সঠিক ইতিহাস আমাদের জানা নেই। তবে এদেশে মোরচা স্থাপনের ইতিহাসে সেনাপতি মানসিংহকে অন্যতম অগ্রনায়ক বলা যেতে পারে। সম্ভবতঃ তিনি মোঘলদের আদেশানুযায়ী প্রথমে চলনবিলে দুর্গনির্মাণ করেছিলেন এবং পরবর্তী সময় তথা হতে শেরপুর মোর্চা স্থাপন করেন। তাই পূর্বোক্তটি পুরান মরিচা নামে পরিচিত।

অধুনা শেরপুর শহরটি ধ্বংসাবশেষের অবশিষ্টাংশ মাত্র। এককালে এ শহরটির বিস্তৃতি ছিল দৈর্ঘে ও প্রস্থে যথাক্রমে বার ও ছয় মাইল। প্রাচীন মূল শহরের সর্বাংশই এখন সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। মূল শহরটি কিরূপে এবং কখন যে ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়েছে, তার বিশদ বিবরণ সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। বিশেষ ভাবে অনুধাবন ও অনুমান করা যায় যে প্রাচীন টোলা, মিঞা টোলা, পাঠান টোলা ও ধড় মোকাম প্রভৃতি এককালে শহরের উল্লেখযোগ্য মহল্লা রূপে পরিগণিত হতো। এখানে অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ টোলা মসজিদ খেরুয়া, মসজিদ ও বিবির মসজিদ প্রায় একই সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে প্রমান পাওয়া যায়। একই মহল্লায় একাধিক বৃহদাকার মসজিদের অস্তিত্ব দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সেকালে এ স্থানটি ছিল মুসলীম জনবহুল এলাকা।

www.amarboi.org

অধুনা শেরপুর শহরটি প্রাচীন মূল নগরীর অবিচ্ছেদ্য অংশ কিনা তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে এ শহরটির প্রাচীনত্ব ও নেহাত কম নয়। সম্ভবতঃ মূল প্রাচীন নগরীর পতনের পর পরই এটি দ্বিতীয় মূল শহর হিসেবে গড়ে উঠে থাকবে। সংগত কারনেই এক সময় শেরপুরকে "উত্তর বঙ্গের প্রাচীন দিল্লী" নামে অভিহিত করা হতো। কারণ, তখনকার দিনে কেবল শেরপুর, বোয়ালিয়াও ঘোড়াঘাট নামেই উত্তর বংগের অস্তিত্ব বুঝানো হতো। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বপর্যন্ত শেরপুর ও মহাস্তান ছিল সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থান। লুটেরা দস্যুদের নৈরাজ্য রোধের জন্য তদানীন্তন ইংরেজ বেনিয়া সরকার, বগুড়া নামে আর একটি পৃথক জেলা সৃষ্টি করতে বাধ্য হয়। বলা হয়ে থাকে যে, সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের পুত্র বাংলার শাসন কর্তা নাসির উদ্দিন বগরা খানের নামানুসারেই, নব গঠিত এই জেলার নামকরণ হয়েছিল। বগুড়ার পরিবর্তে যদি শেরপুরে জেলা সদর প্রতিষ্ঠা করা হতো, তাহলে ইহার ঐতিহ্য চির কাল অক্ষুণ্ন থেকে যেতো বই কী। জেলা গঠনের পর স্বাভাবিক ভাবেই প্রশাসনিক মর্যাদায় শেরপুর দ্বিতীয় স্থানীয় হয়ে পড়ে। মুঘল যুগে শেরপুরছিল সুপ্রসিদ্ধ এক সীমান্ত ঘাটি। ১৭৬৫ ঈসায়ী থেকে মুঘল সম্রাটদের নিকট হতে ইংরেজ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানী সহ এই অঞ্চল ও করলগত করে ফেলে। উত্তর বঙ্গের অমর প্রতীক হিসেবে শেরপুরের মর্যাদা ছিল সমুন্নত কিন্তু ঢাকায় মুসলমান শাসনাধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে, ইহার প্রাধান্য বহুলাংশে লোপ পায়। (২) মুঘল আমলে শেরপুর বিদ্রোহীদের এক মহা মিলন কেন্দ্রে প্ররিণত হয়েছিল, কারণ সম্রাট আকবর কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের পর বিদ্রোহী কাকশাল গোত্রের লোকেরা এখানে শক্তিশালী আস্তানা গড়ে তুলেছিল।

প্রসিদ্ধ টোলা চৌহদ্দির অন্তর্গত বিভিন্ন স্থানে মাটি খনন কালে অনেক প্রাচীন ঘর বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে। কয়েক স্থানেখনন কালে শেরশাহীআমলের রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। টোলা মহল্লার পুর্বাংশে অবস্থিত হামছায়াপুর গ্রামটি অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাচীন বলে অনুমিত হয়। মুঘল আমলে ইহা পাঠানটোলা নামে পরিচিত ছিল। সেকালে এখানে সরকারী তহসীল কাছারী প্রতিষ্টিত ছিল বলে জনশ্রুতি আছে। পরবর্তী কালে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প অথবা অন্য কোন দৈব দুর্যোগে পাঠান টোলার ঘরবাড়ী ধ্বংস প্রাপ্ত হলে স্থানটি গভীর অরণ্যে পরিণত হয়। অতঃপর অরণ্যের কোন কোন অংশে বুনো বা সাঁওতাল শ্রেনীর লোকজন

www.amarboi.org

বাস আরম্ভ করে। পরিশেষে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে আসাম হতে আগত বাস্তহারাগণ এখানে পুনর্বাসন লাভ করলে, পাঠান টোলারঅরণ্য সম্পূর্ণরূপে উচ্ছেদ হয়ে যায়। এখানে চাষাবাদ ও ঘর গৃহ নির্মাণকালে টোলা ও পাঠান টোলারএখানে ওখানে অনেক প্রাচীন কীর্তি যথা, দালান কোঠার ধ্বংসাবশেষ, মৃৎশিল্পের নমুনা, ধনুক যুদ্ধে ব্যবহৃত মৃত্তিকা বর্তুল, তস্‌বিহ দানা ঘটি বাটি, কড়ি মুদ্রা, বৌদ্ধ মূর্তি প্রভৃতি বহুল পরিমানে পাওয়া গিয়েছে। সম্ভবতঃ অধুনা হামছায়াপুর বিশেষতঃ বর্তমান ইতিহাস প্রণেতার বাসভবন সংলগ্ন স্থান সমূহ সেকালে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ মহল্লা ছিল বলে মনে হয়। কারণ এ অংশের মৃত্তিকায় প্রাচীন উপাদান এত বেশী অবশিষ্ট রয়েছে যা দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে চাষাবাদ করার পরও দূরীভূত হয়নি। এখানে প্রাপ্ত ছোট বড় মৃত্তিকা বর্তুল দৃষ্টে মনে হয় যেন এক কালে এ স্থানটি কোন সমরক্ষেত্র অথবা অস্ত্র নির্মান কারখানা রূপে ব্যবহৃত হতো।

অধুনা শহরটি প্রাচীন শেরপুরের ভাংগা গড়ার পঞ্চম সংস্করণ বটে। ইতোপূর্বে এই শহরটি কমপক্ষে চার বার চূড়ান্ত ধ্বংসাবস্থা প্রত্যক্ষ করেছে। পরিশেষে আজকের শেরপুর দূর অতীতের স্মৃতি বক্ষে জুড়ে ক্ষুদ্রতর পরিসরে মহাকালের স্বাক্ষররূপে দাঁড়িয়ে আছে। আমরা আজকের শেরপুরকে নিম্নোল্লেখিত পরিসীমায় ও মহল্লায় বিভক্ত করতে পারি-

(১) বাংলা বিশ্বকোষ ৩য় খন্ড ৩৪৫ পৃষ্ঠা। (২) বিশ্বকোষ বিংশ ভাগ শ্রী নগেন্দ্রনাথ পৃষ্ঠা ৫৪৭
Muslim Architccture in Bengal by Ahmad Husain Dani

www.amarboi.org

উত্তরে গোঁসাই ভবন হতে দক্ষিণে সদর রাস্তা এবং রাস্তার দু'পার্শ্বের এলাকা। অর্থাৎ পূর্বে করতোয়া নদী এবং পশ্চিমে জেলা বোর্ডের প্রাচীন সড়ক পর্যন্ত। গোঁসাই ভবনের দক্ষিণাংশ। এই অংশ পূর্বে মহারাজ গঞ্জনামে অভিহিত হতো। বর্তমানে মহল্লাটি কুম্ভকার পাড়া নামে পরিচিত। কুমার পাড়ার দক্ষিণাংশ প্রাচীন কালে বল্লভীতলা, অতঃপর বানিয়াপাড়া এবং এক্ষনে উহা দত্ত পাড়া নামে অভিহিত। বর্ণিত মহল্লার পূর্বাংশে অধুনা কুমার পাড়া অবস্থিত। প্রাচীন কালে এটি মহারাজ গঞ্জের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মধ্যে বাগিচার হাট এবং পশ্চিমে হাজিপুর অবস্থিত।

থানার দক্ষিনাংশ- পূর্বে প্রাচীন বল্লভীতলা এবং অধুনা বানিয়াপাড়া বা দত্তপাড়া অবস্থিত। ইহার পশ্চিমে শ্রীরামপুর ও উলিপুর অবস্থিত।

বানিয়াপাড়ার দক্ষিনাংশ-পূর্ব পার্শ্বে গোয়ালা পাড়া,পশ্চিমে মথুরা মহল, তৎপশ্চিমে শ্রী রামপুর এবং তৎপশ্চিমে পুণ্যা তেলা। মথুরা মহলের দক্ষিণাংশ (গুঞ্জাবাড়ী পর্যন্ত) পূর্ব পার্শ্বে কালিদহ, তৎপশ্চিমে পুর্বপাড়া, বালি পাড়া, (এক্ষণে মুনসি বাড়ী, তিলি পাড়া ও সৌলক পাড়া নামে পরিচিত) এবং তৎপশ্চিমে শ্রীরামপুর। গুঞ্জাবাড়ীর দক্ষিণাংশ পূর্বপার্শ্বে সত্রাজিৎ বালা,মধ্যে হটিলাতলা, পশ্চিমে বনিক পাড়া। লক্ষীতলা, দক্ষিনাংশ-পূর্বে রায়পাড়া ও সাহাপাড়া, মধ্যে সান্ন্যাল পাড়া বা বাজার পাড়াও পশ্চিমে গুয়া কান্দর।

সাহা পাড়ার দক্ষিনাংশ পূর্বে বারদুয়ারী ও হাকিম গঞ্জ, পশ্চিমে শেখপাড়া। বার-দুয়ারী হাটের দক্ষিণাংশ পুর্বে দক্ষিণে সির মোকাম, রেকাবী বাজার, মীরগঞ্জ মধ্যে সেরুয়া ও পশ্চিমে হামছায়াপুর পাঠান টোলা।

অতীতের অগাধ ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির তুলনায় বর্তমান শেরপুর এক নাম মাত্র কিছু। প্রাচীন কালে ইহার বিস্তৃতি ছিল দক্ষিনে রাজবাড়ী মুকন্দ গুলফা পুর কমলাপুর ও ভবানীপুর পর্যন্ত প্রসারিত। পশ্চিমে কেল্লাপুশী হতে জামুর পর্যন্ত। পুর্বে করতোয়া নদী ও উত্তরে বর্তমান শহর তক। আদি শেরপুরের কোন স্বাক্ষরই আর সংরক্ষিত নেই। এখানে পৌরসভাটি প্রতিষ্ঠিত না থাকলে নিকট অতীতের এই ক্ষীণতম স্বাক্ষর টুকুও অপসৃত হয়ে যেতো।

বৃহত্তর বগুড়ার জয়পুরহাট মহকুমা, অতঃপর জেলা শহরে রূপান্তরিত হওয়া পর্যন্ত শেরপুর ছিল দ্বিতীয় মর্যাদাশীল এক ঐতিহাসিক শহর। এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব এখনও অনুধাবন যোগ্য। শেরপুর এক সময় দালান বা কোঠা বাড়ীর শহর বলে আখ্যায়িত হতো। জমিদারী আমলে এখানে এত সংখ্যক দ্বিতল, ত্রিতল প্রাসাদ তৈরী হয়েছিল যে, এগুলি নির্মাণ কল্পে অসংখ্য রাজমিস্ত্রিকে এখানে

www.amarboi.org

স্থায়ীভাবে বসবাস করতে হতো এবং উক্ত মহল্লাটি পরবর্তী কালে মিস্ত্রি পাড়া নামে অভিহিত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে ঐ প্রাসাদমালা দীর্ঘ স্থায়ী হতে পারেনি-কারণ, বঙ্গাব্দ ১২৯২ সালে (৩০ শে আষাঢ়, পূর্বাহ্ন ৬ ঘটিকা) সংঘটিত এক সর্বনাশা ভূমিকাম্পে এ শহরের বর্ননাতীত ক্ষতি সাধিত হয় এবং এর ফলে জনপদের বিশাল সংখ্যক মানুষ দালান চাপা পড়ে প্রাণ ত্যাগ করে। আমরা নিম্নোল্লেখিত উদ্ধৃতাংশ হতে আলোচ্য ভূমিকম্পের ক্ষয়-ক্ষতি ও ভয়াবহতা সম্পর্কে সম্যক ধারনা গ্রহন করতে পারি।

"গত ১২৯২ সালের রথ যাত্রার দিন ভূমি কম্পে সেরপুর যেরূপ বিপ্লব ও লোক ক্ষয় হইয়াছে- বঙ্গ দেশের মধ্যে আর কোথাও সেরূপ হয় নাই। ভূমি কম্পের পূর্বের সেরপুর দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকার শোভামান ছিল,সেই সেরপুর ভূমি কম্পের পর মুহূর্তে একেবারে ইষ্টক স্তূপে পরিণত হয়। এবং চতুর্দ্দিক হইতে করুন আর্তনাদ উত্থিত হয়। তারপর ভগ্নস্তুপ হইতে যে সময় মৃত দেহ বহিষ্কৃত করা হইতেছিল, সেই সময় তাহাদের আত্মীয় বর্গের শোক কাতর ক্রন্দন ধ্বনিতে পাষান ও গলিয়া যাইত। মাতার সম্মুখে পুত্রের মৃত দেহ, স্ত্রীর সম্মুখে স্বামীর মৃত দেহ ,যখন উলেখিত হইতে লাগিল, সে শোচনীয় দৃশ্য বর্ননাতীত। কি ছিল, এক মুহূর্তে কি হইয়া গেল? কত সোণার সংসার শ্মশাণে পরিণত হইল। রথযাত্রা দেখিবার জন্য বেশ ভুষায় সজ্জিত হইয়া এবং আত্মীয় স্বজন, সন্তান-সন্ততি পরিবৃত হইয়া অধিকাংশ রমনী স্ব-স্ব পথি পার্শ্বস্থ দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়াইয়া রথযাত্রা দেখিতেছিল, ইতিমধ্যে এই সর্বনাশা ঘটে।"

ভূমিকম্পের পূর্বে শেরপুর ছিল এক সুশোভিত জন পদ। এই তান্ডব লীলায় যে অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল, তার বিশদ বিবরণ পেশ করা কঠিন। উক্ত মহাদুর্যোগের ফলে একমাত্র শেরপুর শহরেই ৪৫/৫০ জন লোকের প্রাণ হানি ঘটে। যারা এ সর্বনাশা তান্ডবে নিহত হয়েছেন, তন্মধ্যে মুন্সী বাটির শ্রীযুক্ত রাধা বমন মুনসীর বড়স্ত্রী, চন্দ্র কিশোর মুনসীর চতুর্থ পুত্র, কালি কিশোর মুনশী মহাশয়ের মাতা ও চার সন্তান সহ অত্র পরিবারের নিজস্ব মোট আঠার ও অপরাপর আরও এগার জনের প্রাণ হানি হয়। এতদ্ব্যতীত এখানে অবস্থিত শ্রী জগন্নাথ দেবের মন্দির সহ আরও অনেক গুলি অতি প্রাচীন মন্দির ও দেবালয় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

তদানীন্তন "হিন্দু রঞ্জিকা" পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচ্য ভূমিকম্পের আংশিক বিবরণ নিম্নরূপঃ--------"আর লিখা যায়না। লিখিতে হাত অবশ হইয়া আইসে। উপসংহার কালে এই বলেতেছি যে, হতাবশিষ্ট ব্যক্তিগণ স্থানে স্থানে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া বহু কষ্টে কালাতিপাত করিতেছে। কিছুদিন পরেই সেরপুর যে

www.amarboi.org

সর্প ব্যাঘ্রাদির আবাস ভূমি হইবে, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেই নাই। বোধহয় যিনিই সেরপুরের বৃত্তান্ত অবগত হইবেন, তিনিই চক্ষের জল না ফেলিয়া স্থির থাকিতে পারিবেননা। ভূমি কম্প এইক্ষণ পর্যন্ত ও একেবারে থামে নাই। প্রত্যহ দুই তিন বার করিয়া শব্দ হইতেছে। করতোয়া নদীর তীরে স্থানে স্থানে বালুকা ও জল উঠিয়াছে। ইহার যে ফল কি হইবে, তাহা ঈশ্বর ভিন্ন মানুষের নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন কালে শেরপুর নগরী আরও তিনবার প্রাকৃতিক মহাদুর্যোগে নিপতিত হয়। অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে এখানে দু'বার মহা প্লাবন বয়ে যায়। এর ফলে শেরপুর থানার বিশাল এলাকা জল মগ্ন হয় এবং পোষা জীব জন্তু ও জনপদ প্রায় নির্মূল হয়ে যায়। এখানে বঙ্গাব্দ ১৩০৪ সালে পুনরায় এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। তবে তুলনামূলক ভাবে এ ভূমি কম্পের ক্ষয় ক্ষতি পূর্বাপেক্ষা অনেকটা কম কারন, দ্বিতল ত্রিতল দালান কোঠা ইতো পূর্বেই ভূমি সাৎ হয়ে গিয়েছিল। তাই এবারে ঘর বাড়ী ও লোকজনের তেমন ক্ষয় ক্ষতি হয়নি।

পুর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে মোরচা শেরপুর কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা বলা কঠিন। অনেকে অনুমান করেন যে করতোয়া নদী যখন এখান হতে মেহমানশাহী পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল এবং কামরূপ (আসাম) কে যেকালে করতোয়া নদী দ্বারা বঙ্গ ভূমি হতে বিভক্ত ও পৃথক করা হতো সেই আমলে এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কেহ কেহ মত পোষন করেন যে, জৌন গনই এখানে সর্ব প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ ও নগর পত্তন করেন। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে বৌদ্ধগণই সর্বাগ্রে এ শহরের গোড়া পত্তন করেন। কথিত আছে যে, খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক অন্ য়ুয়ক চয়ঙ পৌন্ড্রবর্দ্ধন হতে Ka-La-To কালাতো নামে একটি বিশাল নদী অতিক্রম করে কামরূপ (আসাম) রাজ্যে উপনীত হন। হিউ এনথ সাঙ্গ কর্তৃক উল্লেখিত 'কালাতো' যে করতোয়া, সে বিষয়ে সন্দেহ করবার কোন অবকাশ নেই। সম্ভবতঃ বৌদ্ধ যুগেই করতোয়া এখান হতে ময়মনসিংহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং সেই বিশাল নদীটি পার হতে তখন মাথাপিছু খেয়া মাশুল দশকাহন প্রয়োজন হতো। সে আমলের এ বিবরনটুকু ব্যতীত আর কোন তথ্য উদ্ধার করা যায়নি। অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধ শাসনামলের শেষের দিকে বল্লাল সেন তখনকার প্রাচীন কমলাপুর বা রাজবাড়ী মুকুন্দে এক নতূন হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সেই সেই রাষ্ট্রের সুবিধালাভের জন্য স্বাভাবিক ভাবেই বিভিন্ন স্থান হতে হিন্দু প্রজাগণ এখানে এসে বসবাস শুরু করে। কিন্তু পরবর্তীকালে সেন বংশের পতনের পর

www.amarboi.org

যখন মুসলমান প্রভাব বিস্তার হতে থাকে, তখন হিন্দু গন অধূনা শেরপুরে প্রত্যাবর্তন করে। পূর্ব অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে যে অধুনা বারদুয়ারী ঘাট তৎকালে আন্তর্জাতিক নদী বন্দর রূপে ব্যবহৃত হতো। বানিজ্যিক সুবিধা ছাড়াও আবাসিক সুযোগ সুবিধায় উৎসাহী লোকেরা সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়তো। ফলে নানা শ্রেণীর লোকজন এখানে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে বসে। লক্ষ্যনীয় যে মোর্চা উত্তর উপ-শহরেএককভাবে হিন্দুগণই অধিবাসী হয়। অথচ তখনকার দিনে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা নেহাত কম ছিলনা। সম্ভবতঃ মুসলমানদের অধিকাংশই তখন কৃষি কাজে লিপ্ত থাকতো হেতু শহরমুখী হতে পছন্দ করতোনা।তদানীন্তন মুসলমানদের সংখ্যাগত অবস্থান সম্পর্কে W.W. Hvnter এর "A statistical Account of Bengal হতে উদ্ধৃত নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি অনুধাবন যোগ্য তিনি বলেন- "Though the town is remarkable for the large numler of Hindu inhabitants, It is Surrounded on all sides by places holy for the Muslims.

অর্থাৎ শহরটি (শেরপুর) বিপুল সংখ্যক হিন্দু পরিবারের বাসস্থল হলেও এর চতুস্পার্শ্বস্থ এলাকা সমূহ মসলমানদের পবিত্র স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং এটা মোটেই অমূলক নয় যে, প্রাচীন মোর্চা নগরীর বিস্তৃতি ছিল সুবিশাল এবং এর মুসলিম নাগরিকদের সংখ্যা ছিল বেশুমার।

অধুনা শেরপুর গন্ডির আদি বাসিন্দা কারা, তা সঠিক করে বলা কঠিন। তবে অনেকেই তিলিদেক এখানকার আদি বাসিন্দা বলে অভিমত প্রকাশ করে থাকেন। কারণ, তিলিগন দক্ষ ব্যবসায়ী। তাই এরা বিভিন্ন স্থান হতে এসে অত্র বাণিজ্য কেন্দ্রে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করে। অধুনা শেরপুর এক সময় ছিল মুসলমান শূণ্য জনপদ। অন্য কথায় হিন্দুগন এবং তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, তিলি, সৌগন্ধ বনিক প্রভৃতি গোষ্ঠীই ছিলেন এখানকার দন্ডমুন্ডের অধিকর্তা।

ব্রাহ্মণ জমিদারগণের মধ্যে গোঁসাই, মুনসী পরিবার ও সান্ন্যালদের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে এদের কেউ এখানকার, আদি বাসিন্দা নহেন। কারণ দান গিরি গোঁশাই হতে গোঁশাইদের এবং লক্ষণ রাম তরফদার ময়মনসিংহ অঞ্চল হতে আসার পর মুনসী পরিবারের এখানে বসবাস শুরুহয়। এঁরা আজ হতে প্রায় ২৫০ বছর পূর্বে এখানে আগমন করেন। সান্ন্যালগণ মুসলীম আমলের শেষ সময় ডাকাত তস্করদের ভয়ে রাজবাড়ী মুকুন্দের নিকটস্থ সাগরপুর গ্রাম হতে প্রথম আগমন করেন। সৌলকেরা অবশ্য এদের চাইতে অধিক প্রাচীন অধিবাসী। পলাশী যুদ্ধের (১৭৫৭) পূর্বে এ অঞ্চলে যখন রেশম বানিজ্যের

www.amarboi.org

প্রাদুর্ভাব ছিল, সেই সময় এরা মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি স্থান হতে বানিজ্য ব্যপদেশে এখানে আস্‌তে শুরু করেন এবং ক্রমান্বয়ে এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা বনে যান। অনুরূপ ভাবে গন্ধ বনিকরা পাবনা জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেন।

তিলিদের আগমনের সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায়না। সুতরাং এ থেকে অনুমান করা যায় যে অপরাপরদের চেয়ে এঁরা বহুগুণে প্রাচীন বাসিন্দা। এদের আদিত্বের অনুকূলে আরও বলা যেতে পারে যে তিলিদের মধ্যে বড় বাড়ী ছোট বাড়ী ও কুঠি বা কোঠা বাড়ী নামে বহু প্রাচীন কাল হতেই এরা প্রসিদ্ধি লাভ করে আস্‌ছেন। সুতরাং তিলিরাই যে অধূনা শেরপুরের আদিম বাসিন্দা ,তাতে সন্দেহের বিছুমাত্র অবকাশ থাকেনা। শেরপুরের তিলিরা সাধারনতঃ দু' মহল্লায় বিভক্ত ছিলেন যথা, দাস পাড়া ও মহান্তানপট্টি।

পূর্বেই কথিত হয়েছে যে সাঁতৈলের রানী শর্বানী দেবীর মৃতুর পর, তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি নাটোর রাজবংশের পূর্ব পুরুষ রঘূনন্দনের পর, রামজীবনের বিস্তৃত রাজ্যের তিন স্থানে তিনটি প্রধান রাজধানী স্থাপিত হয়। রাজধানী ত্রয়ের একটি নাটোর ২য়টি বড়নগরে এবং শেষোক্তটি শেরপুরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এখানে তদানীন্তন রাজশাহী রাজ্যের প্রধান কাছারী "বারদ্বাবী কাছারী" নামে অভিহিত হতো। এবং এ জন্যই এ স্থানের অপরনাম বার দুয়ারী শেরপুর বলে খ্যাত। উল্লেখিত কাছারীতে বার্ষিক পাঁচলাখ টাকা কর বাবত আদায় হতো বলে প্রকাশ। রানী ভবানীর সময় পর্যন্ত বর্ণিত সম্পত্তি নাটোর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে সৈয়দপুর ডিহি (যার অন্তর্গত শেরপুর মহল্লা) নাটোর রাজ সরকার হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পর্যায় ক্রমে নজী পুরের রাজা উদমন্ত সিংহও রাণী গুনমান কোঙর সাহেবার হস্তগত হয়। অতঃপর নজীপুরের কোঙর রামচন্দ্র বাহাদুর ঐ সম্পত্তি বঙ্গাব্দ ১২৪১ সালের ২৬শে আষাঢ় তারিখে পত্তন করতঃ পুনশ্চ ঐ মাসেই শেরপুর বড় বাড়ির রাধা গোবিন্দ সাহার নিকট সমস্ত ডিহির পত্তনী স্বত্ব বিক্রি করে দেন। পত্তনী স্বত্ব ক্রয়, করার ফলে রাধা গোবিন্দ সাহা এক্ষণে গোটা ডিহির নিরংকুশ স্বত্বাধিকার লাভ করলেন। এর ফলে শেরপুরের সমস্ত জামিদারকে তাঁর অধিনস্থ প্রজা হতে হলো। একথা জান্‌তে পেরে সান্ন্যাল পরিবারের তদানীন্তন প্রতিপত্তিশালী জমিদার, মাধব চন্দ্র সান্ন্যাল চরম ব্যথিত হলেন এবং ছলে বলে কৌশলে রাধাগোবিন্দ সাহাকে ডিহি বিভক্ত করে দিতে বাধ্য করলেন। অতঃপর পূর্ব দলিল বাতিল করতঃ মাধব চন্দ্র সান্ন্যাল ও রাধা গোবিন্দা সাহা, এ দু' নামে পুনরায় দলিল সম্পাদন করে নেন। শুধু তাই নহে ১২৩৯ বঙ্গাব্দে তিনি কুঠি বাড়ী জমিদার সুখময়ী চৌধুরানী, রানী অন্নপূর্ণা ও রানী আনন্দময়ীর নিকট হতে সৈয়দপুর ডিহির যাবতীয় মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করে নেন।

www.amarboi.org

তৃতীয় অধ্যায়

জমিদার পরিচিতি, জাতি সম্প্রদায়, পেশা ইত্যাদি

উত্তরকালে শেরপুর একটি জমিদার প্রধান স্থানে পরিণত হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য ছ'জন ভূ- স্বামী স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। এরা হলেন গিরি গোঁসাই, সান্ন্যাল পরিবার, মুনসীবড় তরফ, ছোট তরফ ও কুঠি বাড়ী।

এঁদের মধ্যে প্রথমোক্ত ঘর উদাসীন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘর ব্রাহ্মণ ও অবশিষ্টটি তিলি শেণীভুক্ত। দানগিরি নামক সর্ব প্রথম জনৈক গোঁসাই শেরপুরে বাস স্থাপন করেন। দান গিরি পরলোক গমনের পর তদ্বীয় চেলা বা শিষ্য ডোমন গিরি গোঁসাই গদি প্রাপ্ত হন। ডুমন গিরির তিরোভাবের পর রঘূনাথ গিরি স্থলাভিষিক্ত হন। রঘুনাথ গিরি কিছুদিন দিঘাপতিয়ার রাজা প্রাণনাথ রায়ের সম্পত্তির তত্বাবধান করেন এবং পরে বগুড়া জেলার অন্তর্গত অধুনা সারিয়াকান্দি থানাধীন নখিলাতপ্পা বা রাজস্ব বিভাগের জমিদারী এজারা গ্রহণ করেন। তিনি এভাবে প্রভূত ধন সম্পত্তি উপার্জ্জন করেন। কথিত আছে যে, রঘূনাথ গিরির মৃতুর পর, তার চেলা বা উত্তরাধিকারী তাঁর শ্রাদ্ধোপলক্ষ্যে প্রত্যেক-কে দশ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ভান্ডারা দিয়েছিলেন। শেরপুরে শেষ গিরি গোঁসাই জমিদার লছমণ গিরি গোঁসাইয়ের কোন চেলা না থাকায়, মোকদ্দমার পর রংপুর মাহিগঞ্জের মহন্ত মহারাজ সুমেরু গিরি ও মহন্ত মহারাজ ভুলন গিরি আলোচ্য পরিত্যক্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

শেরপুরে গোঁসাইদের আমলে বাসন্তী দুর্গোৎসব দেওয়ালি প্রভৃতি পূজা পাঠ উপলক্ষ্যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো এবং নানা প্রকার নৃত্য-গীতে শেরপুর আমোদিত থাকতো। গোঁসাই চরণ বা অভিষেক অনুষ্ঠানে প্রচলিত রীতের কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলোঃ-

"প্রার্থী ব্যক্তি সাধারণতঃ বালক কিন্তু পরিণত বয়স্ক হলেও দোষ নেই। যে পুকুরে দেব মূর্তি বিসর্জ্জন হইয়াছে, তাহার জল শিবরাত্রির উৎসবের দিন ঐ নির্বাচিত ব্যক্তির মস্তকে দেওয়া হয়, তৎপর তাহার মাথা মুন্ডন করা হয়। মন্ত্র গুরু, শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র প্রদান করেন। ঐ উৎসব উপলক্ষে নিকটবর্তী স্থানের গোঁসাই মহাশয়েরা আগমণ করেন, নতুন গোঁসাইকে আশীর্বাদ করেন এবং লাড্ডু নামক বড় বড় মিষ্টান্ন আপ্যায়নে পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। নূতন ব্যক্তি এক্ষণে গোঁসাই রূপে গণ্য হন। কিন্তু যে পর্যন্ত, বিজয়া হোম সম্পন্ন না হয়, ততদিন পূর্ণ হইতে পারেন না------ যাঁহারা বিজয়া হোম সম্পন্ন করিয়া গোঁসাই হইয়াছেন, তাঁহারা অকৃতদার থাকেন। কিন্তু ৪০/৪৫ বৎসর বয়স না হওয়া পর্যন্ত বিজয়া হোম করা প্রথা নহে। কারণ, উহাতে স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিতে হয়। মৃত্যুর পর তাহাদের শবদেহ দাহ করা হয়না। সমাহিত অথবা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়।।"

(১) শেরপুরের ইতিহাস পৃষ্ঠা ১৬. Hanter's Bogra

www.amarboi.org

শেরপুর গোঁসাই ভবনে "নবরত্ন" নামক একটি সুদর্শনীয় মন্দির ছিল, কিন্তু ১২৯২ বঙ্গাব্দের প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পে উহার মূলচূড়া এবং অবশিষ্টাংশ ১৩০৪ সালের ভূমি কম্পনে বিধ্বস্ত হয়। মন্দিরটি নানারূপ কারু কার্য খচিত ছিল বলে জানা যায়। গোঁসাই ভবনের বর্তমান ধ্বংসাবশেষ হতে আমরা এর পূর্ব গৌরব অনুধাবন করতে পারি। ভবনের পরিত্যক্ত ঘর বাড়ী এক্ষণে সরকারী রাজস্ব আদায় দপ্তর রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এখানকার লৌহ নির্মিত তোরনটি আজও গোঁসাই গেট নামে সুবিদিত।

মুন্সী পরিবার

মুন্সীগণ ছিলেন শেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ ও প্রতাপশালী জমিদারদের অন্যতম। এঁরা তিন শরীকে বিভক্ত ছিলেন। যথা মুন্সী, তরফদার ও মুজুমদার। মুন্সীদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন রেশম গুটির পাইকার এবং তাঁর নাম ছিল লক্ষণ রাম তরফদার। ব্রজ কিশোর তরফদার অনুপনারায়ণ মুন্সী, রামকিশোর তরফদার ও নবকিশোর মজুমদার নামে লক্ষণ রামের ছিল চার পুত্র। বর্ণিত আছে যে লক্ষণ রাম তরফদারের জ্যেষ্ঠপুত্র ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বগুড়া কালেক্টরীর খাজাঞ্চীপদে অধিষ্ঠিত হন। মুন্সী পরিবারের অন্যতম জমিদার, অনুপনারায়ণ ছিলেন অশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি নাটোর রাজ এস্টেটের ফার্সী ভাষায় কেরানী গিরী করে মুন্সী উপাধি প্রাপ্ত হন। হান্টার সাহেব লিখেছেন যে অনুপনারায়ন, পন্ডিত শাহের অধীন একদল দুর্ধর্ষ ডাকাত পুষতেন এবং তাদের দ্বারা লুণ্ঠন করতঃ অর্থ উপার্জন করতেন। কথিত আছে যে দস্যুবৃত্তির দায়ে অনুপনারায়ন ও ব্রজকিশোর মুন্সী একবার ধৃতহন এবং উভয়ে নাটোর জেলে ৯' বছর যাবৎ কারাদন্ড ভোগ করেন। এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালে ডাকাতি পেশা বড় একটা দোষের কাজ বলে গণ্য হতোনা। দন্ডপ্রাপ্ত হলেও অসুপনারায়নকে কারা বাসে তেমন কষ্ট যাতনা ভোগ করতে হয়নি। বরং তিনি তাঁর মাতার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে জেল খানা হতে ছুটি নিয়ে বাড়ী আসেন এবং শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন করতঃ পুনরায় জেলে ফিরে নির্দ্দিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন।

অনুপনারায়ণের দু'পুত্রঃ শিবনারায়ণ ও রামজয়। শিবনারায়ণ ঔরস জাত এবং রামজয়কে পোষ্য পুত্র রূপে গ্রহন করা হয়। শিব নারায়ণ তাঁর দু স্ত্রীর জন্য দুজন পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে মহেশনারায়ন জ্যেষ্ঠ এবং শিরীশ নারায়ণ ছিলেন কনিষ্ঠ। মুন্সী পরিবারের মধ্যে মহেশ নারায়ন অত্যন্ত প্রতাপশালী ছিলেন। পরন্ত যেরূপ প্রখর সেরূপ প্রজা রঞ্জক ও ছিলেন তিনি। তার ন্যায় সৌখীন ও গীত বিদ্যানুরাগী লোক এবংশে বড় একটা দেখা যায়না। তিনি অনেক পলোয়ান পুষে তাদের নিকট হতে কুস্তি কসরৎ ও লড়াই বিদ্যা অনুশীলন করতেন। শিব নারায়ণ মুনসীর কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ছিল শ্রী গিরীশ নারায়ণ মুন্সী। ইনি আমোদ প্রিয় ও ধর্মান্দনুরাগী ছিলেন। তিনি গ্রাবু পঞ্চাভ। নামক একখানা পুস্তক রচনা করেন। গিরীশ নারায়নের পুত্রগণ কৃত বিদ্ব ছিলেন।

www.amarboi.org

তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র যোগেশ নারায়ণ মুন্সী, একজন সাধক কবি ও প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। রামজয় মুনসীর চার পুত্রের মধ্যে দু' জন অকালে মৃত্যু বরণ করেন। অপর দু'পুত্র রাধা রমণ ও চন্দ্র কিশোর মুনসী এ পরিবারের উজ্জ্বলরত্ন বলে বিবেচিত হতেন। রাধা রমণ মুনসী প্রায় শতাধিক বছর বয়সে লোকান্তরিত হন। ইনি উদার ও দানশীল ছিলেন। বগুড়াস্থ "টমসন হল" টি তাঁরই অর্থে নির্মিত হয়। কথিত আছ যে তাঁর হস্তদ্বয় আজানু লম্বিত ছিল। শ্রীযুক্ত চন্দ্র কিশোর মুন্সী মহাশয় যথেষ্ট নিরভিমানী ছিলেন। তিনি বহু অর্থ ব্যয়ে শেরপুর ইন্ট্রানস্ (তদানীন্তন) স্কুলের জন্য একটি পাকা ইমারত নির্মাণ করে দেন। চন্দ্র কিশোর মুনসীর ভ্রাতুষপুত্র রায় কালী কিশোর মুন্সী বাহাদুর ছিলেন একজন উদার মনা জমিদার। শেরপুরের মধ্যে তিনিই সর্ব প্রথম ইন্ট্রান্স পাস করেন। ইনি বহু বছর ধরে যোগ্যতার সহিত শেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যানের পদ অলংকৃত করেন। মুন্সী মহাশয় ছিলেন শিক্ষা দীক্ষার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তিনি হৃদয় কুসুম ও ফুলমল্লিকা নামী দুখানা পুস্তিকা রচনা করেন। হৃদয় কুসুম তাঁর স্ত্রীর বিয়োগের জন্য লিখিত এবং ফুল মল্লিকা খানি সংগীত গ্রন্থ। বিবিধ সদগুনের জন্য তদানীন্তন সরকার তাকে রায় রাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। মুনসী পরিবারের এ শাখার আর একটি বিশেষত্ব এই ছিল যে এঁরা উর্দ্ধতন বহু পুরুষ হতে কেবল কুলীন পরিবার ব্যতীত অন্যঘরে কন্যা দান করতেন না। প্রয়োজনবোধে তাঁরা বিদেশী কুলীন ঘরেও বিয়ে শাদী করতেন। কুচবিহারের ভূতপূর্ব দ্বার মোক্তার কালি কোমল লাহিড়ী মহাশয়, চন্দ্র কিশোর মুন্সীর কনিষ্ঠ কণ্যাকে বিয়ে করেন। নাটোরের রানী ভবানীর পিত্রালয়, ছাতীন গ্রামের সান্যাল বংশ বারেন্দ্র কুলীন সমাজভূক্ত। এ বংশ পুরুষানুক্রমে মুনসীদের প্রতি পালিত বললেই চলে। এরা পুরষানুক্রমে মুনসী পরিবারে বিয়ে দিয়ে এদের বহু নিষ্কর ভূমি ভোগ করেন।

শ্রীপঞ্চমী উপলক্ষে মুনসী বাড়ীতে নৃত্য ভোজনাদি খুব সমারোহে সম্পন্ন হতো এবং এতদুপলক্ষ্যে পনের দিন স্থায়ী একটি সৌখীন মেলা এদের অঙ্গনে অনুষ্ঠিত হতো। তরফদার শাখার মধ্যে শ্রীযুক্ত আনন্দ কিশোর তরফদার ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তিনি জ্ঞান গরিমায়, এ বংশের মধ্যমণি রূপে বিবেচিত হতেন। তাঁর রচিত সুদৃশ্য উদ্যানটি শুধু শেরপুর কেন, সারা বগুড়ার মধ্যে অদ্বিতীয় ছিল। মজুমদার শাখার পরলোকগত সারদা চন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

www.amarboi.org

সান্ন্যাল পরিবার

সান্ন্যাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র সান্ন্যাল, প্রথম জীবনে ছিলেন একজন চাকুরী জীবি। তিনি নাটোর ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদারীতে দীর্ঘদিন চাকুরী করার পর পদোন্নতি ক্রমে মুর্শিদাবাদের বৃহৎ ম্যাজেষ্ট্রিসির অফিসের গুরুত্বপূর্ণ পদ লাভ করেন। তিনি এ সকল চাকুরীতে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করেন এবং বগুড়া জেলাস্থ নাটোর রাজের অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহল্লা ক্রয় করতঃ জমিদার রূপে গণ্য হন। কৃষ্ণচন্দ্র সান্ন্যালের পুত্র শ্রী মাধব চন্দ্রও চাকুরী পেশা গ্রহন করেন। মাধবচন্দ্র যেরূপ প্রতাপান্বিত সেরূপ দানশীল ছিলেন। "সেতিহাস বগুড়া" বৃত্তান্তে লিখিত আছে মাধব বাবুর ন্যায় ক্রিয়া বান, দাতা ভোক্তা, শেরপুর গ্রামের মধ্যে অত্যাল্পি ছিলেন।" শেরপুরের প্রবাদে আছে "দানে মাধব" ইত্যাদি ছাড়া পাঁচালতেও এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, সান্ন্যালেদের আমলে শেরপুরে একটি মুনসেফী আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রাতা, গোবিন্দ চন্দ্র উক্ত আদালতের বিচারক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে সান্ন্যাল পরিবারে লোকেরা আত্ম কলোহে জড়িয়ে পড়েন এবং মামলা মোকদ্দমা করে তাদের পৈত্রিক সম্মতির অশেষ ক্ষতি সাধন করেন। গোবিন্দ চন্দ্রের পুত্রের মধ্যে জোষ্ঠ যাদব চন্দ্র এবং কনিষ্ঠ গিরীশ চন্দ্রের বংশ স্থায়িত্ব লাভ করে। গিরীশচন্দ্র একজন প্রধান বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। "সেতিহাস বগুড়া" গ্রন্থে উল্লেখিত আছে "বগুড়া জেলার অন্তঃপাতি যত জমিদার আছেন, তন্মধ্যে বাবু গিরীশ চন্দ্র সান্ন্যাল অতিশয় বিদ্যানুরাগী ও হৈতেষী।"

বড় বাড়ী বংশ

বড়তরফের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাবু রাধা গোবিন্দ সাহা। ইনি বৈষ্ণব দাস সাহার পৌত্র এবং বংক বিহারী সাহার পুত্র। বাবু রাধা গোবিন্দ সাহা, নশীপুর রাজদরবার হতে সমগ্র ডিহি সৈয়দপুর পত্তন গ্রহন করেন এবং এর ফলে শেরপুরে জামিদারীর প্রায় অধিকাংশের শরীক বুনে যান। কিন্তু রাধা গোবিন্দের জমিদারী লাভকে" উড়ে এসে জুড়ে পড়ার" শামল মনে করে সান্ন্যালগণ প্রবল বাধা সৃষ্টি করেন এবং প্রতাপান্বিত সান্ন্যাল জমিদার, মাধবচন্দ্র তাঁর (রাধা গোবিন্দের) নিকট হতে জোরপূর্বক (সাত) আনা অংশ নিজ নামে পত্তনি লন। বড়বাড়ী তরফের রাধা গোবিন্দের পুত্র মদন মোহন, ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। সেকালের ছড়া পাঁচালিতেও তার নাম উচ্চারিত হতো।

"মানে মদন, ঢপে রমণ"

দানে মাধব, জপে শিবচন্দ্র"

মদন তনয় মধু সূদন প্রথম বয়সে বড্ড বখেটে ছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে অকপট সৈন্যাস বৃত্তি গ্রহণ করেন।

www.amarboi.org

রাধা গোবিন্দের পরবর্তী বংশধরগণ ছিলেন বীপিনচন্দ্র, পুলিনচন্দ্র ও রাস বিহারী। এদের মধ্যে বীপিন চন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত সৌখীন ও সমূহ প্রয়াসী। শোনা যায় যে, তিনি দ্বিতল অট্টালিকা ব্যতীত অবস্থান করতেন না। পরবর্তী কালে তাঁর অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। শেষে লোক লজ্জায় পড়তে হয় ভয়ে তিনি সপরিবারে বৃন্দাবন বাসী হয়েছিলেন। বীপিন চন্দ্রের একমাত্র পুত্র কুঞ্জ বিহারীর মৃত্যুর পর, তার বংশ লোপ পায়। অনুরুপভাবে, পুলিন চন্দ্রের বংশ ও তাঁর একমাত্র পুত্র ব্রজ বিহারীর মৃত্যুর পর খতম হয়ে যায়। বড় বাড়ীর জমিদাররা রংপুরেও ব্যবসায় বাণিজ্য করতেন। রংপুরের বড় দোকান বলে এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল সেটিই এদের ব্যবসায় কেন্দ্র। পরবর্তীকালে এরা চৌধুরী উপাধি গ্রহণ করেন।

ছোট বাড়ী

ছোট বাড়ীর পুর্বপুরুষরা ছিলেন বিহারী সাহার দু'পুত্র, জ্যেষ্ঠ দয়ারাম ও কনিষ্ঠ রাম দেব। দয়ারামের বংশধরগণ ছিলেন ব্যবসায়ী এবং রামদেবের উত্তরাধিকারীরা ছিলেন জমিদার। রামদেবের ছিল তিনপুত্র, চন্দ্রনারায়ন ইন্দ্র নরায়ণ ওরফে দাবাড়ু ও গংগা নারায়ণ। জ্যেষ্ঠ চন্দ্রনারায়ন ও কনিষ্ঠ গংগা নারায়ণ রংপুরে ব্যবসায় বানিজ্য করে জমিদারী অর্জন করেন। মধ্যম ইন্দ্রানারায়ণ শেরপুরে অবস্থান করতেন। কথিত আছে যে দাবাড়ু সাহা সুবর্ণ বনিক ছিলেন। কেহ সোণার ফাউ চাইলে তিনি বিনা দ্বিধায় ফাউ দিতেন। দাবাড়ু সাহার পৌত্র রামকমল, গংগা রামের পুত্র মোহনলাল, চন্দ্রনারায়ণের পৌত্র রাজেন্দ্র নারায়ণ প্রভৃতির আমলে শেরপুরে জমিদারী অর্জিত হয়। এঁদের শেরপুরেরও রংপুরের কাছারী দুটি যথাক্রমে "দোকান দালান ও ছোট দোকান" বলে পরিচিত ছিল। ছোট বাড়ীর বংশের পরলোকগত রায় চৌধুরী, তদীয় পিতার স্মরণার্থ তদানীন্তন বগুড়া দাতব্য চিকিসালয় সংলগ্ন অস্ত্রাগারের নিমিত্ত ২০০০/= টাকা দান করেন।

কুঠি বাড়ী

কুঠিবাড়ীর জমিদারগণ পূর্বকালে রেশমের কারবার করতেন বলে অনুমান করা হয়। সম্ভবতঃ একারনেই তাঁরা কোঠাবাড়ী বা কুঠি বাড়ী জমিদার নামে পরিচিত। কুঠিবাড়ী বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রী গোকুল চন্দ্র সাহা এবং তিনপুত্র পঞ্চানন্দ, রামানন্দ ও কৃষ্ণনাথ। পঞ্চানন্দের বংশ অংকুরেই নিপাত হয়ে যায়। রামানন্দের, পঞ্চ পুত্রের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্রের বংশে শ্রীযুক্ত নীল মাধব চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত রাধা মাধব চৌধুরী উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। কৃষ্ণনাথের বংশধরের

www.amarboi.org

অবস্থা এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বচ্ছল ছিল। কৃষ্ণ নাথের তস্য পুত্রের নাম রমানাথ। এই রমানাথের পরলোকগতা স্ত্রী সুখময়ী চৌধুরানী মহিলা জামিদারগণের আদর্শ স্থানীয়া ছিলেন। সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণে যেরূপ উপযুক্তা, দান ও ধর্মকার্যে ও সেরূপ মুক্তহস্তা ছিলেন তিনি। ইনি হরিদার প্রভৃতি তীর্থস্থান পর্যটন করেন। কোঠাবাড়ীর "রাধানাথ বিগ্রহ" তাঁরই এক অমর কীর্তি। সুখময়ী চৌধুরাণী ১২৬৯ বংগাব্দে ডিহি সৈয়দপুরের সমস্ত মালিকানা স্বত্ব নশীপুরের রাণী অন্নর্পূণা এবং রাণী আন্দময়ীর নিকট হতে মাত্র ৭৩১৭/ টাকা মূল্যে ক্রয় করতঃ শেরপুরের প্রায় অধিকাংশ জমিদারের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁরই বংশধরগণ পরবর্তীকালে সৈয়দপুরের একমাত্র জমিদার ছিলেন। শেরপুরের সকল জমিদার তাঁকে কর দিতেন। কুঠি বাড়ীর সর্বশেষ জমিদার ছিলেন প্রসন্ন নাথ চৌধুরীর পোষ্যপুত্র শ্রী কুমুদ নাথ চৌধুরী।

সৌলোক জমিদার

এঁদের মধ্যে গুরু চরণ সাহার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। গুরুচরণ সাহার বংশে পরবর্তী জমিদার ছিলেন শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সাহা। তাঁর দৌহিত্র বংশ বিভিন্ন পরিবারে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শ্রীহর সুন্দর চৌধুরী ও শ্রী কৃপা সুন্দর সাহা চৌধুরী, গুরুচরণ সাহার দৌহিত্র বংশদ্ভুত। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে এঁরা রেশম বানিজ্যোপলক্ষে শেরপুরে আগমন করেন। শেরপুরস্থ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রেশমের কুঠি রহিত হয়ে গেলে, গুরু চরণ সাহারাই তা খরিদ করে কিছুদিন কারবার অব্যাহত রেখে ছিলেন। গুরু চরণ সাহার উত্তরাধিকারী গণ যে দুর্গোৎসব করতেন, পরবর্তীকালে উহা গুরু চরণ সাহার পূজা বলে আখ্যায়িত হয়।

উপরোক্ত কয়েক ঘর জমিদার ব্যতীত শেরপুরে আরও কতিপয় ভূস্বামী ছিলেন। এঁদের মধ্যে শ্রী প্রসন্ন নাথ চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল এবং শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ন সান্ন্যাল ছিলেন ব্রাহ্মণ শ্রেনীর জমিদার। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্র চন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত হরিদাস সাহা প্রভৃতি তিলি জাতীয় জমিদার। এতদ্ব্যতীত এখানে আরও কয়েক জন ক্ষুদে জমিদার ছিলেন। এখানকার প্রাচীন মহাজনদের মধ্যে তিলি জাতীয় শ্রীযুক্ত মনোহর কুন্ডু ও শ্রীযুক্ত বঙ্ক বিহারী কুন্ডু এবং গন্ধ বনিক জাতীয় শ্রীযুক্ত মধু সূদন দত্ত ও শ্রীযুক্ত বনোয়ারী লাল দত্তের নাম উল্লেখ যোগ্য। সংগত কারনেই মোর্চা শেরপুরের ইতিহাস চর্চা প্রসংগে, দশকাহনিয়া শেরপুরের কথাও এসে পড়ে। কারণ, সাবেক বৃহত্তর ময়মনশাহী জেলাস্থ শেরপুর (বর্তমানে জেলা) ও বগুড়া জেলার মোর্চা শেরপুরের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট,

www.amarboi.org

গুরুত্ব ও মর্যাদা ছিল প্রায় কাছাকাছি ও সমসাময়িক। সমকালীন হেতু, উভয় স্থানের ইতিহাস নিয়ে টানা পোড়েন ও কম হয়নি। মোর্চা শেরপুরের এক সময় ছিল, রাজস্ব বিভাগের প্রখ্যাত বারদ্বারী তহ্সীল কাছারি, আর দশ কাহনিয়া শেরপুরে রয়েছে, প্রাচীন বারদুয়ারী ঐতিহাসিক জামে মস্জিদ। উভয় শেরপুরে এক সময় হিন্দু জমিদারদের ছিল আকাশ ছোঁয়া প্রধান্য প্রতিপত্তি ও অকথ্য জুল্ম-অত্যাচার। "শেরপুরের ইতিকথা"- এর লেখক ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক, মোহাম্মাদ দেলওয়ার হোসেন উল্লেখ করেন" অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ পর্যন্ত, শেরপুর (দশ কাঁহনিয়া) বাসীর ইতিহাস একটানা দীর্ঘ একশত বৎসরে সংগ্রামের ইতিহাস। এই সংগ্রাম প্রত্যক্ষভাবে পরিচালিত হইয়াছিল, মুসলমান প্রজার উপর, হিন্দু জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং পরোক্ষ ভাবে, অনেক ক্ষেত্রে ইহা ইংরেজ শাসনের উচ্ছেদ কল্পে পরিচালিত হইয়াছিল বলিয়া দেখা যায়।"

মোর্চা শেরপুরের ন্যায়, দশ কাহনিয়া শেরপুরে ও এক সময় ফকির বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। শেরপুরের ইতিহাসে পৃথক একটি অধ্যায়ে ফকির ও সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের কথা আলোচিত হয়েছে। এখানে অধ্যাপক মোহাম্মাদ দেলওয়ার হোসেনের ভাষায় দশ কাহনিয়া শেরপুরের ফকির বিদ্রোহের কিয়দংশ উল্লেখ করা হোল -"অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন পরগনার ফকির ও সন্ন্যাসীদের অভিযান শুরু হয়। শেরপুর পরগনায় শুধু ফকিররা অভিযান করিয়াছিল। এই অঞ্চলে, সন্ন্যাসীদের কোন প্রকার অভিযানের কথা জানা যায়না। কিন্তু শ্রী কেদার নাথ, তাঁহার ময়মনসিংহের ইতিহাসে" এই অভিযানকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে চিহ্নিত করিয়াছেন। অথচ বাস্তব ক্ষেত্রে, শেরপুরে সন্ন্যাসীদের কোন অভিযান চালিত হয় নাই"। অর্থাৎ ফকিররা হলো মুসলীম সম্প্রদায় ভুক্ত, আর সন্ন্যাসীরা হলো হিন্দু সমাজের যাযাবর শ্রেনীর সংসার ত্যাগী মানুষ। বগুড়া, মহাস্তান, শেরপুর ভবানীপুর ঘোড়াঘাট ও দিনাজপুর সহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ ব্যাপী মজনুফকিরের নেতৃত্বে দীর্ঘ দিন বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল। এবং সেই সংগে এতদঞ্চলে কিছু সংখ্যক কথিত নাগা সন্ন্যাসী সীমিত কিছু দিন অভিযান চালিয়ে ছিল বলে জানা যায়। তবে এদের অভিযানে তেমন তীব্রতা ও স্থায়িত্ব লক্ষ্য করা যায়নি।

www.amarboi.org

প্রসংগত উল্লেখিত হয়েছে যে সমকালীন হেতু, উভয় শেরপুরের ইতিহাস নিয়ে কিছুটা টানা পোড়েন হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক (Pre- historic) কালের ইতিহাস চর্চা করতে গিয়ে, কোন কোন ক্ষেত্রে, মোর্চা শেরপুর কে অতিক্রম করে, দশ কাহনিয়াকে উপরে টেনে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। আইনে আকবরীর বরাত টেনে উভয় শেরপুরের ঐতিহাসিক দু'একটি ঘটনা একই সময় সংঘটিত হলেও; অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনার প্রেক্ষাপট ও বৈচিত্র ভিন্ন ও সময়ের ব্যবধান ঢের বেশী। উদাহরণতঃ বর্তমান জেলা শেরপুরে পৌরসভা প্রতিষ্ঠার সময় কালের ব্যবধান লক্ষ্যনীয়। এখানে ১৮৬৯ সালের এপ্রিল মাসে পৌরসভাটি প্রতিষ্ঠিত হয়; আর মোর্চা শেরপুরে উহা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৬ সালে।

প্রচলিত প্রাচীন জনশ্রুতি মতে মোর্চা শেরপুর মাথাপিছু দশ কাহন কড়ি মুদ্রা মাশুল দিতে হতো হেতু শেষোক্ত স্থানটি দশ কাহনিয়া নামে অভিহিত। কিন্তু একথার বিরোধিতা করে শেরপুরের ইতিহাস লেখক জনাব পন্ডিত সাহেব বলেন যে ঐ পরিমান খেয়া মাশুলে এত দূরুত্ব অতিক্রম করা অসম্ভব। বড়জোর, জামালপুর হতে দশ কাহনিয়া পর্যন্ত ঐ ভাড়া গ্রহন যোগ্য হতে পারে। বস্তুতঃ এ বক্তব্যে দশকাহনিয়া নাম করনের কোন বিরোধিতা প্রতিপন্ন হয় না।

বগুড়া জেলার শেরপুর একটি বর্দ্ধিষ্ণ শহর হলেও, নানা প্রতিকুল অবস্থার কবলে পড়ে বিভিন্ন সময়, এটি অনেক ক্ষয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। শেরপুর পৌরসভাটি সাবেক বৃহত্তর,বগুড়া জেলার মধ্যে দ্বিতীয় এবং প্রাচীনত্বে, সমগ্র বাংলায় এটি অন্যতম। প্রাচীন কালে আলোচ্য পৌরসভাটির সার্বিক অবস্থা কি রূপ ছিল, তা উল্লেখ করা কঠিন। তবে প্রতিষ্ঠা লগ্নে উহার পরীক্ষামূলক আদম শুমারীর (Experimental ces,sus) অবস্থা ছিল নিম্নরূপঃ-

গৃহসংখ্যা ৯৭১, লোকসংখ্যা পুরুষ ১৬৫০, স্ত্রী লোক ১৮৫৭ মোট ৩৫০৭ জন। গৃহ প্রতিগড়ে লোক ছিল ৩.৬ জন। ১৮৭২ সালে নিয়মিত আদম শুমারীর (Regular Census) ফলাফল নিম্নরূপ হিন্দু পুরুষ ১৪৮৯, স্ত্রীলোক ১২৮৯ = মোট ২৭৭৮ জন। মুসলমান পুরুষ ৭৫২, স্ত্রী লোক ৬৫২ মোট ১৪০৪ ও অন্যান্য পুরুষ ২৭ স্ত্রীলোক ২৩= মোট ৪৭ জন। সর্বমোট লোক সংখ্যা ৪,২২৯ জন। ১৯৯১ বইসায়ী সালের আদম শুমারী অনুযায়ী অত্র পৌরসভার লোকসংখ্যা নিম্নরূপঃ পুরুষ ৮৩২০ জন, নারী ৭৮৩৮ জন। সর্বমোট ১৬,১৫৮ জন। বাড়ীর সংখ্যা ১৫২৮ খানা। বর্তমানে সমগ্র শেরপুর থানার লোকসংখ্যা ২,২২,২১১ জন। এ সংখ্যার মধ্যে ১,১৩,৫০৫ জন পুরুষ ও ১,০৮৭০৬ জন নারী। মোট ৩২২টি গ্রাম নিয়ে শেরপুর থানা গঠিত। গড়ে ৪৯২.৬ জন লোক প্রতিগ্রামে বসবাস করে। শেরপুর পৌরসভা ব্যতীত অত্র থানায় নয়টি ইউনিয়ন পরিষদ রয়েছে। পরিষদ গুলো যথাক্রমে গাড়ীদহ, সুঘাট খামারকান্দি; সীমাবাড়ী, কুসুম্বী, বিশালপুর, ভবানীপুর, খানপুর ও মির্জাপুর। শেরপুর থানার আয়তন ২৯৬' বর্গ কিলোমিটার।

www.amarboi.org

জাতি সম্প্রদায়

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, শেরপুর ছিল একটি হিন্দু প্রধান শহর। এর চতুষপার্শ্বস্থ এলাকা মুসলমান জন বসতি পূর্ণ হওয়া সত্বেও শহরে মুসলমানদের সংখ্যা তুলনা মুলক ভাবে খুবই কম ছিল। বিগত ১৯৫২ ই সালে আসাম হতে আগত ব্যস্তত্যাগী আশি ঘর মুসলীম পরিবার শহর বেষ্টনীর মধ্যে সরকার কর্তৃক পুনর্বাসিত হওয়ায় এবং পরবর্তী সময় কাজিপুর, ধুনট ও সারিয়া কান্দি ও অত্র থানার বিভিন্ন গ্রাম হতে অনেক মুস্‌লীম পরিবার পৌরসভায় বাসা বাড়ী নির্মান ও বসবাস আরম্ভ করায়, এক্ষণে মুসলীম জন সংখ্যা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। শেরপুর পৌরসভাধীন বসবাসকারী অপরাপর লোকজনের বিবরণ নিম্নরূপঃ ব্রাহ্মণ, গ্রহবিপ্র, বর্ণ বিপ্র, সুবর্ন বনিক, সৌও জালিয়ার প্রাহ্মণ, তিলি, গন্ধ বনিক, কর্মকার, গোয়ালা, কুম্ভশকার, মালাকার, নাপিত, লাড়ী, বৈষ্ণব, সূত্রধর, চুনিয়া (ধাপা বাগ্‌দি) বুনা, হাম, মুচি, পাটনী, চাঁড়াল, মেথর এবং ডোম ইত্যাদি। এদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, কর্মকার , গন্ধ বনিক, সেটও গোয়াল জাতিই অধিক সংখ্যক। মালাকার, নাপিত ও ধোপা এ তিন জাতির সংখ্যা খুবই নগণ্য। অন্যান্য জাতিও মাঝা মাঝি সংখ্যক। বৈদ্য ও কায়স্থ নাই বললেই চলে। মহীপুরে কয়েকঘর দরিদ্র কায়স্থের বসবাস ছিল। বৈদ্যদের কোঠা শূণ্য।

শেরপুরের অধিবাসী প্রাহ্মণগণ সমস্তই বরেন্দ্র শ্রেনী ভুক্ত। কুলীন, কাপ ও শ্রোত্রিয় এ তিন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ অতীতেও ছিলেন আজও আছেন। এখানকার অধিকাংশ ব্যাহ্মণই শ্রোত্রিয় ও কাপ। কুলীন ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতীব নগণ্য। শেরপুরে মহাস্থানী ও দাসপাড়া নামে দুটি পট্টি ছিল, এখনও আছে। দক্ষিনপাড়ার তিলিগন মহাস্থানী এবং উত্তর পাড়ার তিলিরা দাসপাড়া নামে অভিহিত হতো। মহাস্থানীরা মহাস্থান হতে এবং দাস পাড়ার লোকেরা পাবনা জেলা হতে আগত।

পূর্বে তিলিরা বৈবাহিক ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন করতেন। তারা বিভিন্ন শ্রেনীতে (Inter marriaage) বিবাহ সমর্থন করতেননা। কিন্তু পরবর্তী কালে এ ব্যাপারে অনেক শিথিলতা অবলম্বন করা হয়। শেরপুরের তিলিদের মধ্যে অলম্বয়ন, অত্রোসী, ও শান্ডিল্য গোত্রই ছিল প্রধান। শেরপুরের গন্ধ বণিকদের মধ্যে কোন শ্রেনী বিভাগের উল্লেখ নেই। তবে সৌলোক জমিদারগণই এদর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে উল্লেখ করা হয়। এরা নিজদেক রাঢ়ি শ্রেনীভুক্ত বলে দাবী করতেন। এ থেকে অনুমান করা যায় যে, এঁরা রাঢ় দেশ হতে আগত। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট হিন্দুদের শ্রেনী বিভাগ উল্লেখ করা কঠিন। এখানকার ব্রাহ্মণদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব বলে কথিত। শাক্ত ব্রাহ্মণের সংখ্যা অতীব নগণ্য।

www.amarboi.org

শেরপুরের প্রাচীন দেবালয় ও মন্দির সমূহের নমুনা দৃষ্টে প্রতীয়মাণ হয় যে পূর্বকালে এখানকার হিন্দু সমাজ একাগ্রচিত্তে ধর্মমত ও ব্রত উপসানাদি প্রতিপালন করতেন। আমরা জানতে পাই যে একমাত্র শেরপুর শহরেই মোট ৩৫ খানা বৃহদাকার উল্লেখযোগ্য দেবালয় ছিল। এতদ্ব্যতীত পার্শ্ববর্তী মহল্লায় ও অনেকগুলি স্থায়ী দেবালয় নির্মিত হয়েছিল। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে প্রলয়ংকরী ভূমিকম্পের ফলে এখানকার অনেকগুলি বিগ্রহ, দেবালয় অনেক পূর্বেই ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়েছে। আলোচ্য দেবালয়ের অনেকগুলি গাত্রে প্রস্তর খোদিত বিবরণ লিখিত ছিল কিন্তু বিভিন্ন সময় শিলা লিপিগুলো বিদেশী যাদুঘরে অপসারিত হওয়ায় অথবা শিথিল প্রযত্নের ফলে ওগুলো লয় প্রাপ্ত হয়ে থাকবে। আমরা এখানে প্রধান প্রধান দেবালয় গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি।

শহর সংলগ্ন মহিপুর গ্রাম সহ শেরপুরে মোট সাতটি গোপাল দেবালয় ছিল। তন্মধ্যে গোঁসাই ভবনের গোপাল দেবালয়টি ডোমন গিরি গোসাই কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এখানে হর গৌরী মন্দিরটি মুক্তাগাছায় তদানীন্তন জমিদারগণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মন্দিরটি আজও বিদ্যমান। এখানে অবস্থিত প্রাচীন জগন্নাথ মন্দিরটি বগুড়া জেলার জোতুল গ্রামের চৌধুরী উপাধি ধারী জনৈক কায়স্থ জমিদার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে প্রকাশ। কথিত আছে যে এই জগন্নাথ মন্দিরের নামানুসারেই জগন্নাথ পাড়ার নাম করণ হয়েছে। মন্দিরটির দৈর্ঘে ৩০ হাত এবং প্রস্থে প্রায় ২০ হাত ছিল। মন্দিরটি অনুমান ২৭০ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। শেরপুর দক্ষিন পাড়ায় অবস্থিত মহাদেব মন্দিরটির গঠনাকৃতি অতীব সুন্দর এবং কারুকার্য খচিত।

অপরাপর বিগ্রহ

বিগ্রহের নাম	স্থাপয়িতার নাম	সেবার সংস্থান ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য
১। গোসাই বাসার গোপাল	ডোমন গিরি সন্ন্যাসী	দেবোত্তর সম্পত্তি
২। গোপাল	ভগীরথ বিশ্বাস	চাকুরী ও পৌরহিত্য
৩। রাধাবল্লব	কৃষ্ণ কিংকর অধিকারী	দেবোত্তর ও শিষ্য বৃত্তি
৪। রাধা গোবিন্দ	হরিশন্দ্র অধিকারী	"
৫। হর গৌরী	মুক্তাগাছার জমিদার গণ	"
৬। মদন গোপাল	যুগল কিশোর মৈত্র	"
৭। মুন্সী বাড়ীর গোপাল	অনুপম নারায়ণ মুন্সী	"
৮। মহাদেব গোয়াল পাড়া ঘাট	প্রমথ নাথ	মামহারা

www.amarboi.org

৯। মুনসী বাড়ী পাঁচ আনীর মহাদেব	গিরীশ নারায়নণমুনসীদিগর	"
১০। রসিক রায়	গৌর কিশোর কর্মকার মুজুমদার	শিষ্য বৃত্ত
১১। জগন্নাথ	বগুড়া জেলায়র জোতুল গ্রামের জনৈক জমিদার	দেবোত্তর
১২। গুল্লাবাড়ীর রাধাবল্লব	পুনীলচন্দ্র গোস্বামী	দেবোত্তর
১৩। গোপাল	নকড়ি চৌধুরী সৌলোক	মাসহারা
১৪। ছোট গৌরাঙ্গ	নিত্যানন্দ আধকারী	শিষ্যবৃত্তি
১৫। মজুমদার পাড়ার গোবিন্দ রায়	রঘুনাথ চক্রবর্তী	পৌরহিত্য
১৬। বিষ্ণুদেব	কালীচরণ সার্বোভৌমিক	মাসহারা
১৭। তাঁতি পাড়ার অনাদি মহাদেব	শ্যামচন্দ্র মান্যাল	চাঁদা
১৮। ঐ তাঁতি পাড়ার মহাদেব	কৃষ্ণ লাল সান্যাল	
১৯। বাসুদেব	গঙ্গানারায়ণ চৌধুরী	পৌরহিত্য
২০। রাধামাধব	অমৃত চাঁদ আচার্য	
২১। সিদ্ধেশ্বরী মাতা	আনন্দ চন্দ্র তালুকদার	(স্থানান্তরিত)
২২। কালাচাঁদ	চতুর্ভুজ সান্যাল	দেবোত্তর
২৩। মদন গোপাল	গোপাল চন্দ্র ব্রহ্মচারী	শিষ্য বৃত্তি
২৪। কর্মকার পাড়ার মহাদেব	লোচন কর্মকার	চাঁদা
২৫। বড় গৌরাঙ্গ	জেলা বর্দ্ধমান শ্রীখন্ডের বৈদ্য বংশোদ্ভূত ঠাকুর গণ স্থাপিত	দেবোত্তর
২৬। ব্রজ মোহন	কমল চন্দ্র অধিকারী	
২৭। দক্ষিণপাড়ার মহাদেব	নলরায় স্বর্নবণিক	
২৮। লক্ষীতলার বড় বড়ীর মদন গোপাল	রাসবিহারী গোস্বামী	শিষ্য বৃত্তি
২৯। লক্ষীতলার ছোট বাড়ীর গোপীনাথ	গোপাল চন্দ্র গোস্বামী	
৩০। রাধা মাধব বিগ্রহ	রামনাথ অধিকারী	
৩১। নৃত্য কামিনী কালী ভৈরব কেদার নাথ	সারদাচন্দ্র মজুমদার	
৩২। গোপীনাথ	শিবেশ্বর চক্রবর্তী	
৩৩। গোবিন্দ রায়	সাঁতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের পত্নী রানী শর্বানী দেবী সুখময়ী চৌধুরানী	দেবোত্তর
৩৪। রাধাকান্ত	ঐ রানী শর্বানী সুখময়ী চৌধুরানী	দেবোত্তর
৩৫। উত্তর তিলিপাড়ার মহাদেব	রামানন্দ চৌধুরী ও দিগর	

www.amarboi.org

এতদ্বতীত শেরপুর সংলগ্ন মহী পুরে ও কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য বিগ্রহ ছিল। এগুলোর মধ্যে বুড়িতলার বৃদ্ধেশ্বরীর বিগ্রহটি অন্যতম। শেরপুর পৌরসভার উত্তর পার্শ্বে বর্তমান শেরপুর-ঢাকা মহাসড়কের পূর্ব পার্শ্বে প্রথমতঃ একটি বৃহদাকার অশ্বত্থ মূলে মূর্তিটি রক্ষিত ছিল। অতঃপর উহার পার্শ্বে একটি প্রকান্ড তেঁতুল বৃক্ষ গজিয়ে উঠলে পূজারী বৃন্দ বিকল্প হিসাবে উক্ত বৃক্ষের পূজা পার্বণ করতো। হিন্দুগণ বিবাহ ,অন্ন প্রাশন প্রভৃতি শুভ কার্যে যেমন মঙ্গল চন্ডি, বিষহরি ও সুবচনী পূজা দিয়ে থাকেন, তৎসঙ্গে বুড়ির পূজা অবশ্য মনে করতেন। অনার্য কোচ, ডোম মাটিয়াল প্রভৃতি বুড়ির নিকট শূকর ছানা বলি দিত। অনুমিত হয় যে এই বুড়িই শেরপুরের আদি দেবী এবং সম্ভবতঃ ইনি অনার্য গণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পূজান্তে লোকজন বুড়িতলার তেঁতুল বৃক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্ত্র খন্ড ঝুলিয়ে দিত।

প্রাচীন হিন্দু সমাজে গোত্র ও বর্ণ ভেদে নানাদেব দেবীর ব্রত ও উপসনাদি বিশেষ সমারোহে উদযাপিত হতো। সেকালে প্রতিপালিত উৎসবাদির মধ্যে পুষ্প দোল, রথ যাত্রা, ঝুলন যাত্রা, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মী পূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, রাম যাত্রা, সরস্বতী পূজা, দোলযাত্রা, শ্যামাপূজা ও বাসন্তী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে পুষ্পদোল ও ঝুলন যাত্রা আর অনুষ্ঠিত হয়না। পূর্বে সরস্বতী পূজোপলক্ষে এখানে ১৫ দিনস্থায়ী একটি মেলা হতো। এছাড়া বৈশাখে সম্পদ নারায়ন, জৈষ্ঠে আম ষষ্ঠী বা জামাই ষষ্ঠী, শ্রাবণে পদ্মা, ভাদ্রে চাপড় ষষ্ঠি অগ্রহায়নে হরিষষ্ঠি বা কাঁচা ঘটের ব্রত। পৌষে পৌষ পাবণ বা মকর ক্রান্তি, মাঘে ধর্মের ব্রত ও ফাল্গুণে কুলাই মংগল চন্ডির ব্রত প্রভৃতি পালন করা হতো। বর্তমানে হরিষষ্ঠী বা কাঁচা ঘটের ব্রত, মকর ক্রান্তি ও কুলাই মংগল চন্ডির ব্রতআর উদযাপিত হতে দেখা যায়না। পূর্বকালে মকর ক্রান্তি দিবস, বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রতিপালিত হতো। প্রবাদ আছে যে বিরাট রাজার গোগৃহ হতে নির্দিষ্ট সংখ্যক গরু ছেড়ে দেয়া হতো এবং শেরপুর এলাকা উক্ত গো গৃহের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেকালে বগুড়া শহরের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত সুবিলের খাল হতে পাবনা জেলায় (বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলা) অবস্থিত নিমগাছির মহারণ্য পর্যন্ত ছিল গো গৃহের পরিসীমা বিস্তৃত ছিল। গোগৃহ প্রথাটি বিরাট রাজার শাসনামলেই অধিক প্রচলিত ছিল। তখন বিনা রক্ষকে চার মাসের জন্য গরু ছেড়ে দেয়া হতো এবং বৈশাখ মাসে ঐ গরু গুলিকে নিজ নিজ বাড়ীতে পুনরায় ফিরে নেয়া হতো। এক্ষণে গরু আর চার মাসের নিমিত্ত ছেড়ে দেয়া হয়না। বরং মকর ক্রান্তি দিবসে কেবল গরুর শিং ও কপালে সিন্ধুর ও তেল মর্দন করে ছেড়ে দেয়া হয় এবং কিছুক্ষণ হো হো করে গরুকে বিদ্রুপ করে পর্ব সমাপ্ত করা হয়। অধুনা লুপ্ত নিম্নোক্ত ব্রতগুলি পূর্বে এতদঞ্চলে প্রচিলিত ছিল বলে জানা যায়, নিস্তারিনী, কড়াকি, উদ্ধার চন্ডী, শংকট নারায়ণ,ক্ষেত্র নাটাই পাটাই এবং লোটন ষষ্ঠী।

www.amarboi.org

জাতিগত পেশা

শেরপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ পূর্বের ন্যায় এখনও শিষ্য বৃত্তি, খাজন ও চাকুরী করে জীবিকা উপার্জন করে থাকেন। সেকালে গুঞ্জাবাড়ী ও লক্ষীতলার গোস্বামীগণ শেরপুরস্থ হিন্দু সম্প্রদায়ের গুরু জন বলে বিবেচিত হতেন। পূর্বকালে শেরপুরের হিন্দু জমিদারগণই ছিলেন এতদঞ্চলের শ্রেষ্ঠ ধনী। কিন্তু জমিদারী প্রথা রহিত হওয়ার পর হতে, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে। ১৯৪৭ ঈসায়ী সালের পর অনেক হিন্দু জমিদার ভারতে গমণ করেন। এখানকার সাবেক কয়েকটি জমিদার পরিবার এক্ষনে একেবারে দেউলে বনে গেছেন। শেরপুর শহরে বর্তমানে অনেক মুসলীম পাবির ধনেজনে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছেন। এসব ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যে আলহাজ্ব আমির হোসেন, জনাব হাফিজুর রহমান, জনাব মজিবর রহমান মজনু, জনাব রিয়াজ উদ্দিন, জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, আলহাজ্ব আব্দুল মালেক, আলহাজ্ব নঈম উদ্দিন জনাব আবদুল মৌমিন ও সাধারণ ব্যবসায়ী জনাব সুলায়মান আলী অন্যতম। তবে কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে এখানকার হিন্দু ব্যবসায়ীগণই অগ্রগামী রয়েছেন। শেরপুরের কর্মকারেরা লৌহ ও সুবর্ণের একচেটিয়া কাজকরে থাকেন। এককালে এতদঞ্চলে মহাজনী কারবার ব্যাপক হারে প্রচলিত ছিল। তখন মধ্য ও নিম্ন বিত্ত লোকজন মহাজনদের নিকট থালা ঘটি বাটি গহনা পত্র ও জমিজমা বন্ধকীর বিনিময়ে নগদ টাকা গ্রহণ করত। বর্তমানে মহাজনী প্রথা সম্পূর্ণ রূপে রহিত না হলেও, এদের দৌরাত্ম বহুগুনে হ্রাস পেয়েছে। এখানকার গন্ধ গন্ধবণিকগণ, গন্ধ দ্রব্য ব্যাতীত বাসন কোসনের ব্যবসায় করে থাকেন। শেরপুর শহরে বর্তমানে কোন তাঁত ব্যবসায় দেখা যায় না। হিন্দু তন্তবায় গণ তাঁত বুনন পরিত্যগ করে বিকল্প ব্যবসায় করে থাকেন। অত্র শহরেকোন হিন্দু মৎস্যজীবি আছে বলে জানা যায়না। হিন্দু জেলেরা তাদের, পৈত্রিক পেশা পরিত্যাগ করে মুদিখানা ও পান সুপারি প্রভৃতির দোকান করে থাকে। হাড়িগণ নিজেদের মালী বলে পরিচয় দেয় এবং বাদ্য করের কাজ করে। শেরপুরে বর্তমানে কাউকে চাঁড়াল বলে পরিচয় দিতে দেখা যায়না। সম্ভবতঃ এরা যুগের আড়ালে অন্য কোন গোত্রে পরিবর্তিত হয়ে থাকবে। চাড়ালেরা 'নিজেদেক "নমঃশূদ্র" চলে পরিচয় দিত। এদের পেশাগত পরিচয় স্যাকার ও সূত্রধর। বৈষ্ণবেরা বৈরাগী আখ্যার যাথার্থ উপেক্ষা করেছেন। এরা তুল্য অনুরাগে সমস্ত পেশাই করে থাকেন। শেরপুরের করতোয়া নদীর পূর্ব পার্শ্বস্থ গোপালপুর, খামারকান্দি, চন্ডিজান প্রভৃতি গ্রামে বহুসংখ্যক রাজবংশীর বাস। অনুরূপভাবে শেরপুর হতে ৪/৫ কিলোমিটার পশ্চিমে ক্ষিয়ার অঞ্চলে কোচ মাটিয়াল ইত্যাদি গোত্রীয় লোকের বাস আছে। রাজবংশীরা কৃষি কার্য করে জীবিকা নির্বাহ করে। এদের মধ্যে অনেকে আবার লেখাপড়া শিখে শিক্ষকতা ওঅন্যান্য চাকুরী-বাকরি করে থাকেন। কোচেরা পূর্বে কৃষিকাজ ছাড়াও বেহারার কাজ করত। কিন্তু এক্ষণে তারা বেহারা পেশা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেছে। মাটিয়ালরা পূর্বের ন্যায় এখনও চাটাই বুননের কাজ করে থাকে।

www.amarboi.org

শেরপুরের দক্ষিণ পশ্চিমে বাঘমারা, টোলা, বিশালপুর, আমিনপুর, ও ভবানীপুর এলাকায় বিক্ষিপ্ত ভাবে অনেক বুনো বা সাঁওতাল জাতীয় লোক বসবাস করে। এ বিংশত শতাব্দীতেও এদের কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি। এদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যেন, এরা জন্মগত ভাবেই দরিদ্র। নর-নারী নির্বিশেষে এরা সকলেই ক্ষেত খামারে দিন মুজুরীর কাজ করে। বুনো মেয়েরা ধান্যশস্য রোপনে বড় পটিয়সী এদের কথ্য ভাষা সাধারণ্যে বোধগম্য নহে। এরা বাংলা ভাষায় ও কথা বল্‌তে পারে। বুনোরা শিক্ষা দীক্ষায় সকলের পশ্চাতে। সম্প্রতি এদের অনেকেই লেখাপড়া শিখ্‌ছে। এদের আহার বিহারে কোন বাচ বিচার নেই। এরা শিয়াল খরগোশ, বেজি, বন্য শূকর, বুনো পাখী ও মৃত জীব জন্তুও ভক্ষণ করে। আকার আকৃতিতে এরা অপেক্ষাকৃত খাটো বেঁটে। গায়ের রং প্রায়শই কৃষ্ণ। সুশ্রীলোক এদের মধ্যে নেই বললেই চলে। বুনোরা অত্যন্ত পরিশ্রমী। নর- নারী নির্বিশেষে এরা সকলেই তাড়িপানে অভ্যস্ত। এদের অনেকেই ভাল শিকারী, তীর ধনুক ও বাটুল চালনায় এরা খুবই পারদর্শী। এরা বর্ণ হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা পার্বণে অংশ গ্রহন করে থাকে। এছাড়া এরা স্বকীয় ঐতিহ্য মতে বিশেষ সমারোহে ডাল পূজা উদযাপন করে। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাসে বুনোরা এক নাগাড়ে অনেক দিন পর্যন্ত ঝুমুর নাচের অনুষ্ঠান করে থাকে। এরা বহিরাগত জাতি। আজ হতে প্রায় আড়াইশত বছর পূর্বে বুনোরা ভারতের ছোট নাগপুর হতে এখানে আগমন করে। সম্ভবতঃ শেরপুর ও নিমগাছির সাবেক মহারণ্য আবাদ করার জন্যই এদের আগমণ হয়েছিল। শেরপুর শহরে পৌরসভার তত্বাবধানে অনেকগুলি ঝাড়ুদার ও মেথর পরিবার বসবাস করে। এছাড়া কিছু সংখ্যক মুচিও এখানে বসবাস করে। প্রধানত এরা জুতা সিলাই ও মৃত জীবজন্তুর চামড়া সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে। শেরপুর থানার অধিবাসী সকলেই বাংলা ভাষায় কথা বলে। তবে এখানে অবস্থানকারী স্থানীয় ঘোলাগাড়ী কলোনীর কয়েকঘর বিহারী মুসলমান, উর্দ্দ বা হিন্দি ভাষায় কথা বলে থাকে।

ভৌগলিক অবস্থান হিসাবে শেরপুর থানা দুভাগে বিভক্ত, পাললিক এলাকা ও ক্ষিয়ার অঞ্চল। করতোয়া নদীর পূর্বপার্শ্বস্থ এলাকা পাললিক ও নদীর পশ্চিম পার্শ্বস্থ অঞ্চল ক্ষিয়ার ভূমি। এখানকার বর্তমান লোক সংখ্যা ২,২১২১১ জনের উর্দ্ধে। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা৭৫ জন কৃষিজীবি। অবশিষ্ঠ ২৫ জন ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবি। শিক্ষিতের হার ২৪ জন। এ থানায় বসবাস্‌কারী জনগনের শতকরা ৭৫ জনই নিম্নবিত্ত দরিদ্র শ্রমজীবি। বাকী ১৫ জন মধ্যবিত্ত ও দশজন ধনী শ্রেণী ভুক্ত। শেরপুর থানার শতকরা ৯৭ জন লোক কাঁচাঘরে বসবাস করে। অতীতে পাকা ঘর বাড়ী খুবই কম ছিল। তবে বর্তমানে অর্থ পুষ্ট লোকজন পাকা ঘর বাড়ী ব্যাপক হারে তৈরী করছে।

www.amarboi.org

চতুর্থ অধ্যায়

শেরপুরে ইসলাম ও মুসলীম আগমন, প্রাচীন কীর্তি, মুসলিম পর্বাদি ও মাজার

সমগ্র ভূ ভারতই এক সময় নিরংকুশ ভাবে অমুস্‌লীম অধ্যুষিত ছিল। তখন এই উপমহাদেশে ছিল জৈন ও বৌদ্ধদের আধিপত্য। এদেশে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমন কম বেশী প্রায় সমসাময়িক। ইসলাম একটি আনুষ্ঠানিক বিশ্ব মতবাদ। সর্ব যুগের এবং সকল সম্প্রদায়ের অভিন্ন কল্যাণের স্বার্থেই নিবেদিত এই অনন্য ও বিকল্পহীন দ্বীনি অভিযানকে জনপ্রিয় ও গ্রহনযোগ্য করে তূল্‌তে হলে চাই আনুষ্ঠানিক প্রচারাভিযান। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে এবং ক্ষেত্র বিশেষে এর নৈসর্গিক শক্তি একইভাবে অগাধ প্রভাব বিস্তার করতেও সক্ষম বটে। ৭১২ খ্রীষ্টাব্দে আরবীয় মহাবীর,হযরত মোহাম্মাদ বিন কসিমের সিন্ধু বিজয়ের ফলশ্রুতিতে প্রথম বারের মত,ভূ ভারতের সীমিত এক খন্ডাংশে ইসলামের অপূর্ব স্ফুলিং ক্ষণিকের জন্য প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল মাত্র। বল্‌তে গেলে রাজনৈতিক ভাবে,ভূ-ভারতের মাটিতে ইস্‌লাম প্রচারের ইহাই সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ উদ্যোগ বটে। কারণ পরবর্তী কালে এই উপমহাদেশে,রাজনৈতিক ভাবে ইসলাম প্রচারের কোন উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল বলে জানা যায়নি। অন্য কথায় এদেশে ইসলামের সম্প্রচার,বিকাশ ও চর্চার যেটুকু কাজ সাধিত হয়েছে, তার সবটুকুই মুস্‌লীম বণিক, সুফি সাধক ও মুজাহিদদের আত্মত্যাগের কল্যাণেই হয়েছে। ১২০৬ হতে ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত তিন'শ বছরের সুলতানী শাসনামলে কম বেশী ইসলামী অনুশাসনের চর্চা ছিল বটে,কিন্তু প্রচারাভিযানের কোন কার্যক্রম মাত্র ছিলনা তখন। মুঘল শাসনামলে একমাত্র আলমগীর জিন্দাপীর ব্যতীত, অপরাপর সকল সম্রাট বিশেষতঃ মহামতি আকবর ইসলাম প্রচার ও বিকাশের পরিবর্তে এর মূলোৎপাটন কার্যেই যেন অধিক তৎপর ছিলেন। মহামতি সম্রাট আকবার যদি ইসলামের বিরোধিতা না করে, কমপক্ষে নিরপেক্ষ থাকতে পারতেন, তবুও মন্দের ভাল হতো বই কী? কিন্তু তিনি যখন দ্বীনে ইলাহীর মত একটা জঘন্য মনগড়া মতবাদ খাড়া করলেন, তখন ইস্‌লামের দফা রফা না হয়ে

কি পারে? উদাহারণ স্বরূপ,তার অনুসৃত অনেক কিছুর মধ্যে দু একটা, উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্রাট আকবর রাষ্ট্রীয় স্বার্থকে ধর্মীয় স্বার্থের উপর প্রাধান্য দিয়েছিলেন। একই কারণে তিনি সুন্নী সম্প্রদায় ছাড়া সকল সম্প্রদায়ের মন জয় করতে ব্যস্ত ছিলেন। এমনিভাবে দ্বীনে ইলাহীর অবতারণা করে,তিনি কুতবে আলম ও মুজাদ্দিদ খেতাবে বিভূষিত, তাও কেবল এক শতাব্দীর নয় বরং হাযার বছরের মুজাদ্দিদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। দ্বীনি ইলাহীর বিধি গুলির দু'একটি নিম্নরূপঃ এই ধর্মে বিশ্বাসীদেক দৈনিক চার বার, সকাল, দ্বিপ্রহর, বিকাল ও মধ্যরাতে সূর্যের পূজা করা বাধ্যতা মূলক ছিল। (২) সূর্য্যের এক হাজার হিন্দি নাম অজিফা আকারে সূর্যের দিকে তাকিয়ে সকলকে জপ্‌তে হতো। (৩) সুদ ও জুয়া হালাল করা হয়েছিল।

দ্রঃ আলীম সমাজের বিপ্লবী ঐতিহ্য পৃষ্ঠা ১৪

www.amarboi.org

ঐতিহাসিক ভাবেই প্রমাণিত যে, কোন রাজনৈতিক আশ্রয় ছাড়াই ইসলাম,তার স্বাভাবিক শক্তি ও মহিমাতেই ভূ ভারতের মাটিতে প্রারম্ভিক যুগেই অনু প্রবেশ করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্য কথায়,মুসলীম ধর্মানুরাগী বণিক, সুফি-সাধক ও মজাহিদদের অক্লান্ত ও নিরলস প্রচেষ্টায় ইসলাম প্রচারের শুভ ও বিপ্লবী সূচনা হয়েছিল অনেক অনেক দিন আগেই। আমাদের উত্তর বঙ্গও একই সময় ইসলামের শুভ সূচনার স্পর্শ লাভ করেছিল বই কী?

উত্তর বঙ্গে প্রথম যে দিন ইসলামের বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, সেদিন একই সংগে শেরপুরের মটিতেও উহা অনুরণিত হয়েছিল নিশ্চয়। কারণ,তখনকার দিনে শেরপুর ব্যতীত উত্তর বঙ্গের কল্পনা করা ছিল বাতুলতা মাত্র। স্থূল চেতনায় প্রায়শ্চয়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে যে, ইখতিয়ার উদ্দীন মোহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খালজীর বঙ্গ বিজয় ছিল এ অঞ্চলে ইসলাম আগমনের প্রথম সূচনা। কিন্তু সরে জমিনে অনুধাবন করলে,এই উক্তির ভিন্নতাই সূস্পষ্ট হয়ে উঠে। কারণ,অতি সম্প্রতি লালমনির হাট জেলায় যে প্রাচীন মসজিদটি আবিস্কৃত হয়েছে,তাতে প্রমাণিত হয়ে যায়, যে হিজরী ৬৯ সালের পূর্বেই এ অঞ্চলে মুসলমানদের আগমনও ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার শুরু হয়েছিল।

সাপ্তাহিক মুস্লীম জাহান পত্রিকায় ১৬ই চৈত্র ১৩৯৯ এর সংখ্যায় "লালমনির হাটে প্রায় ১৪০০ বছরের প্রাচীন মস্জিদ আবিস্কার,বাংলাদেশে ইসলামের আগমন ইতিহাসে নতুন দিগন্তের সন্ধ্যান" শিরোনামে ওবায়দুর রহমান খাঁন নদ্ভী রচিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি পাঠে জানাযায় যে ডক্টর হাসান জামান ডঃ এনামুল হক, মাওলানা আব্দুল মান্নান তালেব এবং মাসিক মদীনা সম্পাদক মাওলানা মহী উদ্দিন খাঁন উদঘাটিত তথ্যের ভিত্তিতে অভিমত ব্যক্ত করেন যে,বাংলাদেশে ইসলাম আগমন, মুস্লীম শাসকদের আগমনের অনেক পূর্বেই সূচিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক বিবরনীতেও লিপিবদ্ধ আছে যে,আবরীয় ব্যবসায়ীগণ,ভারতের উপকূল বেয়ে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং আরও পূর্ব দিকে জল পথে অগ্রসর হয়ে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া অতিক্রম করে তারা সুদুর চীন দেশে কান্টন বন্দরে উপস্থিত হন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন।

উপরোক্ত তথ্যে বাংলাদেশে ইসলামের আগমন,খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই ঘটেছে বলে প্রমাণিত হয়। এ তথ্য ও নতুন ইতিহাসের একটি শক্তিশালী সমর্থন,আমরা লালমনিরহাটে উনসত্তর হিজরীতে নির্মিত একটি মসজিদের ভগ্নাবশেষ আবিস্কৃত হওয়া থেকে খুঁজে পাই। এ মসজিদটি বাংলাদেশে ইসলাম ও মস্লীম সমাজের অস্তিত্বের ইতিহাসকে আরও বহুযুগ

www.amarboi.org

এগে নিয়ে গেল। দেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা লালমনির হাটের সদর থানাধীন পঞ্চগ্রাম ইউনিয়নের রামদাস মৌজার একটি গ্রামের নাম "মজদের আড়া"। বিগত ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে এই গ্রামের একটি বাঁশের ঝাড় কেটে সাফ করার সময়,কৃষকরা আট/নয় ফুট উঁচু একটি মাটির ঢিবি দেখতে পান। ঢিবিটি সমান করতে গেলে, কোদাল ও শাবলের আঘাতে একটি গম্বুজ বের হয়ে আসে। গম্বুজের গা থেকে কয়েকটি ইট খুলে যায়। এসব ইটের গায়ে নানা ধরনের নক্শা ও ফুল খোদাই করা ছিল। একটি বড় ইটে কালেমায়ে তাইয়্যেবা ও প্রতিষ্ঠা হিজরী ৬৯ সাল লিখিত। এ হিসেবে মসজিদটির বয়স ১৩৫০ বছর। হযরত নবী পাক (সা) এর ইন্তিকালের মাত্র ৫৮ বছর পরই এটি নির্মিত হয়। তাছাড়া ৬৯ হিজরীতে নির্মিত হারানো মসজিদটি আবিস্কারের নেপথ্য কাহিনী নামে একই পত্রিকায় প্রকাশিত জনাব আব্দুল খালেক জোয়ারদার লিখিত,একটি প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে মসজিদটির পার্শ্বে আরও একটি স্বাভাবিক কবরের চেয়ে অনেক উঁচু কবর দৃষ্ট হয়,যা সমসাময়িক কালের বলে অনুমিত হয়।

এসব প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মজদের আড়ার প্রাচীন মসজিদটির অস্তিত্বই সাক্ষ্য বহন করে যে,হিজরী প্রথম শতাব্দীতে উক্ত অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলীম জনপদ গড়ে উঠেছিল। যা হোক,শেরপুর অঞ্চলে ইসলাম ও মুসলীম আগমনের সূত্র উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, উত্তর বঙ্গের যে কোন প্রাচীন তথ্য ও ঘটনা শেরপুরের সম্পৃক্ততাকে অতিক্রম করে নয়। লালমনির হাটের মজদের আড়ায় মসজিদটির অনুরূপ প্রাচীনত্ব এখানে ও সমভাবেই বিদ্যমান। শেরপুর থানার জামুর গ্রামেও অনুরূপ একটি প্রাচীন ক্ষুদ্রাকৃতির মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আজও পরিদৃষ্ট হয়। আরব প্রচারকদের মাধ্যমেই এ অঞ্চলে তাওহীদের বীজ উপ্তও অংকুরিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু তাঁদের নাম ধাম মাত্র জানা যায়নি কোন সূত্রেই। শেরপুরে ইসলাম ও মসলীম আগমনের প্রশ্নে, বিশেষজ্ঞরা প্রচারকদের নাম ধামের উল্লেখ দেখতে চান কিন্তু আদৌ তা সম্ভব নয়,এ জন্য যে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ভূ ভারতের কোন লিখিত ইতিহাসই পাঠকদের গোচরী ভূত হয়নি কখনও।

ইহা ঐতিহাসিক ভাবেই প্রমাণিত যে, হিজরী প্রথম শতাব্দী হতেই শেরপুর তথা উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নব দীক্ষিত মুসলমানরা বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ভাবে, আত্মরক্ষার ভিত্তিতে অবস্থান করতে থাকেন। পালবংশের শাসনামলে সংখ্যালঘূ মুসলমানরা তেমন কোন উৎপাত ও নিপীড়নের সম্মুখীন হয়নি। ক্রমান্বয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রভাবশালী হয়ে উঠতে থাকে এবং পাল বংশের পতনের পর কট্টর পন্থী হিন্দু সম্প্রদায়,দন্ড মুন্ডের মালিক মোখতার হয়ে বসলে, নিরীহ মুসলমানরা নানাভাবে নির্যাতিত হতে থাকে। একথা সত্য যে সংখ্যা লঘূ বিক্ষিপ্ত

www.amarboi.org

মুসলমানগণ কোন নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সুযোগ পায়নি। এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায়, অত্যাচারের মাত্রা চরমে উঠলে,অগত্যা অসহায় মুসলমানরা দিল্লী ও পশ্চিম দেশের সুফি-সাধকদের শরণাপন্ন হয়। একান্ত মানবিক কারণেই তখন, কতিপয় সুফি সাধক পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে অবস্থানকারী অসহায় মুসলমানদের পাশে এসে দাঁড়ান। শান্তিকামী সুফি-সাধকগণ অবশ্যই লড়াকু বেশে এখানে আসেননি। বলতে দ্বিধা নেই যে, নব দীক্ষিত নিরীহ মুসলমানদের জান ও মালের নিরাপত্তা,চরম ভাবে বিঘ্নিত না হলে, সুফি সাধকদেক জীবন বাজি রেখে এখানে আসতে হতোনা। এতদঞ্চলে আগত সুফি সাধকগণ, রাষ্ট্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে কোন উচ্চ বাচ্য মাত্র করেননি। কিন্তু কট্টরপন্থী হিন্দু সামন্ত রাজরাগণ গায়ে পড়েই সংঘাত সৃষ্টি করেন। এর ফলে কয়েকজন সুফি সাধক শাহাদৎ বরণ করেন। তদানীন্তন কালে যারা বগুড়া অঞ্চলে মুসলমানদের নিরাপত্তা ও ইসলাম প্রচারে স্থায়ী অবদান রেখেছেন এবং ভিন্নমত থাকলেও, যাদের সম্বন্ধে প্রামাণ্য লিখিত ইতিহাস রয়েছে, তাঁদের মধ্যে মহাত্মা শাহজালালের সংগী বাবা আদম মক্কী, হযরত শাহ তুরকান বাগদাদী,এবং হযরত সদর উদ্দিন শাহ বন্দেগী রহমাতুল্লাহের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য। তাঁদের সমসাময়িক এবং সতীর্থ দিলাল শাহ বোখারী (আলাইপুর বাঘা, রাজশাহী) শাহ্ মাখদুম রূপোশ বাঘদাদী (দরগাহ পাড়া রাজশাহী) মখদুম শেখ জালালউদ্দিন তাবরিজী (দেওতলা দিনাজপুর) শেখ বদরুদ্দীন (বদিউদ্দীন) শাহ্ মাদার শামী (মাকানপুর, কানপুর, বিহার) ও মখদুম শাহ দৌলা (শাহজাদপুর, পাবনা) এবং স্বয়ং শাহজালাল মুজাররাদ অথবা কুনিয়াভী (সিলেট) প্রমুখ মনীষীদের নাম উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত "তাদের সমসাময়িক অথবা অগ্রগামী এবং বগুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে বসবাস কারি হিসেবে শাহ কামাল(পাইকড়) পাঁচপীর, (তালোড়া) শাহ এতেবার (এতাব্বর তালোড়া) গ্রমুখের অবদান বিশেষভাবে স্মরনীয়।

হযরত শাহ্ জালাল, মাখদুম শাহা দৌলাহ, শাহ মাখদুম গ্রমুখ মনীষীদের জীবন ও কর্মের উপর বিভিন্ন গবেষণা গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও বগুড়ার সাথে সম্পৃক্ত বাবা আদম, শাহতুরকাণ, শাহবন্দেগী প্রমূখ মুবাল্লিগদের জীবন ও কর্মের উপর উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয়নি। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু কিছু কাজ করা হলেও এঁদের বিভিন্ন স্তরের এবং বিভিন্ন স্থানের কর্মকান্ডের মধ্যে সমন্বয় করা হয়নি। ফলে একই নামের একই ব্যক্তি আঞ্চলিক ব্যক্তিত্বে সীমিত হয়ে পড়েছেন। যদ্দরুন এঁরা,ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন কৃতিত্বে চিত্রিত হয়েছেন।

www.amarboi.org

বাবা আদম মকব্বী

বগুড়া অঞ্চলে ইসলাম প্রচার ও মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধান ক্ষেত্রে বা আদম বা বাবা আদমের কৃতিত্ব অপরিসীম। রাজশাহী ও ঢাকা (বর্তমানে মুনশীগঞ্জ) জেলাতেও তাঁর অনন্য কৃতিত্ব রয়েছে। তাঁর অবদান প্রধানতঃ দু'ভাগে মূল্যায়ন করা হয়; যুদ্ধে রাজা বল্লাল সেন কে পরাজিত করা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ী ভাবে ইসলামের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করা। তিনি রাজশাহীর মহাগড়ে, বগুড়ার আদমদিঘী ও শেরপুরে ও বিভিন্ন স্থান হয়ে বা বিজয় করে বর্তমান মুনশীগঞ্জ জেলার রামপালে অত্যাচারী রাজা বল্লাল সেনকে পরাজিত করে হিন্দু শাসন বা সেনবংশের অবসান ঘটিয়ে এই সব অঞ্চলে ইসলাম প্রচার এবং ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও,তাঁর আগমনের সময় কাল,প্রতিপক্ষ রাজা বল্লাল সেনের পরিচয় এবং মৃত্যুর পর (রাজশাহী দরগা পাড়া) বগুড়ার আদমদিঘী এবং ঢাকার আবদুল্লাপুরে অবস্থিত দরগাহ ও কবর তিনটির কোনটিতে শায়িত আছেন, এসব সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে ভীষণ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় জন-শ্রুতি, দরগাহ খাদেমদের বর্ণনা এবং প্রাপ্ত তথ্য উপকরণের ভিত্তিতে রচিত বিভিন্ন ইতিহাসে,তাঁর কৃতিত্ব কে স্থান বিশেষের মধ্যেই সীমিত করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বাবা আদমের বস্তু নির্ভর ইতিহাস রচণার উদ্দেশ্যে নীচের কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে আলোচনা করা সমীচীন মনে করি।

বাবা আদামের আগমনকালঃ- এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ দ্বিমত পোষণ করেন। একদলের মতে তিনি মুসলীম বিজয়ের আগে(১২০৪ খৃঃ) এবং অন্যদলের মতে দিল্লী সালতানাত প্রতিষ্ঠার পরে গিয়াস উদ্দিন বলবন বা তাঁর উত্তর সুরী নাসির উদ্দিন বোগ্‌রা খাঁর,শাসনামলে এই অঞ্চলে আগমন করেন এবং ইসলাম প্রচারের সাথে সাথে মুসলীম বিজয়েও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। বাবু প্রভাষসেনঃ বগুড়ার ইতিহাসে (প্রথম সংস্করণ, ১৯১২,পৃষ্ঠা ৮৭ পাদটীকায়) মির্জা আরজুমন্দ ও মুনশী সূরয নারায়ণ বিরচিত তারিখে বাংগালা, উর্দ্দু ভাষায় লিখিত " সুলতান বলখী" নামক পুস্তুকের বরাতে লিখেছেন"ঃ হিজরী ৪৩৯ (১০৪৭ খৃঃ) রাজা বল্লাল সেনের বহুপূর্বে শাহ সুলতান বল্‌খী নামক একজন মুসলমান ফকির মহাস্থান বা পৌন্ড্রবর্ধনের শেষ সামন্ত রাজা পরশুরামকে পরাস্ত করিয়া, উত্তর বংগে ইসলাম প্রচারের সূত্রপাত করিয়া ছিলেন। সম্ভবতঃ ইহারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া রাজা বল্লাল সেনের রাজত্ব কালের শেষভাগে বাবা,আদম, শাহ্‌জালাল, শাহতুরকাণ প্রভৃতি মুসলমান ধর্ম প্রচারকগণ,ইসলাম প্রচারের নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ভারতের নানাস্থানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে ছিলেন। বল্লালসেন সেই সমস্ত ইসলাম

www.amarboi.org

প্রচারকগণের মধ্যে বা আদম ও শাহ তুরকাণকে যুদ্ধে নিহত করত বঙ্গে ইসলাম প্রচারের স্রোত কিয়ৎকালের নিমিত্ত প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। সর্বকালে সর্বদেশে এই রূপ ভাবে উদীয়মান জাতি সমূহ কর্তৃক রাজ্য বিস্তার সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। রাজ্য বিস্তারের এই সনাতন বিধির প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই এই সমস্ত মুসলমান গাজিগণ যে, ইক্তিয়ার উদ্দীন কর্তৃক রাজ্য বিজয়ের বহু পূর্বে এদেশে ধর্ম প্রচারার্থে আগমন করিয়াছিলেন, তাহাই অধিক সম্ভব বলিয়া মনে হয়। আমাদের মতে কথিত বল্লাসেন বিজয়পুত্র, সম্রাট বল্লাল সেন হইতে অভিন্নবটেন।" কিন্তু মিঃ সেন পরবর্তীকালে তারিখে বাংগালার বক্তব্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে তাহার প্রথম মত পরিবর্তন করেন। (মহাস্থান এন্ড ইটস ইনভায়রন মেন্টস দ্রষ্টব্য)

কাজি মেছের বলেনঃ "সুলতান বলখী কর্তৃক মহাস্থান অধিকৃত হইবার কয়েক যুগ পরে -----মাহী সওয়াবের প্রভাব বিস্তৃতির ফলে যাহারা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইতেছিলেন ও বল্লালের বর্ণ বৈষম্যের চাপে যাহারা সেনরাজার অধীনতা বা নাগপাশ ছিন্ন করিয়া সনাতন ইসলামের সাম্য মন্ত্রে আশ্রয় লইতেছিলেন, তিনি তাহাদের উপর অকথ্য শালীনতা হীন পাশবিকতা আরম্ভ করিয়াছেলেন। ঠিক এমনি সময় বাবা আদম একদল সহচর সহ পশ্চিম হইতে এদেশে আগমন করিয়া বগুড়া জেলার আদম দীঘিতে প্রথম মঞ্জিল স্থাপন করেন।"

বাবা আদম সর্ব প্রথমে উত্তর বঙ্গের আদম দীঘিতে (বগুড়া) এসে অবস্থান করেন, যার জন্যে ঐ স্থানের সাবেক নাম পরিবর্তিত হয়ে আদম দীঘি হয়েছে। পানীর সংকট নিবারনের জন্যে রাতারাতি বিরাট এক পুকুর খনন করেন এবং ইহা অলৌকিক বা কেরামত হিসেবে প্রকাশ পায়।

মাওলানা রুহুল আমিন অনুমান করেছেন যে,বাবা আদমের সঙ্গী তুরকাণশা'র, বাহিনীর সঙ্গে বগুড়ার মোর্চচা শেরপুরে,রাজা বল্লাল সেনের বাহিনীর সাথে এক প্রচন্ড যুদ্ধ হয়েছিল। এটাই ছিল মুসলীম বাহিনীর সাহিত রাজা বল্লালের প্রথম যুদ্ধ। চল্লিশ আউলিয়া গ্রন্থ মতে শাহ তুরকাণ, বাবা আদম ও শাহ্ জালাল একত্রে ধর্ম প্রচার নিমিত্ত এদেশে আগমন করেছিলেন।

শেখ শুভোদয়ার মতে শাহ্জালাল, রাজা বল্লাল সেনের সময় বর্তমান ছিলেন। অধিক সম্ভব, শাহ তুরকাণ,বাবা আদম ও শাহ্ জালাল,বল্লাল সেনের রাজত্বের শেষ ভাগে এতদঞ্চলে ধর্ম প্রচারার্থে এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। তন্মধ্যে শাহতুরকাণ ও বাবা আদম, বল্লাল সেন কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হয়েছিলেন।

www.amarboi.org

গুলজার-ই-আবরার ও সুহাইল-ই-ইয়ামান এর বর্ণনা মতে, শাহজালাল, তাঁর মুর্শিদ সৈয়দ আহমাদ এর অনুমতি, খেলাফত,প্রচার স্থানের নমুনা মাটি, কবুতর সহ,বাবা আদম, শাহ তুরকান, শাহ বন্দেগী, শাহ রায়হান ইত্যাদি শিষ্য পরিবেষ্ঠিত হয়ে আনুমানিক ১২৯১ হতে ১২৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে মুলতানের উচ থেকে বহির্গত হয়ে,মুসলীম রাজধানী গৌড়ে অবস্থান করেন। অন্যসূত্র মতে,প্রথমে তাঁরা দিল্লীর নিযাম উদ্দিন আউলিয়ার দরবারে গমন করেন এবং কবুতর গ্রহন করেন। অন্য এক বর্ণনা মতে তাঁরা আজমীরে খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্‌তির (১১৪২-১২৩৬) দরবারে অবস্থান করেন এবং আব্দুল্লাপুর অথবা শেরপুরের জনৈক মুসলমানের গরু কুরবানী করার অপরাধে, রাজা বল্লাল সেন কর্তৃক তার পুত্র নিহত করার লোমহর্ষক কথা শুনে,মুরশিদের আদেশে বঙ্গ দেশে যাত্রা করেন।

ঢাকা অঞ্চলের জন শ্রুতি মোতাবেক রাজা বল্লাল কর্তৃক নিগৃহীত মুসলমান ব্যক্তিটি মককা শরীফে গিয়ে বৃত্তান্ত জানালে,বাবা আদম শিষ্য বর্গ সমবিভ্যাহারে, বাংলাদেশে আসেন এবং রাজা বল্লাল সেনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। রাজা জয়লাভ করেন,এবং বাবা আদম শহীদ হন। কিন্তু ভাগ্য দোষে রাজা সপরিবারে অগ্নিকান্ডে ঝাপ দিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। ডক্টর ওয়াইজ ম্যান, এই মত সমর্থন করেন। বগুড়ার জন শ্রুতিতে এই দলের সাথে আজমীর থেকে আগত দলের মিলন হয় রাজধানী গৌড়ে এবং যৌথভাবে উভয় দল অত্যাচারী রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারন করেন। অন্যসূত্রে বলা হয় যে,বাবা আদম,শাহতুরকাণ, শাহ বন্দেগী প্রমুখদের প্রাথমিক কার্যকলাপের সাথে,শাহ জালালের সাক্ষ্যৎ ছিল আকস্মিক। অনেকের মতে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন সময়ে বহির্গত হলেও বাংলার মুসলীম রাজধানী গৌড় বা লাখনৌতে তাঁরা একত্রিত হয়ে মুস্‌লীম শাসকদের সহিত মিলিত হয়ে, মুসলীম শাসকদের সাথে,বাংলার ভিন্ন স্থানে বিজয় সম্পন্ন করার জন্য অথবা বিদ্রোহী হিন্দু রাজা কিংবা মুসলীম বিদ্বেষী রাজাদের শায়েস্তা করে ইসলাম প্রচার অথবা মুসলীম সমাজ গঠন ও নিরাপত্তা বিধানে আত্ম নিয়োগ করেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেই তাঁদের চলার পথে,বহু স্থানে হিন্দু রাজাদের সংঘর্ষ হয়। হযরত শাহ জালাল মূল নেতা এবং বাবা আদম সেনাপতি হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। বিভিন্ন বিজিত স্থানে প্রতিনিধি এবং মুবাল্লিগ রেখে,হযরত শাহ্ জালাল ৩১৩ অথবা ৩৬ জন সহচর নিয়ে ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে সিলেটে উপনীত হন।

www.amarboi.org

প্রয়োজনীয় তথ্য-উপকরণ না থাকায়,উপরে বর্ণিত বিবরণ সমূহ খ্যাতিমান গবেষকদের গবেষনায় বিস্তারিত উল্লেখ নেই। ডঃ এনামুল হক ছিটে ফোটা আলোচনা করেছেন মাত্র। ডঃ আবদুর রহীম অধিকাংশ ক্ষেত্রে নীরবতা অবলম্বন করেছেন। ডঃ করিম ঢাকার আবদুল্লাপুর ছাড়া অন্যত্র বাবা আদমের কার্যকলাপের কোন কথা বলেননি। বরেন্দ্র গবেষক ডঃ ইয়াকুব আলী,বাবা আদমের বিশদ কিছু লেখেমনি। কাজি মিছের আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেও জোড়া তালি ছাড়া কিছুই উদ্ধার করতে পারেননি। উনবিংশ শতকে কয়েকজন ইংরেজ গবেষক প্রত্নতত্ব বিদের কয়েকটি প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকার্শিত হলেও গ্রহনযোগ্য সিদ্ধান্ত নেই।

এ বিষয়ে সবচেয়ে বেশী শ্রম, মেধা সময় এবং অর্থ ব্যয় করেছেন অধ্যাপক মোহাম্মাদ আলী। তিনি কালু গাজি চাম্পাবতী উপাখ্যানের ঐতিহাসিকতার উপর গবেষণা করতে গিয়ে বাংলার পীর আউলিয়াদের এবং সমকালীন শাসকদের ভূমিকা উল্লেখ করে, বাংলার ইসলাম প্রচারের সাথে সম্পৃক্ত মনীষীদের বিশেয়তঃ বাবা আদম, শাহ তুরকাণ প্রমুখদের ইতিহাসের ধারা বাহিকতা সৃষ্টি করেছেন।

জনাব মোহাম্মাদ আলীর বিক্ষিপ্ত আলোচনার সাথে অন্যান্য উপকরণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আগন্তকরা প্রথমে গৌড়ে,গৌড় থেকে রাজশাহী, রাজশাহী হতে বগুড়ার আদমদীঘি, আদমদীঘি হতে শেরপুরে এবং সেখান হতে বাবা আদম ঢাকার আব্দুল্লাহপুরে, হযরত শাহজালাল সিলেটে, শেখ আলী ইয়াম্যানি মাখদুম শাহ দৌলা শাহজাদপুরে এবং শাহতুরকাণের মৃত্যুর পরে শাহবন্দেগী শেরপুরে ধর্ম প্রচারে নিবেদিত হন। রাজশাহীর হযরত মাখদুম রূপোশ ও একই ধারায় মিলিত হন।

বাবা আদম সম্বন্ধে তিনি বলেনঃ শেরপুর তথা উত্তর বংগে রাজা দ্বিতীয় বল্লালের সাথে প্রথম দফা যুদ্ধ শেষ হলে, তিনি মুসলীম বাহিনী সহ পূর্ব বংগের বিক্রমপুরে চলে গিয়ে বল্লালের সাথে দ্বিতীয় ও শেষ যুদ্ধে তাকে পরাজিত করলে রাজা অগ্নিকুন্ডে প্রাণ বিসর্জন করেন।

আনন্দ ভট্টের বল্লাল চরিত মতে বাবা আদম (বায়াদুম্ব) এবং রাজা বল্লাল সেনের যুদ্ধ মুসলীম বিজয়ের আগেই সংঘটিত হয়েছিল।

ডঃ ওয়াইজ ম্যানের মতে বাবা আদম বল্লালের হাতে শহীদ হন।

মাওলানা রুহুল আমিনের মতে বাবা আদম আবদুল্লাহপুরে শহীদ হননি। তারিখে বাংগালার বর্ণনা অনুসরণে মৌলভী নূরুল হোসেন কাসেমপুরী এবং রুহুল আমিন সাহেব বিশ্বাস করেন যে পুর্ব বংগে ইসলাম প্রচার ও রাজ্য বিস্তার করে মহর্ষী বাবা আদম আজমীর শরীফে প্রত্যাগমন কালে বগুড়ার আদম দীঘিতে ইহলোক পরিত্যাগ করেন এবং তথায় সমাহিত হন।

www.amarboi.org

ঢাকার (মুন্‌শীগঞ্জ) রামপালে,সেন রাজাদের প্রাচীন রাজধানীর প্রায় অর্ধমাইল উত্তর দিকে,কাজী কসবা গ্রামে বাবা আদমের মাযার ও মসজিদ অবস্থিত। মসজিদের উৎকীর্ণ শিলা লিপি মতে মসজিদটি ৮৮৮ হিজরী/১৪৮৬ খ্রীঃ সুলতান জালাল উদ্দিন ফতেহ্ শাহের কর্মচারী, মালিক কাফুর নির্মাণ করেন। মস্‌জিদটি বাবা আদম নামে আখ্যায়িত করা হলেও তাঁ উল্লেখিত নেই। বাবা আদমের নামে প্রচলিত মসজিদ সংলগ্ন কবরের উপর এমন কোন অকাট্য প্রমাণ নেই, যাতে বলা যেতে পারে যে,বাবা আদম শহীদ এখানেই সমাধিস্থ আছেন।.এই সমাধির শীর্ষদেশে উৎকীর্ন শিলা লিপির পাঠোদ্ধার থেকে জানা যায় ৯১৩ হিজরীর সাতই রবিউস্‌সানী (১৫.১০.১৫০৭ খৃঃ) তারিখে মাযারটি নির্মিত হয়েছে। বল্লাল চরিত্রের বর্ণনা মোতাবেক,বাবা আদম ও রাজা বল্লাল সেনের যুদ্ধ মুস্‌লীম বিজয়ের আগে হয়ে থাকলে বাবা আদমের মৃত্যু সন কমপক্ষে ১২০৪ খৃঃ ধরতে হবে। এক্ষেত্রে এই সমাধি সৌধের নির্মাণ তারিখ (১৫০৭) হলে মৃত্যু সন (১২০৪) বাদ দিলে ব্যবধান দাঁড়ায় ৩০৩ তিন শত তিন বছর। আবার মৃত্যু সাল ১৩০০ খৃঃ ধরা হলে ব্যবধান দাঁড়াবে ২০৭ দু'শত সাত বছর। এই দীর্ঘ দিন একটি কাঁচা কবরের চিহ্ন থাকার কথা নয়। এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সংগত ভাবেই এই সিদ্ধান্তে আস্‌তে সাহায্য করে যে,বাবা আদমের নামীয় মাযারটি নিছক কিংবদন্তী ও অনুমান মূলে সৃষ্ট। আদপে এটা প্রকৃত মাজার নয়। তবে স্থানটা বাবা আদমের অবস্থিতির স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে, বিবেচনার যোগ্য। প্রসংগত উল্লেখ্য যে প্রাথমিক যুগের ধর্ম প্রচারকরা,যেসব অঞ্চলে যাতায়াত করতেন, পরবর্তীকালে, কোন কোন স্থানে ভক্তিভরে তাঁদের নামে মাজার গড়ে উঠেছে। চট্টগ্রামের বায়জিদ বোস্তামীর মাযার এবং বগুড়া-গাইবান্ধা জেলার প্রান্ত সীমায় স্বাধীনতার পর গড়ে উঠা মাজারটি এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

আবদুল্লা পুরের কবরনিয়ে সন্দেহ বিদ্যমান, কিন্তু আদমদীঘি.কবর সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই বললেই চলে। বাবা আদমের সাথে,রাজা বল্লাল সেনের কোথা কতবার যুদ্ধ হয়েছিল তা বলা দুষ্কর। তবে দু'বার যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল একথার উল্লেখ রয়েছে। তাওয়ারিখে বাংগালাও তাবকাতে নাসিরীর মতে,এই যুদ্ধ বংগের পূর্বতন রাজধানী গৌড় ও সুর্বণ গ্রামের মধ্যবর্তী কোন স্থানে সংঘটিত হয়েছিল। বাঙালার ইতিহাস, ঢাকার ইতিহাস, তাওয়ারিখে জাহাঙ্গীর নগরী, ঢাকার প্রাচীন বিবরণ, সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস প্রভৃতিতে আবদুল্লাপুরে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বলে উল্লেখিত আছে। ভাওয়ালের ইতিহাসে লিখিত আছে

www.amarboi.org

যে, "রাজা দ্বিতীয় বল্লাল, মহর্ষী বাবা আদম প্রমুখ কয়েক জন ফকিরের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলে পূর্ব বঙ্গে মুসলমান রাজ ও প্রভাব স্থায়ী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাহাদুর খাঁ নামক জনৈক মুসলমান পূর্ব বঙ্গের শাসন কর্তা রূপে নিযুক্ত হন।" তাওয়ারিখে বাঙ্গালা পাঠে জানা যায় যে, মহর্ষী বাবা আদম,বঙ্গদেশে মুসলমান বিদ্বেষী বিধর্মীগণকে যুদ্ধে পরাজিত করে বাহাদুর খাঁ নামক শাহজাদাকে রাজ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করতঃ আজমীর শরীফে প্রত্যাগমন কালে পথে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। হযরত মাওলানা রুহুল আমীন মন্তব্য করে বলেনঃ "এই স্থানটি বগুড়া মোর্চচা শেরপুর হইবে কারণ , এই স্থানে রাজা বল্লাল সেনের বাড়ীর প্রমোদ ভবন, কাছারী ভবন,দেবালয়, ধান্য গোলা ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ আছে। অনেকেই সেই স্থানগুলি অংগুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া থাকেন। ছোট বড় সকলেই বলেন, দরবেশ গাজী গণ এই স্থানে,বল্লাল সেনের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই স্থানে শহীদ ও সমাহিত হন। সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাস ও ঢাকার প্রাচীন বিবরণে উল্লেখিত হয়েছে যে নামাজ-রত বাবা আদমকে অতর্কিতে বল্লাল, আঘাতের পরে তরবারির আঘাত করিলেও কেশাগ্রও ছিন্ন হয় নই- কিন্তু তাহার সংগীদের একজন ফকিরের প্রাণ বিয়োগ ঘটে। ইহাতে অনুমিত হয়ে যে এই নিহত ফকিরই শাহ্তুরকাণ যিনি শেরপুরে চির নিদ্রায় শায়িত আছেন।"

আমাদের কথা

হযরত মাওলানা রুহুল আমীন নিঃসন্দেহে তদানীন্তন আসাম বাংলার অন্যতম আলীম, প্রসিদ্ধ প্রচারক, অসাধারন যুক্তিবাদী এবং ইসলামের ঐতিহ্য সন্ধানী ঐতিহাসিক ছিলেন। ওয়াজ নসিহত ও পীর মুরীদীর উদ্দেশ্যে সমগ্র বাংলা পরিভ্রমনের সময় জনশ্রুতি, ও প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান সমূহের সহিত তিনি নিজস্ব চিন্তা চেতনার সমন্বয় ঘটিয়ে বাবা আদমের সাথে রাজা বল্লাল সেনের যুদ্ধ, যুদ্ধের স্থান যুদ্ধের পরিনাম এবং ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে শেরপুরেই এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে বলে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তা যেমন যুক্তি সংগত এবং পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাবলী দ্বারা ও সমর্থিত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, শেরপুরেই এই নিষপত্তি মূলক যুদ্ধ হয়েছিল কারণ, তুরকাণ শহীদের ধড় মোকাম ও সির মোকাম নামক মাযার দুটিই তার জীবন্ত প্রমাণ।

www.amarboi.org

মুসলমানী পর্বাদি ও মাজার

বাংলা ভারতের বিভিন্ন স্থানের ন্যায় শেরপুরের মুসলমান গণ ও হিন্দু উত্তর কালেই এখানে অস্তিত্ব লাভ করেছে সত্য- কিন্তু পরবর্তীকালে এদের সংখ্যা যেহারে বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে হিন্দু সম্প্রদায় অগ্রবর্তী হওয়ার পরও মুস্‌লীম জনসংখ্যাকে অতিক্রম করতে পারেনি। জমিদার আমলের শেরপুরে মুসলমানদের ঠাঁই না হলেও প্রাচীন মোর্চচা শহরে এদের সংখ্যা মোটেই কম ছিলনা। আমাদের এ বক্তব্যের অনুকূলে W.W. Hunter এর "A statistical Accounts of Bengal" হতে উদ্ধৃতি পেশ করতে পারি। তিনি বলেন- "Though the town is remarkable for the large number of Hindu inhabitants, it is surrounded on all sides by places wholy for the Muslims" অর্থাৎ শহরটি (শেরপুর) বিপুল সংখ্যক হিন্দু পরিবারের বাসস্থান হলেও এর চতুষ্পর্শ্বস্থ এলাকা সমূহ মুসলমানদের পবিত্র স্থান দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং এটা মোটেই অমূলক নয় যে, মোর্চ্চা উত্তর কালে এই শহরটির বিস্তৃতি ছিল সুবিশাল এবং মুসলীম নাগরিক সংখ্যা ছিল বেশুমার।

জামিদারী আমলের গোড়া পত্তন হতে শেষ নাগাদ, এ শহরে কোন উল্লেখযোগ্য মুসলীম পরিবার ঠাঁই করে নিতে পারেনি। সেকালে শহরের মুসলমানদের মধ্যে আমরা মরহুম কেরামত আলী খন্দকার ও কাজি আনোয়ার আলী খাঁনের নাম উল্লেখ করতে পারি। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুসলমান না থাকায়,এ শহরে প্রথমাবস্থায় কোন মসজিদ নির্মিত হয়নি। পরবর্তীকালে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকলে,এই শহরের দু' প্রান্তে অর্থাৎ দক্ষিণাংশে বারদুয়ারী পাড়ায় এবং উত্তর প্রান্তে উলিপুরে দুটি ছোট আকারের মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য প্রাচীন আমলে এই শহরের হাজীপুরে ও একটি ঐতিহাসিক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। প্রায় তিন শত বছর পর্যন্ত মস্‌জিদটি মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকার পর, সম্প্রতি কিছুদিন পূর্বে উহার প্রাচীন অস্তিত্ব উদ্ধার করা সম্ভব হয়। কাদিম জামে মসজিদ নামে অভিহিত,উক্তটি মস্‌জিদটি পুনরায় সাবেক স্থানে নতুন ভাবে নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে,বর্তমানে অত্র শহরের মুসলমানদের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় এখানে, এক্ষণে ছোট বড় ২১টি পাকা মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

অধুনা শেরপুর শহরে আমরা অনেক ক'টি প্রাচীন মুসলমানদের মাজার দেখতে পাই। এদের ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত। সম্ভবতঃ এরা হিন্দু সমাজ প্রতিষ্ঠার অনেক পূর্বেই এখানে আগমন করে থাকবেন।

www.amarboi.org

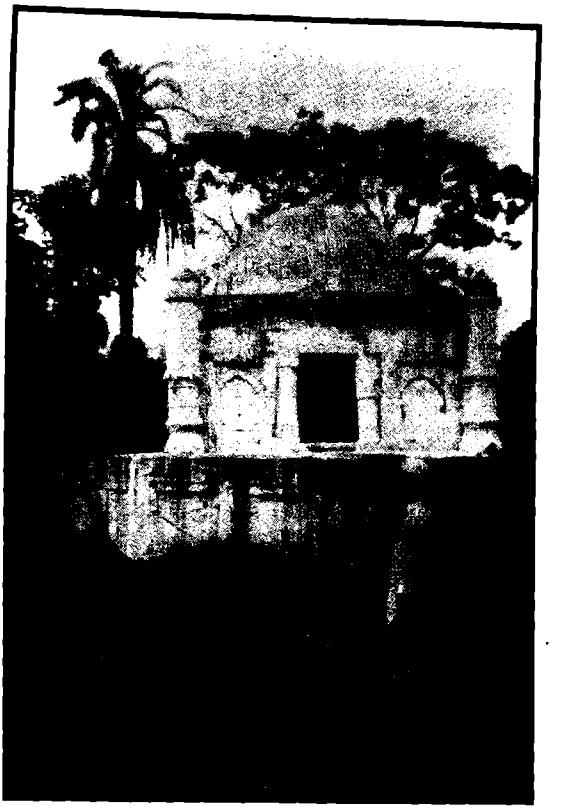

হযরত শাহ তুরকান (রঃ)
এর সির মোকাম

খন্দকার টোলায় অবস্থিত হযরত শাহ বন্দেগী (রঃ) সমাধি

www.amarboi.org

শেরপুরের সে আমলের মুসলীম প্রাচীন কীর্তি সমূহের অধিকাংশই এখন বিলুপ্তির পথে। মহাকালের মহাদুর্যোগ অতিক্রম করে যে ক'টি অমর কীর্তি এখনও ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত হয়ে আছে,তম্মধ্যে শহীদ তুর্কাণের 'সির মোকাম ও ধড় মোকাম, হযরত সদরুদ্দীন বন্দেগী (রঃ) এর মাজার, খেরুয়া মস্‌জিদ, বিবির দরগাহ্ টোলার মসজিদ, মিঞার থান হটিলার থান ও শিহাব উদ্দিন বা শাহ মাদারের আস্তানা , গাজিপীরের দরগাহ,বিচারালয়ের ধ্বংসাবশেষ, পাঠান-টোলা,মোঘল টুলি, মির্জাপুর, সেলিম নগর প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কথিত আছে যে,প্রাচীন শেরপুর শহরও শহরতলি বেষ্টনীর মধ্যে অন্যূন ৩৬০ জন অলি আউলিয়া,কুতব-দরবেশ সমাহিত আছেন। এদের কয়েকজন ছাড়া বাকী অধিকাংশরই ব্যক্তিগত পরিচয় ও সঠিক আগমন কাল আজও অপরিজ্ঞাত রয়েছে। কারণ, এঁরা কোন শাসক গোষ্ঠীর পক্ষপুটে আশ্রিত ছিলেননা বরং ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়েই স্বেচ্ছায় এখানে আগমন করেছিলেন। বগুড়ার ইতিহাস ২য় খন্ডে (৭৭ পৃষ্ঠা) লিখিত আছে "অনেকে মনে করেন, ইখ্‌তিয়ার উদ্দীন বিন বখ্‌তিয়ার খিলজির পূর্বে গৌড় বঙ্গে মুসলমান প্রবেশ করেন নাই, কিন্তু একথা প্রকৃত বলিয়া সমর্থন করা যায়না। সুবিখ্যাত ভারত বিজয়ী সুলতান মাহ্‌মুদের ভারত আক্রমনের (১০১৭-১০১৯) পর হইতে,দলে দলে মুসলমান ধর্ম প্রচারক ভারতের সর্ববদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়া ছিলেন এবং সুলতান মাহমুদের বিখ্যাত সেনাপতি সৈয়দ ছালার মাসউদ গাজির প্রভাবে ভারতের নানা দেশে মুসলমানগণ উপ নিবেশ ও মসজিদ সমূহের প্রতিষ্ঠার সূত্র পাত হইয়া ছিল"। বিশ্বকোষ ভারত বর্ষ দ্রষ্ঠব্য।

ভূ ভারতে ইসলাম ও মুসলীম আগমন কাল সংক্রান্ত উল্লেখিত বিবরণ অবাস্তব তো নয়ই বরং সর্ব শেষ তথ্যানুযায়ী জানা যায় যে সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমনের অনেক পুর্বেই আজ হতে ১৩৫০ বছর আগে হিজরী ৬৯ সাল নাগাদ এদেশে ইসলাম ও মুসলীম আগমন সূচিত হয়েছিল। আমরা এক্ষণে শেরপুরে অবস্থিত ঐতিহ্য মন্ডিত মুসলীম সুফি-সাধক ও মুজাহিদদের মাজার সম্পর্কে আলোকপাত করতে চাই। "সির মোকাম ও ধড়মোকাম" নামে অভিহিত এখানে অবস্থিত যে দুটি প্রাচীন স্মৃতি বহুল মাজার পরিদৃষ্ট হয়, তা, শহীদ মর্দে মুজাহিদ ও মহান বীর হযরত শাহ তুরকাণ বাগদাদির মাজার নামে সুপরিচিত। প্রায় অর্দ্ধ মাইল ব্যবধানে উত্তর দক্ষিণ সমান্তরাল ভাবে একই ব্যক্তির দুটি মাজারের অস্তিত্ব বাস্তবিকই এক অস্বাভাবিক ব্যাপার বটে। একই ব্যক্তির একাধিক কবর থাকা আদৌ সমর্থন যোগ্য নয় এবং ইহা নানা বিভ্রান্তি ও সন্দেহের উদ্রেক করে থাকে। এতদসত্বেও কোন কোন বিশিষ্ট সুফি সাধকের

www.amarboi.org

নামে একাধিক কবরের কথা জানা যায়। উদাহরণতঃ হযরত বায়জিদ বোস্তামীর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। একই ভাবে বাংলাদেশে ইসলাম প্রচারার্থ আগত সুফি মুজাহিদ, বাবা আদমের তিনটি কবরের কথা উল্লেখিত আছে। বস্তুতঃ বাবা আদম নির্দ্দিষ্ট একটি মাত্র কবরেই সমাহিত আছেন বই কী? সম্ভবতঃ অপর দুটি কবর তাঁরই দুজন শহীদ সহযোদ্ধার হয়ে থাকবে। সহযোদ্ধা দুজনের পরিচিতি উল্লেখযোগ্য না হওয়ায়,একই যুদ্ধে শহীদ হওয়া সত্বেও কবর দুটি তাদের নামে প্রচারিত হওয়ার, পরিবর্তে উক্তযুদ্ধের সেনাপতি ও দলনেতা বাবা আদমের একক নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। আর এভাবেই তিনটি মাজারই বাবা আদমের নামেই প্রচারিত হয়ে আসছে। এদিকে সির মোকাম ও ধড় মোকাম নামে পরিচিত কবর দুটিও একই ব্যক্তির দুটি সমাধি বটে। তবে পার্থক্য এই যে,এখানে সমাহিত রয়েছে দু'জনের স্থলে অভিন্ন একক ব্যক্তি, মর্দে মুজাহিদ হযরত শাহ তুরকাণের পবিত্র দেহের, দু'টি প্রধান অংশ। অর্থাৎ একটি তাঁর মস্তক ও অপরটি তাঁর ধড়। শেরপুরে বাবা আদম সুফির কোন কবরের কথা উল্লেখিত নেই। তবে কেউ কেউ অনুমান করেন যে,আদম দীঘিতে যে মাজারটি দেখা যায়,উহা বীর মুজাহিদ বাবা আদমের-কারণ, তিনি এতদঞ্চলে যুদ্ধ জেহাদ ও ইসলাম প্রচারের কাজ সম্পন্ন করে,ফিরতি পথে অসুস্থ্য হয়ে আদম দীঘিতে ইন্তেকাল করেন এবং পরবর্তীতে তাঁরই স্মৃতির স্মরণে উক্ত স্থানটি আদমদীঘি নামে অভিহিত হয়। যা হোক,হযরত শাহ তুরকাণের সমাধিস্থল সম্পর্কে ভিন্ন অভিমত যাই থাক্‌না কেন,শেরপুরের তুলনায় অন্য অভিমত গুলো সর্বাধিক বিতর্কিত। অন্য কথায়,শেরপুরে অবস্থিত "সির মোকাম ও ধড় মোকাম নামে অভিহিত মাজার দুটি যে,একান্তই মহান শহীদ বীর হযরত শাহ তুরকানেরই অমর স্মৃতি, তাতে দ্বিমতের অবকাশ থাকার কথা নয়। কারণ এর পেছনে যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ বিদ্যমান। আমরা এক্ষেত্রে বিখ্যাত ইংরেজ লেখক W.W. Hunter এর উক্তি উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেন "Turkan shahid was a gazy, slain in battle by Hindu king Ballal sen, One shrine is called" Sir mokam" Where the head-fell, Other " Dhar mokan' Where the body fell. The shrines or Dargas of Turkam shahid are highly revered.

-অর্থাৎ তুরকাণ শহীদ ছিলেন মূলতঃ একজন গাজি বা ধর্ম যোদ্ধা। তিনি হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের সহিত যুদ্ধ করে শহীদ হন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের যে স্থানে তাঁর মস্তক চ্যুত হয়ে ভূমি স্পর্শ করে,সেই স্থানটি সিরমোকাম এবং যেখানে তাঁর শিরশূণ্য দেহ পতিত হয়,তা ধড় মোকাম নামে অভিহিত হয়। তুরকাণ শহীদের দরগাহকে জন সাধারণ অতীব ভক্তি শ্রদ্ধার সাথে সম্মান করে থাকে।

www.amarboi.org

এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্যনীয় যে, সির মোকাম ও ধড় মোকাম নামে বহুল পরিচিত স্থান দুটি বগুড়া জেলার মোর্চা শেরপুর ব্যতীত দেশের অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়না। তাছাড়া স্থানদুটির অমর স্মৃতি এতই সুস্পষ্ট যে, ইহাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। সির মোকামের কবরটি যে,কোন দেহশূণ্য একটি মাত্র মস্তকই ধারন করছে,তা উহার সংক্ষিপ্ত পরিধি দেখে সহজেই অনুমান করা যায়। উক্ত কবর পরিবেষ্টিত যে দরগাহটি গড়ে উঠেছে, তা খুবই দীর্ঘ স্থায়ী ও মজবুতস্থুল গাঁথনি যুক্ত। প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে নির্মিত এই দরগাহটি আজও অটুট ও অক্ষত রয়েছে। আকার আয়তনে দরগাটি হুবহু সাসারামে অবস্থিত, সম্রাট শেরশাহের সমাধিতুল্য। সম্ভবতঃ সম্রাট শেরশাহের আমলের পর,তাঁরই অনুরাগী কোন মুসলীম শাসক,সরকারী উদ্যোগে দরগাহটি নির্মাণ করেছিলেন। বস্তুতঃ তাঁরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে এই ত্যাগী মহান বীর,মুসলীম মিল্লাতের জন্য জীবন বির্সজন দিয়েছিলেন বলেই দেশের এই অংশে ইসলামের ভিত্তি মজবুত ও সম্প্রসারিত হতে পেরেছিল।

হযরত শাহ তুরকান (রঃ) এর ধর মোকাম সেখানে তাঁর ধর সমাহিত

তাই ঐতিহাসিক কারণেই "সির মোকাম" গড়ে তোলা হয়েছিল। একইভাবে ধড়মোকামের স্মৃতি ও অমর হয়ে আছে। তবে এখানকার দরগাহটি অমজবুত ছিল বলে উহা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। উল্লেখিত তথ্য ও তত্ব হতে প্রমানিত হয় যে,সেন রাজা আর শাহ্ তুর্কানের মধ্যে যে যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল তা অবশ্যই বগুড়া জেলার শেরপুরেই হয়েছিল এবং এই যুদ্ধেই তিনি নিহত হয়েছিলেন। মোদ্দা কথায়, গাজী তুরকাণের শেরপুর আগমন এবং কোন এক

www.amarboi.org

চরম বিরুদ্ধবাদীর সংগে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে জীবন নিপাত করনের ইতিহাস, এক প্রকৃষ্ট বাস্তব ঘটনা। অনুরূপ ভাবে "তাঁর দেহ যে দ্বিখন্ডিত হয়েছিল, সে কথাও আমাদের মেনে নিতে হয়। কারণ, প্রাচীন লেখকগণ সকলেই এ কথাকে স্বীকার করেন যে" সির মোকাম ও বড় মোকাম একই ব্যক্তির খন্ডিত দেহের দুটি কবর। এখন প্রশ্ন হলো তিনি কখন ও কার বিরুদ্ধে লড়েছিলেন এবং তাঁর দেহচ্যুত শির ও ধড় একত্রিত করে একক স্থানের পরিবর্তে পৃথক দু'স্থানে সমাহিত করা হয়েছিল কেন?

আমরা পূর্ব আলোচনায় দেখেছি যে,গাজি সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমনের অব্যবহিত পরেই এই সকল মুজাহিদ ইসলাম প্রচারার্থ গৌড় বঙ্গে আগমন করেন। এই নবাগত দলভুক্ত অন্যান্যদের মধ্যে শাহ্ তুরকাণ ও ছিলেন একজন এবং তিনিই সর্ব প্রথম শেরপুরে ইসলামের গৌরব প্রকাশ করতে সমর্থ হন। W.W. Hunter ও অপরাপর প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের মতে, শাহতুরকাণকে জনৈক প্রতাপান্বিত বল্লাল সেনের সংগে শক্তি পরীক্ষা করতে হয়েছিল। বলা হয়ে থাকে যে, তদানীন্তন গৌড়বঙ্গে দু'জন বল্লাল ছিলেন। প্রথম বল্লাল ছিলেন বিজয় সেনের পুত্র এবং দ্বিতীয়জন ছিলেন বেদসেন বা বিশ্বক তাতের ঔরষজাত পুত্র। গোপাল ভট্টের "বল্লাল চরিতের" মতে দ্বিতীয় বল্লাল সেন, দুনজ রায়ের পুত্র এবং ইনিই পোড়া রাজা নামে অভিহিত। কথিত আছে যে,উক্ত বল্লাল সেন ১১১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। এখন বিবেচ্য,কোন বল্লালের বিরুদ্ধে তাঁকে লড়তে হয়েছিল? এ প্রশ্নের জবাবে বল্‌তে হয় যে,হযরত শাহ্ তুরকাণকে আমরা কোন ক্রমেই প্রথম বল্লালের সমসাময়িক রূপে গণ্য করতে পারিনা কারণ,শাহ তুকাণের শাহাদৎ প্রাপ্তি ও দ্বিতীয় বল্লালের পতনের পর দীর্ঘ দিনপর্যন্ত আর কোন হিন্দু নরপতি রাজত্ব করেননি বরং তৎপরবর্তীতে এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক দীর্ঘস্থায়ী মুসলীম শাস্‌ন ব্যবস্থা। সুতরাং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে,হযরত শাহ তুরকাণকে দ্বিতীয় এবং কেবল দ্বিতীয় বল্লাল সেনের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়েছিল, অন্য কারুর সঙ্গে নয়। একই ভাবে হযরত শাহ্ তুরকাণের খন্ডিত দেহের দুটি অংশ, পৃথক পৃথক স্থানে সমাহিত হওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করে বলা যেতে পারে যে,রণাঙ্গনে তাঁর দেহের খন্ডিত অংশ দু'টি কাছা কাছি না থাকার কারণে সহ যোদ্ধারা বাধ্য হয়ে,যেথায় যেমন পাওয়া গিয়েছিল সেখানেই জরুরী ভিত্তিতে অংশ দুটি সমাহিত করেছিলেন। কথিত আছে যে,যুদ্ধ শেষে রণক্লান্ত সেনাপতি হযরত শাহ তুরকাণ, তাঁর আস্তানায় ফিরে যে মূহূর্তে নামাজে নিমগ্ন ছিলেন,তখন সেন বাহিনীর লোকেরা অতর্কিত হামলা চালিয়ে,তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে তাকে হত্যা করে। কাপুরুষোচিত চোরা গোপ্তা হামলায় মহাবীর শাহতুরকাণকে আচম্‌কা হত্যা করে, সেন রাজা বল্লাল উল্লাসে

www.amarboi.org

দিশেহারা হয়ে উঠেন। সদম্ভে শহীদ তুরকাণের ছিন্ন শির কবজা করে,রাজদরবারের দিকে জোর কদমে চল্‌তে থাকেন। মূলতঃ ছিন্নশির নিয়ে উপহাস করাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। এদিকে শহীদ বীরের সহ যোদ্ধারা,পথি মধ্যে রুখে দাঁড়ালে,সেন রাজা ছিন্ন মস্তক ফেলে রেখে দ্রুত কেটে পড়েন। অথবা রাজ পরিবারের মর্মান্তিক পরিনতির কথা চিন্তে করে,বল্লাল সেন হঠাৎ বেশামাল হয়ে পড়েন এবং পরিবার পরিজনের জীবন রক্ষার্থে সির মোকামে ছিন্ন শির ফেলে রেখে,রাজ বাড়ীর দিকে ছুটে চলেন। কারণ, সেন রাজা বল্লাল যুদ্ধ যাত্রার প্রাক্কালে, নিজ পরিবারের সদস্যদেক সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন যে, কোন ক্রমেই নেড়ে মুসলমানদের আধিপত্য মেনে নেয়া যাবেনা। ঘটনা ক্রমে যদি একান্তই মুসলমানদের হাতে পরাস্ত বরন করতে হয়,তখন যেন সংবাদ পাওয়া মাত্র ক্ষণিক বিলম্ব না করে, পরিবারের সকলে একসংগে অর্নল কুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্ম বিসর্জন করে ফেলে। বস্তুতঃ চরম মুসলীম বিদ্বেষী সেনরাজা, যখন জান্‌তে পারলেন যে রটনা ক্রমে পরাজয়ের ভুল সংবাদটি ইতিমধ্যেই রাজপরিবারে পৌছে গেছে, তখন তিনি কাল বিলম্ব না করে ঘোড়া হাঁকিয়ে উর্দ্ধশ্বাসে, রাজ বাড়ীর পথে ছুটে চল্‌লেন। কিন্তু বিধিবাম। তিনি প্রাণান্তকর চেষ্টা করে, রাজ বাড়ীতে উপনীত হলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণে পরিবারের সকলেই চিতাভস্মে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। গত্যন্তরণা দেখে,সেনরাজা নিজেও অনল কুন্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে গনগনে আগুনে ছারখার হয়ে গেলেন। আর এজন্যই তাঁকে পোড়া রাজা বলেও আখ্যায়িত করা হয়। কেহ কেহ বলেন যে, সেন পরিবারের লোকজন রাজবাড়ী দীর্ঘিকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, জীবন বিসর্জন করেন। বাস্তবে ঘটনা এমন হলে,তাঁকে পোড়া রাজা বলে আখ্যায়িত করার সার্থকতা কোথা? যা হোক। এইরূপে সেন রাজা যুদ্ধে জিতেও হারলেন ও মরলেন এবং শাহ তুরকাণ সমর ক্ষেত্রে দ্বিখন্ডিত হয়েও চিরঞ্জীব হয়ে রইলেন।

প্রসিদ্ধ সেন তুরকাণের যুদ্ধ কোন অমূলক কাহিনী নহে বরং ইহা ঐতিহাসিক ভাবে প্রমাণিত এক অবিসংবাদিত ঘটনা বটে। তবে ঐ যুদ্ধের সংঘর্ষস্থল নিয়ে কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন। "বাঙ্গালার ইতিহাস" ঢাকার ইতিহাস,তাওয়ারিখে জাহাঙ্গীর নগরী,ঢাকার প্রাচীন বিবরণ,সোনার গাঁ-ও সুবর্ণ গ্রামের ইতিহাসে আছে যে, সুবর্ণ গ্রামের নিকটবর্তী আবদুল্লাপুরে এই যুদ্ধ হইয়েছিল-কিন্তু তাওয়ারিখে বাঙ্গালা ও নাসিরীর মতে এই যুদ্ধটি সংঘটিত হয়ে ছিল, বঙ্গের প্রাচীন রাজধানী গৌড় ও সুবর্ণ গ্রামের মধ্যবর্তী কোন এক উল্লেখযোগ্যস্থানে। আর ঐতিহাসিক তথ্য বিচার বিশ্লেষণ অনুযায়ী, মোর্চচা শেরপুরই ছিল সেই যুদ্ধের কেন্দ্রবিন্দু। অপরাপর প্রাচীন অলি আউলিয়া যাঁরা শেরপুরের মাটি ধন্য করে এখানে অন্তিম শয্যা গ্রহন করেছেন, তাঁদের অনেকের সমাধিস্থলই

www.amarboi.org

মহাকালের অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছে। হযরত শাহ্ তুরকাণ ও শাহ্ সদরুদ্দীন বন্দেগীর কবর দ্বয়,ব্যতীত এখানে আরও কয়েকটি মাজার পরিদৃষ্ট হয়। শাহ সদরুদীন যে একজন প্রখ্যাত মুজাহিদ ও প্রথম শ্রেণীর সাধক পুরুষ ছিলেন, তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে তিনি হযরত শাহ জালাল, হযরত শাহ তুরকান ও বাবা আদমের সমসাময়িক ছিলেন। কিন্তু বাস্তবতার নিরিখে বিশ্লেষণ করলে, এই ধারনা যথার্থ বলে মনে হয়না। কারণ, প্রথম পর্যায়ে আগত সুফি সাধক ও মুজাহিদগন এখানে আগমনের পর দ্বীন প্রচারের কাজ সম্পন্ন করেই অন্যত্র চলে গিয়েছেন। অথবা স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেছেন কিংবা ইন্তিকাল করে কর্মস্থলেই সমাহিত হয়েছেন। কিন্তু হযরত সদরুদ্দীন বন্দেগী (রঃ) ব্যতীত অন্য কেউই এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেননি অথবা এখানে তাদের বংশ বিস্তার হয়েছে বলে জানা যায়নি। লক্ষ্যনীয় যে হযরত শাহ বন্দেগী (রঃ) এখানে তার দু'পুত্র সহ সমাহিত আছেন। কথিত আছে যে, হযরত শাহ বন্দেগী (রঃ) এর তিরোধানের পর, তার বংশধরগণ শেরপুর হতে ভবানীপুর,অতঃপর সেখান হতে পাবনা জেলার শাহ্জাদ পুরে স্থানান্তরিত হন এবং তাঁর পরবর্তী বংশধরগণ এখনও তথায় বসবাস করছেন। আরও জানা যায় যে, হযরত শাহ্ বন্দেগী, সম্রাট জাহাঙ্গীরের ধর্মীয় উপদেষ্টা ও পীর হিসাবে শেরপুরে স্থান লাভ করেন। কাজেই এসব তথ্য প্রমাণ করে যে,তিনি প্রথম পর্যায়ে আগত সুফি সাধকও মুজাহিদকের সমসাময়িক ছিলেননা বরং অনেক পরে এখানে আগমন করে থাক্বেন। হযরত সদরুদ্দীন বন্দেগীর মাজারের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বস্থ এলাকাটি কাজি খানা মহল্লা বলে অভিহিত। পূর্বকালে উক্ত মহল্লায়, সরকারি বিচারালয় ছিল বলেই উহা কাজিখানা নামে পরিচিত। আজ হতে প্রায় চল্লিশ বছর পূর্বে,কাজি খানা মহল্লা খনন কালে তথায় শেরশাহী আমলের বেশ সংখ্যক রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়েছিল। বন্দেগী সাহেবের মাজারের পশ্চিম পার্শ্বে ধ্বংসাবশিষ্ট যে মসজিদটি পরিদৃষ্ট হয়,উহা টোলার মসজিদ নামে পরিচিত। উক্ত মসজিদে সংস্থাপিত শিলা লিপির পাঠোদ্ধার হতে জানা যায় যে ৯৬০ হিজরী সালে মুহম্মদ শাহ্গাজির পুত্র নওয়াব গিয়াস উদ্দিন (নাওরা উদ্দিন) আবুল মোজাফফর জামান সাহেবের (৯৬৮-৭১) (১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ) রাজত্বকালে এই মসজিদটি নির্মিত হয়। সম্ভবতঃ ১২৯২ বঙ্গাব্দে সংঘটিত ভূমি কম্পের ফলেই আলোচ্য মসজিদটি ধ্বংস স্তূপে পরিণত

www.amarboi.org

হয়ে থাকবে। মসজিদটির গাত্রে সংস্থাপিত শিলা লিপি খানা পরবর্তী সময় করাচি যাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়। টোলার মসজিদটি চার গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল। উহা দৈর্ঘেও প্রস্থে যথা ক্রমে ৫৩ ও ২৪ হাত এবং দেয়ালের ভিত সাড়ে চার হাতের মত। পার্শ্ববর্তী প্রসিদ্ধ খেরুয়া মস্‌জিদটি সংস্কার কালে টোলার অত্র মসজিদটি প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহন করা হলে,তখন হযরত শাহ বন্দেগীর বংশধরের পক্ষ হতে বাঁধা প্রদান করা হয়েছিল বলে উহা পরিত্যক্ত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এইযে,তারা বাঁধাপ্রদান ছাড়া আর কোন উদ্যোগ গ্রহন না করায়,মস্‌জিদটি ক্রমান্বয়ে একেবারেই বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হয়ে পড়ে। বিলুপ্তি হতে রক্ষার আর কোন উপায় না থাকায়,পরিশেষে শাহ্ বন্দেগী মাজার মসজিদ ও মাদ্রাসা কমিটি উক্ত স্থানে মসজিদটি পূনঃ নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহন করে। বর্তমানে ইহা নির্মাণাধীন রয়েছে। তবে পুনঃ নির্মাণে প্রাচীনত্বের কোন অংশই অবশিষ্ট থাক্‌ছেনা। বাস্তব প্রস্তাবে এমন একটি সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক প্রাচীন কীর্তিকে, যে কোন মূল্যে ধরে রাখা ছিল অপরিহার্য কিন্তু প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষ ও মালিকানা দাবীর টানা পোড়নে উহা হয়ে উঠেনি।

শেরপুরের প্রাচীন কীর্তি সমূহের মধ্যে প্রসিদ্ধ "খেরুয়া মসজিদটি"বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উল্লেখিত টোলা মসজিদ হতে খেরুয়া মসজিদের দূরত্ব মাত্র কয়েক'শ গজের মত। যেহেতু মুসলীম শাসনামলে এ স্থানটি ছিল শহরের প্রাণ কেন্দ্র এবং ঘনবসতি পূর্ণ,তাই প্রয়োজনের তাগিদেই এই স্বল্প ব্যবধানের মধ্যে দু'টি বৃহদাকার শাহী মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। আলোচ্য মসজদিটি তেমন কারুকার্য খচিত না হলেও বেশ স্থুলকায় এবং গঠন গাঁথুনি অতীব দীর্ঘস্থায়ী ও মজবুত (Massive constructed) মসজিদটি দৈর্ঘ ও প্রস্থে যথাক্রমে ৩৮ ও ১৬ হাত । তাইতো পূর্বোল্লেখিত সর্বনাশা ভূমিকম্পের প্রচন্ডতা সত্বেও মস্‌জিদ দু'টি সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়নি। বাগের হাটের ষাট গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ও শাহজাদপুরে অবস্থিত প্রাচীন মসজিটির সহিত খেরুয়াও টোলা মসজিদের হুবহু সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। খেরুয়া মসজিদের নাম করণ সম্পর্কে কোন তথ্য জানা যায়নি। প্রকৃত পক্ষে জনৈক ফকির আবদুস সামাদ উক্ত মসজিদটি নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহন করেন। মসজিদ গাত্রে সংস্থাপিত ফার্সি ভাষায় লিখিত শিলা লিপি পাঠে জানা যায় যে,নবাব মির্জা মুরাদ খান কাকশালের পৃষ্ঠ পোষকতায় মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। নবাব মির্জা মূরাদ খান ছিলেন এই প্রদেশের জনৈক শ্রেষ্ঠ পাঠান জাগীরদার। ফার্সি শিলালিপি ও উহার বংগানুবাদ নিম্নরূপঃ

www.amarboi.org

তরজমাঃ- হে অলৌকিক ও আশ্চর্যের মহান প্রকাশক (আল্লাহ) ৯৮৯ হিজরী সালের ২৫শে জিলহাজ মাসের সোমবারের দিন (২০) জানুয়ারী ১৫৮২ ঈসায়ী) প্রস্তাবিত মসজিদটির নির্মাণ স্থান পরিদর্শন করা হয়। নবাব মির্জা মূরাদ খানের সহযোগিতায় মসজিটির নির্মাণ কাজ বর্তমান সালে ২৬ তারিখের মংগলবারের দিন আরম্ভ হয়। সবুজ বর্ণের দুটি কপোত আকাশ হতে, মসজিদের পরিসীমার মধ্যে নেমে পড়ে। এবং ফকির আবদুস সামাদের সমীপে অভিবাদন পেশ করে। প্রীতি শুভেচ্ছা শেষে, কপোত দুটি বলে "আমরা পবিত্র মককা ধাম হতে আগত নাম রাখ্ছ ও কোলা এবং মহান প্রভূর নামেও মাহাত্ম্যে অভিবাদন করি। আমরা নিজেদেরও বন্ধুদের জন্য অত্র মসজিদে অবস্থানের জন্য আশ্রয় কামনা করি। ফকির জবাব দিয়ে বললেন,হাঁ তা হবে না কেন? তবে মসজিদটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের এবং আল্লাহ না করুন, লোকজন যদি তোমাদেক উৎপীড়ন করতে থাকে (তখন উপায়টা কি হবে) তারা (কপোতজোড়া) বললো যে,কেউ জ্ঞাতসারে ও ইচ্ছাকৃত ভাবে যদি অন্যায় করে ফেলে,তবে অনুরূপ বা ততোধিক কঠোর আচরণ আল্লাহর তরফ হতে পেয়ে যাবে তারা। অতঃপর তারা পুনরায় ছালাম করলো এবং হাওয়ায় মিলে গেল। অবলা প্রানিদের এই কথার যথার্থতা

www.amarboi.org

সঠিক বলে ধরে নেয়ার সম্ভবনা কম। মোদ্দা কথা, মস্‌জিদটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন ও ব্যবস্থাপনা চালু হওয়ার পর,যাতে অবলা প্রাণী গুলো ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাহাই বিবেচ্য বটে। মসজিদটি জত্তহর আলী খানের পুত্র মহান মূরাদ খাঁন কাক্‌শাল নির্মাণ করেন। আলোচ্য মস্‌জিদটি এক অমূল্য পুরাকীর্তি বটে। সর্বোপরি ইহা এক জীবন্ত ইতিহাসের পট ভূমিকা তুল্য প্রাচীন স্থাপত্য শিল্প। মসজিদ গাত্রে সংস্থাপিত শিলা লিপিটি যেন এক নজরে দেখার মত এক ঐতিহাসক দর্পণ। এই দর্পণে তদানীন্তন বঙ্গভূমি ও মুঘল সাম্রাজ্যের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। কষ্টি পাথর তুল্য কৃষ্ণ শিলায় উৎকীর্ণ হরফগুলো, তখনকার লিপিকার দের অনন্য দক্ষতা প্রমাণ করে। সুবিন্যস্ত ফার্সি ভাষায় নোক্‌তা বিহীন হরফ ও শব্দগুলো এমন আলংকারিক ও নৈপুণ্যের সহিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে,. যা সহজেই দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে ইহার পাঠোদ্ধার ছিল খুবই দুষ্কর। Dr. paul Horn. Epigraphia India voll II নামক গ্রন্থের ২৮৮ পৃষ্ঠায় সর্ব প্রথম ঐ শিলালিপির ছাপ প্রত্যক্ষ করে উহার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু পাঠের মূলকথা অস্পষ্ট থেকে যায়। পরিশেষে ১৯৩৮ ঈসায়ী সালে প্রত্নতত্ব বিৎ জনাব শামছ উদ্দিন এম,এ, উহার সঠিক পাঠোদ্ধার করেন।

মস্‌জিদটির চতুষ্কোণে বক্র ইষ্টকের স্থূল গাঁথুনি যুক্ত অষ্টাকোণী চারটি চূড়া (Tarret) রয়েছে। মস্‌জিদটি কারুকার্য খচিত নহে। চতুষ্কোনের চূড়া ব্যতীত ইহার শীর্ষভাগে তিনটি সম মাপের গম্বুজ আছে। ইষ্টক ও চুন-সুরকী ছাড়া ইহার নির্মাণ কার্যে বিশেষ বিশেষ স্থানে বৃহদাকার কৃষ্ণ পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত কয়েকটি পাথরের অপর পৃষ্ঠে বৌদ্ধ মূর্তির ছাপ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ কোন বিধ্বস্ত স্থান হতে পাথর গুলি সংগৃহীত হয়েছিল। ধ্বংসলীলার পর, প্রায় আড়াই শ বছর যাবত,মস্‌জিদটি অনাবাদ ছিল। অতঃপর প্রাচীন কীর্তি সংরক্ষণ বিভাগ কর্তৃক মেরামত হওয়ায় পুনরায়, এখানে নিয়মিত নামাজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। মসজিদের কার্ণিসে নির্মিত কপোত কক্ষ গুলোতে এক্ষণে পায়রার পরিবর্তে শ্যালিক পক্ষী বাস করে। জন শ্রুতি আছে যে,এই মসজিদে আশ্রিত পারাবত গুলি পরবর্তীতে, এখান হতে শাহজাদপুর ঐতিহাসিক মসজিদে স্থানান্তরিত হয়।

www.amarboi.org

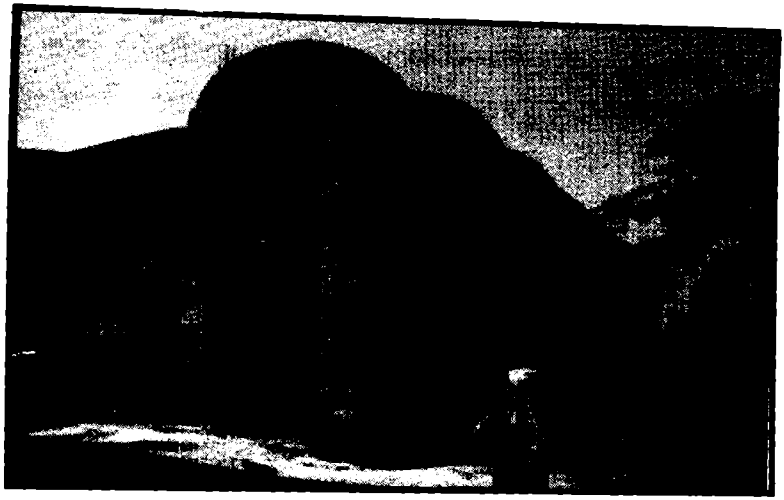

ঐতিহাসিক "খেরুয়া মসজিদ"

মস্‌জিদটির উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বের মধ্যস্থলে দুটি প্রবেশ দ্বারা সহ পূর্ব পার্শ্বে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। উল্লেখ্য যে জানালা বিহীন এই মস্‌জিদের প্রবেশ দ্বার গুলোতে কোন খিলান (Door jamps & lintels) ব্যবহার করা হয়নি। প্রবেশদ্বারের ডান পার্শ্বের শিলা লিপিখানা, করাচি যাদুঘরে স্থানান্তরিত হয়েছে। বামপার্শ্বেরটি এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে। শিরোনাম ব্যতীত শিলালিপিতে ১৪টি পংক্তি উৎকীর্ণ হয়েছে। প্রথম দু পংক্তিতে প্রতিষ্ঠাতা দাতা ব্যক্তির নাম ও প্রতিষ্ঠা সাল সহ দিন তারিখ উল্লেখিত আছে। পরবর্তী ১২টি ছত্রে আগত কপোত জুটির নাম সহ, অলৌকিক কাহিনীতে উল্লেখিত হয়েছে যে,পারাবত দুটি আলোচ্য মসজিদের জিম্মাদার, ফকির আবদুস সামাদের নিকট উপনীত হয়ে ছালাম ও অভিবাদন করে উক্ত মসজিদে অবস্থানের জন্য আশ্রয় কামনা করলো। ডান পর্শ্বের শিলা লিপিতে ১১টি পংক্তি যুক্ত এবং উহাতে ধর্মীয় উপদেশ বানী উৎকীর্ণ ছিল। নিছক মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত হলেও শিলা লিপি খানাতে সমকালীন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যেরও অবতারণা করা হয়েছে। তবে ইহাতে একটি অসংগতি ও লক্ষ্য করা যায়। মস্‌জিদের মত একটি পবিত্রগৃহে সংস্থাপিত ফলকের শিরোনামে আল্লাহতা'য়ালা অথবা বিছমিল্লাহ না লিখে বিকল্প উপশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে,যা কিনা একান্তই বেমানান ও চরম অসংগতি পূর্ণ।

www.amarboi.org

কেন এরূপ করা হয়েছে তা নিরুপণ করা কঠিন। তবে অনুমান করা হয়ে থাকে যে,সম্রাট আকবরের রাষ্ট্রীয় প্রভাবই ইহার মূলকারণ। যেহেতু মসজিদটি প্রতিষ্ঠার দু'বছর পূর্বে সম্রাট আকবর, তার রাজ্যময়,দ্বীনে ইলাহী নামক একটা জগা খিচুড়ি মার্কা মতবাদ প্রবর্তন করে ছিলেন। তারই অনুসরণে হয়ত, সরাসরি আল্লাহ অথবা বিছমিল্লার পরিবর্তে নিরপেক্ষ একটা উপশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া শিলা লিপিতে বঙ্গদেশ ও মুঘল সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হয়েছে। মস্‌জিদটির প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠ পোষক হিসাবে সম্রাট আকবরের কোন প্রতিনিধির নামোল্লেখ থাকাই কাম্য ছিল বটে, কিন্তু বঙ্গদেশের তদানীন্তন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ঘোড়াঘাটের বিদ্রোহী নবাব মির্জা মূরাদ খান কাকশালের নাম উৎকীর্ন হয়েছে।

দিল্লী হতে বহুদূরে অবস্থিত বাংলাদেশকে সাম্রাজ্য ভুক্ত করতে মুঘলদেক ঢেড় বেশী মাথা ঘামাতে হয়েছে। বস্তুতঃ ১৫৭৬ ঈসায়ী সাল পর্যন্ত বঙ্গদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বাতন্ত্র রক্ষা করে চলে। সম্রাট আকবরের শাসনামলে সুলায়মান কাররানীর পুত্র, দাউদের পতনের পর,দেশটি দু'শ বছর পর পরাধীনতা বরণ করে এবং স্থায়ী ভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। তবে ঢাকা ও ময়মনশাহী,ঈসা খাঁনের নেতৃত্বে তখনও স্বাধীনতা রক্ষা করে চলছিলো। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির পূর্ব পর্যন্ত,স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বঙ্গ দেশে প্রচন্ড বিদ্রোহ অব্যাহত ছিল। আর এই বিদ্রোহ পরিচালিত হচ্ছিলো উত্তর বঙ্গের কেন্দ্র বিন্দু, ঐতিহাসিক মোর্চা শেরপুর হতে। সম্রাট আকবরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও কাবুলের শাসন কর্তা মির্জা মুহম্মদ হাকিম,এই বিদ্রোহ কে নানা ভাবে উদ্বুদ্ধ ও প্ররোচিত করেন। মূলত আকবরের ধর্মনৈতিক সংস্কারের (১৫৭৮-৮০) ফলেই বাংলাদেশ ও জৌনপুরে এই বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছিল। এই সুযোগে দিনাজপুর জেলার ঘোড়া ঘাটের তদানীন্তন তুর্কী জায়গীর দার, মিরজা মুরাদ খান কাকশাল, বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সম্রাট আকবরের সাবেক জায়গীর দার,মাসুম খান কাবুলী ও কাকশালদের বিদ্রোহে যোগদেন। অবস্থার নাজুকতা লক্ষ্য করে, তদানীন্তন বাংলার গভর্নর শাহবাজ খানকে দিল্লীর দরবারে ডেকে পাঠানো হয় এবং কাকশালদের বিদ্রোহ দমনের নির্দ্দেশ প্রদান করা হয়। সম্মিলিত বিদ্রোহী বাহিনী ইতোমধ্যেই মোর্চা শেরপুরে দুর্ভেদ্য অবরোধ গড়ে তুলেছিল।

www.amarboi.org

সম্রাটের নির্দ্দেশানুযায়ী টোডরমল, আজিজ কোকা ও শাহবাজখান, বিদ্রোহ দমনের জন্য দ্রুত অগ্রসর হন এবং মাসুম ও তার সহযোগিদেক ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৬ নভেম্বর মাসে বিতাড়িত ও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেন। অতঃপর বিদ্রোহীদের দ্বারা বিতাড়িত সম্রাটের অনুগত সাবেক জায়গীদার ও অন্যান্য কর্মকর্তাদেক পুনরায় ডেকে পাঠানো হয় এবং মোর্চা শেরপুরে পুনরায় মুঘলদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর, শাহবাজ খাঁন অধিকতর একটি সুবিধা জনক স্থানে তার অনুসারী উল্লেখ যোগ্য ব্যক্তি বর্গ সহ সেনা সমাবেশ করলেন এবং বিচ্ছন্নতাবাদী পলাতকদের গতি বিধির উপর কড়া নজর রাখলেন। এক পর্যায়ে বিদ্রোহীদের প্রধাননেতা দাস্তম খান কাকশাল, যখন ঘোড়া ঘাটের পথে উত্তর দিকে অগ্রসর হতেছিলেন এবং লুটতরাজ করতে করতে,অবশেষে ঘোড়াঘাট অবরোধ করে বস্‌লেন তখন শেরপুর হতে বাবুই মানকালি নামক একজন মিত্র বাহিনীর আমিরকে তার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হলো। বাবুই মানকালি সহজেই দাস্তম খানকে পরাভূত ও হত্যা করে ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘোড়াঘাট পুনরায় করতলগত করলেন।

উল্লেখিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলি, প্রাচীন প্রসিদ্ধ খেরুয়া মসজিদে সংস্থাপিত শিলা লিপির প্রামাণ্য আলোকেই উপস্থাপন করা হোল।

খেরুয়া মস্‌জিদের অনতিদুরে অবস্থিত "বিবির দরগাহ" নামক আরও একটি প্রাচীন মস্‌জিদ পরিদৃষ্টি হয়। মসজিদটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথা ক্রমে ১৫ ও ১৪ হাত এবং ইহার দেয়ালের ভিত সোয়া দুই হাতের মত। বিবির মসজিদ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বলা হয়ে থাকে যে,রাজা বলরামের একভগ্নি তৎকালীন গাজি, শাহ্ মাদারের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু রাজা, মুসলমানদের হাতে ভগ্নি দানে অস্বীকৃত হলে, বলরাম সহোদরা চিরকুমারিত্ব বরণ করে এবং মাদারের দরগাহ পার্শ্বে একটি মস্‌জিদ নির্মাণ করে তথায় বসবাস করতে থাকে। শাহ মাদার ও ইহার সহ মর্মিতায় আর জীবনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হননি। কথিত আছে যে, পরবর্তী কালে বাংলার যেখানেই মাদারের দরগাহ নির্মিত হয়েছে, সেখানেই পাশা পাশি একটি বিবির দরগাহ ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

www.amarboi.org

টোলাহতে পোয়া মাইল দক্ষিন পাশ্চিমে অধুনা সাধুবাড়ী গ্রামের উত্তর পার্শ্বে ফাঁসিতলায়, পাঁচ পীরের মাজার রয়েছে বলে অনুমান করা হয়। অনুরূপ ভাবে খেরুয়া মসজিদের মূল উদ্যোক্তা ও যুগ্ম প্রতিষ্ঠাতা ফকির আবদুস সামাদ উক্ত মস্‌জিদের সম্মুখ অঙ্গনে সমাহিত আছেন বলে জানা যায়। এতদ্ব্যতীত, টোলার দরবেশ অঙ্গনে হযরত লাল মিঞা নামক আরও একজন সাধক পুরুষের সমাধি আছে বলে জন শ্রুতি শোনা যায়। শেরপুর শহরের উত্তর পশ্চিম পার্শ্বে অধুনা ডাক বাংলা ও হাজিপুরের সন্নিকট আরও একটি প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ উদ্ধার হয়েছে। বহুদিন পুর্বে ধ্বংস প্রাপ্ত, উক্ত প্রাচীন কীর্তিটির স্বরূপ নিয়ে স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ সৃষ্টি হয়েছিল। মহল্লার প্রধান মসলমানগণ,স্থানটিকে প্রাচীন কোন মসজিদের ধ্বংসাবশিষ্ট বলে দাবী করেন। একই ভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন, উহাকে প্রাচীন কোন মন্দিরের স্থান বলে দাবী উত্থাপন করেন। উভয় সম্প্রদায় স্ব-স্ব দাবী প্রতিষ্ঠা কল্পে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহন করে। মুসলমানগণ মসজিদটি পুনঃ নির্মান আরম্ভ সহ নিয়মিত নামাজ শুরু করে দেয় এবং হিন্দু সম্প্রদায়, সেবায়েত নিয়োগ করে পূজা অর্চণা সূচনা করে। এই অবস্থার এক পর্যায়ে মসজিদের স্থান খনন কালে একখন্ড পোড়ামাটির ফলকে ধ্বংস প্রাপ্ত মসজিদটির প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত দিন তারিখ ও সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি উৎকীর্ণ পাওয়া যায়। ইহার ফলে মসজিদটির অস্তিত্বের দাবী দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং প্রতিপক্ষের অমূলক দাবী অসার বলে প্রতিপন্ন হয়। আলোচ্য প্রাচীন কীর্তিটি কাদিম মস্‌জিদ নামে অভিহিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথা ক্রমে ৩৬ ও ২৪ হাত ছিল। এক্ষণে উক্ত স্থানে মসজিদটি নব অবয়বে পুনঃনির্মিত হয়েছে।

শেরপুরের পশ্চিমে অধুনা দুবলা গাড়ী ঈদগাহ অঙ্গনের উত্তর পার্শ্বে পাঁচজন সুফি-সাধকের সমাধি আছে বলে প্রকাশ। সমাধিগুলো এখন পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হলেও তাদের পরিচয় পরিজ্ঞাত নহে। করতোয়া নদী হতে দু' কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত বাঘড়া দীর্ঘিকার দক্ষিণ পাড়ে, একটি সেকেলে মন্দির ছিল বলে অনেকেই প্রমাণ করেন। তৎকালীন গভীর অরণ্য মধ্যে অবস্থিত, উক্ত মন্দিরে জনৈক সন্ন্যাসী সপত্নীক অবস্থান করতেন বলে জানা যায়। আলোচ্য মন্দিরটি এক্ষণে সম্পূর্ণ রূপে বিলুপ্ত।

দুবলা গাড়ীতে সমাহিত আউলিয়াদের পরিচিতি সম্পর্কে অনেকেই ভ্রান্তমত পোষণ করেন। সাধারণ্যে প্রচলিত যে, এখানে গাজিও শাহ কালু সমাহিত আছেন। এই অলীক ধারনা, পুঁথি কেতাবের বানোয়াট মাত্র। শেরপুরের অতীত কাহিনীর সহিত কালূ ও গাজির অবতারণা অমূলক ও অপ্রাসঙ্গিক না হলেও বাস্তব ঘটনা অন্যরূপ। পুঁথি কেতাবের বর্ণনা মতে মুঘল আমলে মটুক রাজা

www.amarboi.org

(মকুন্দ রাজা নহে তো?) নামে একজন প্রতাপশালী জাগীরদার এখানে রাজত্ব করতেন। মটুক রাজার ছিলএক পরমা সুন্দরী কন্যা। নাম তার চম্পাবতী। এ সময় কেল্লাপুষী হতে বুড়া মাদার,তার অন্যতম শিষ্য গাজি জিয়া উদ্দিনের সহিত চম্পাবতীর বিয়ের প্রস্তাব করেন। মুস্‌লীম বিদ্বেষী মটুক রাজা বিয়ের প্রস্তাবটি নাকোচ করে দেন এবং এর ফলে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ বেঁধে যায়। এই যুদ্ধে মটুক রাজা নিহত হলে,অপরাপর লোকজন কূপে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে। দৈব ক্রমে সুভদ্রা বা চম্পাবতী প্রাণে বেঁচে যায় এবং মাদার বাহিনীর হাতে বন্দী হয়। অতঃপর গাজি জিয়া উদ্দিন চম্পাবতীকে বিয়ে করেন। শাহ মাদারের শিষ্যগণের মধ্যে, শাহ কালু ও গাজিজিয়া উদ্দিন নামক দুই ভ্রাত্রা ছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় ছিলেন সিদ্ধ পুরুষ।

জন শ্রুতিতে প্রকাশ যে,গাজি জিয়া উদ্দিন,দুপচাঁচিয়া থানার অন্তর্গত জিয়ানগরে পরবর্তীকালে আস্তানা করেন এবং মৃত্যুহলে তথায় সমাহিত হন। শাহ কালুর মাজার অধুনা কাহালু পুলিশ ফাঁড়ির পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত বলে অনুমান করা হয়।

"বগুড়ার ইতিহাস" প্রনেতা কাজী মুহম্মদ মিছির কথিত কালু ও গাজি সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেন- "এই পীরদ্বয় ও চম্পাবতীকে কেন্দ্র করিয়া উক্ত গাজির পুঁথি রচিত হইয়াছে। এই কালু গাজিকে কেন্দ্র করিয়া যশোহর ,খুলনার ইতিহাসে একটি অনুরূপ বাহিনী লিখিত হইয়াছে। উক্ত ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে যে মুকুটরায়ের বাড়ী ছিল ব্রাহ্মণ নগরে, যশোহর জেলার বর্তমানে যেখানে ঝিকর গাছা রেল লাইন অবস্থিত,তাহার পূর্বোত্তর কোনো লাউজানি বলিয়া গ্রাম আছে। ঐ লাউজানিইছিল ব্রাহ্মণ নগর। ইহার সন্নিকট পরিখা বেষ্টিত দুর্গে রাজা মকুট রায় বাস করিতেন।"

পূর্বোল্লেখিত দুবলা গাড়ীতে মাদারের দরগাহ, গাজি মিঞার দরগাহ, শাহাবুদ্দীনের দরগাহ্ নামে কতিপয় আউলিয়ার মাজার আছে বলে যে, কাল্পনিক অস্তিত্ব প্রচারিত হয়ে আস্‌ছে,বাস্তবে তার কোন হদিস নেই।

অধুনা শেরপুর শহরের অন্তর্গত শেখ পাড়ায় হযরত শাহ জামাল উদ্দিন নামক আরও একজন সুফি সাধকের কবর দেখা যায়। সম্প্রতি তাঁর কবরটি ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করা হয়েছে। এই সিদ্ধ পুরুষ সম্পর্কে অনেক অলৌকিক ঘটনা শোনা যায়। আজ হতে কয়েক বছর আগের কথা। জনৈক রইছ উদ্দিন নামক একজন রিক্‌শা চালক,একদা গভীর রাত্রে, যখন ঐ মাজারের পার্শ্ব দিয়ে গমন কর ছিলো, অমনি সে এক শামলা ধারী মহামূর্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। রিক্‌শা চালককে উপর্যুপরি কয়েকবার আছাড় মারলে, সে আর কখনও বে আদবী করবেনা বলে শপথ করে এবং উক্ত দৈব মূর্তির হাত হতে রক্ষা পায়।

www.amarboi.org

এই আছাড় থেকো লোকটি দীর্ঘ দিন যাবৎ,বাকরুদ্ধ অবস্থায় থেকে,পরিশেষে মুক্তি পায়। শেরপুর শহীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসার পশ্চাদ্ভাগে পরবর্ত্তী কালে অপর আর একজন আল্লাহর অলি সমাহিত হন। এই সাধক পুরুষের নাম টুলি শাহ ফকির ওরফে খেতাপীর। সম্ভবতঃ তিনি মজ্জুব ছিলেন। প্রায় দু'শ বছর পূর্বে এই খোদা প্রেমিক ইন্তেকাল করেন। তিনি খেতাপীর বলে সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রাচীনদের মুখেশোনা যায় যে, টুলিশাহ ফকির স্কন্ধে কন্থা বহন করে চলতেন। কৌতুহলী ছেলে পুলেরা শ্লেস গাড়ীর যাত্রীর মত দিব্যি তাঁর কন্থার ঝুলানো অংশে চেপে বস্‌তো। এদিকে খেতাপীর, ধীর মন্থর গতিতে টেনেই চল্‌তেন। খেতাপীরের নিকট হতে মিষ্টান্ন আদায় না করা পর্যন্ত, কন্থা আরোহী দল কোন ক্রমেই আসন ত্যাগ করতোনা। যুগে যুগে এমন অনেক মজ্জুব দরবেশদের আবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়। এক কালে পাবনাতে, ঠিলা শাহ ফকির নামে এক দরবেশ, গলায় ঠিলা বেঁধে অলি গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। যুগের সকল বাহ্যিক চাক চিক্য উপেক্ষা করে,এঁরা আল্লাহর ধ্যানে সর্বক্ষণ মগ্ন হয়ে থাকেন। আমাদের অঞ্চলে, ভাই পাগলা নামে খ্যাত, এমনি এক ব্যক্তি আজীবন ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। অবশেষে মৃত্যু বরণ করলে, তাকে বগুড়াস্থ ঠনঠনিয়ায় সমাহিত করা হয়। এককালে শাহ মাদার ও এমনিভাবে খ্যাতি সম্পন্ন হয়ে উঠেছিলেন। মিরগঞ্জে অর্থাৎ অধুনা শেরপুর বার দুয়ারী শ্মশাণ ঘাটের পশ্চিম পার্শ্বে তাকে কবরস্থ করা হয়। এতদ্ব্যতীত সেরুয়া গ্রামের দক্ষিন প্রান্তেও আর একজন প্রাচীন মহা মনিষীর মাজার আছে বলে প্রকাশ।

ভবানীপুর ও ভবানীপুর মন্দির

হিন্দু সম্প্রদায়ের মতে ভবাণীপুর একটি স্থানীয় ও আঞ্চলিক তীর্থ হলেও এটি সমগ্র বঙ্গেরই একটি গ্রহনযোগ্য তীর্থ হিসেবে গণ্য হতে পারে। স্থানীয় ভাবে এ স্থানটি ভবানীপুর কালিবাড়ী, ভবানী ধাম ও ভবানী থান নামে পরিচিত। এটি শেরপুর থানার একটি ইউনিয়নও বটে। ইহা অত্র থানার দক্ষিণ সীমান্তে এবং সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার সর্ব উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। বগুড়া শহর থেকে এ স্থানটির দূরত ৪০ কিঃ মিঃ এবং নাটোর হতে ৫৮ কিঃ মিঃ। প্রাচীন কালে মহাস্তান হতে ভবানীপুর পর্যন্ত যখন সমগ্র স্থানটিই গভীর জংগলাকীর্ণ ছিল তখনও এ দুর্গম দূরত্ব পর্যন্ত, একটি সংকীর্ণ চলাচলের রাস্তা ছিল বলে জানা যায়। হিন্দু দর্শন মতে প্রকাশ ঃ-

www.amarboi.org

"করতোয়া তটে গুলফং, বামে বামেশ ভৈরবঃ অর্পণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা;

অর্থাৎ পূত তোয়া করতয়ার তটে, সতীর গুল্‌ফ অঙ্গ পতিত হওয়ায়, ঐ স্থান পীঠ ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ক্ষেত্রস্থ দেবী অর্পণা বামে ভৈরব বামেশ এবং ক্ষেত্র মাহাত্ম্য জন্য স্রোতস্বিনী করতোয়া ব্রহ্ম রুপিনী। দাক্ষায়নী সতী,পতিনিন্দা শ্রবণে পিতা দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ কুন্ডানলে প্রাণ ত্যাগ করলে, সতীগত প্রাণ, মহাদেব মৃতদেহ স্কন্ধে বহন করে, দেশে দেশে পরিভ্রমণ করতে থাকেন। সেই সময় ভগবান বিষ্ণু দেব, কার্য সাধনোদ্দেশেও মর্ত্ত্য বাসীদের কল্যাণ নিমিত্ত, সুদর্শন চক্রে সতীদেহ একান্ন খন্ডে বিভক্ত করে, যে সকল স্থানে নিক্ষেপ করেন,সেই সকলই পৃথক পৃথক পীঠ স্থানে পর্যবসিত হয়েছে। একই কারণে সতীর গুল্‌ফ (Heel) অঙ্গটি এখানে পতিত হওয়ায়, উহা গুলফা নামে অভিহিত হয়। বলা হয়ে থাকে যে, গুলফা শব্দ হতেই অধুনা গুল্‌টা গ্রামটির নাম করণ হয়েছে।

মুঘল সম্রাটদের আমলে দেবী সাধারণতঃ ভবানী নামে এবং পুরী থান নামে অভিহিত হতো। বাংলার বার ভৌমিক দলস্থ খ্যাত নামা সাঁতৈলাধিপতি, মহারাজা রামকৃষ্ণ, সম্রাট আকবরের নিকট হতে ভবানীপুরের দেবীর পুরী নির্মানার্থে যে সনদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন,তাতে স্থানটি "ভবানী থান" এবং দেবী ও ভবানী নামে আখ্যায়িত হয়েছেন।

হিন্দু সম্প্রদায়ের পীঠের মধ্যে কামাখ্যা সর্ব শ্রেষ্ঠ এবং তার পরই ভবানী পুরের স্থান। কারণ, প্রেমাবতার যোগীন্দ্র এখানে নিজে উপবেশন করে,দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। সর্বশেষ পীঠ এখানেই পতিত হয়েছিল, হেতু তিনি অন্য কোন পীঠে এমনভাবে তপস্যা করেননি।

কথিত আছে যে,এখানকার প্রাচীন জংগলময় স্থানের সবটুকুই মহা পীঠ ক্ষেত্র। শান্তি কাননে ক্ষেত্রস্থ অর্পণা দেবীর রাজধানী। দেবী এখানে প্রকাশ্য ভবানী নামে,রাজরাজেশ্বরী নামে বিরাজিতা। ভবানী নিকেতন জন্য ভবানীপুর নাম উত্তর বঙ্গে প্রসিদ্ধ। "মার বাড়ী" বল্‌তে ভাবানীপুরকেই বুঝায়। কালকীর্তি বিনাশী ভবানীপুরের শোভা সমৃদ্ধি বিগত ১২৯২ ও ১৩০৪ সালের ভীষণ ভূমি কম্পে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে সেই স্থানে আধুনিক ধরনের সৌধ নির্মিত এবং উহাতে দেবীকে পনঃ স্থাপিত করা হয়। সর্ব প্রথম কখন এ পীঠ আবিস্কৃত হয় তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে অনুমান করা হয় যে,বৌদ্ধযুগের পূর্বেই ইহা আবিস্কৃত হয়েছিল।

www.amarboi.org

সাঁতৈলাধিপতি মহারাজা রামকৃষ্ণ, অর্পণার জন্য নানা চিত্র সম্বলিত ইষ্টকাদি দ্বারা ভবানীপুরে একটি অতি উৎকৃষ্ট জোড় বাংলা নির্মাণ করেন। রামকৃষ্ণ মহিষী শর্বানীর নামে একটি পুষ্করিণী দেন,যা পাটা ধোওয়া পুকুর নামে পরিচিত। রাজা তদীয় মাতা সত্যবতীর নামে,ভবানী পুর হতে শেরপুর পর্যন্ত যে রাস্তাটি নির্মাণ করেন, তা রাণী সত্যবতীর জাংগাল নামে পরিচিত। উক্ত রাস্তার মধ্যবর্তী স্থলে যে পুষ্করিণী তিনি খনন করে দেন, তা আজ তক রাণীর পুকুর নামে খ্যাত।

ভবানীপুর,সাধক প্রবর মহারাজা রামকৃষ্ণের সাধনার স্থান ছিল। মহারাজার অনেক কীর্তি এখন পর্যন্ত পরিদৃষ্ট হয়। মূল মন্দির সংলগ্ন যজ্ঞ মন্দির, শাখাই সরোবর,উত্তর দিকস্থফুল গাড়ি পুষ্করীনী ও তার পূর্ব পার্শ্বের উদ্যানটি মহারাজারই অমর কীর্তি। ভবানীপুরে আরও অনেক কীর্তির নিদর্শণ বিদ্যমান। চৌগাঁয়ের রাজা রুদ্রকান্ত রায়, পুরীর মধ্যে উত্তর দ্বারী প্রাসাদটি তৈরী করেদেন। বরিয়ার ঠাকুরদের স্থাপিত রামেশ্বর, রুদ্রেশ্বর,তারিনীশ্বর,সুমেত্রেশ্বর,এবং বিশ্বনাথ শিবলিঙ্গ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভবানী দেবীর নিকট নরবলি ও হতো। কথিত আছে যে, রাজা আনন্দ রায় বাহাদুরের সময়ে, তদানীন্তন পুরোহিতের পিতৃব্য দুর্গানাথ চক্রবর্তীর পৌরহিত্যের সময়ে, দৈব ক্রমে এই বলি প্রথাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়। এবং সেই হতে প্রথাটি রহিত হয়ে যায়। জানা যায় যে,ভবানীপুরী প্রাচীন কালে পরিখা বেষ্টিত ছিল। পরিখা বেষ্টিত স্থানের দৈর্ঘ উত্তর দক্ষিণে বার'শ হাত এবং পুর্ব পশ্চিমে সহস্র হস্ত পরিমিত ছিল। ইহার দক্ষিণাংশে ঈশ্বরপুরীর ভবানী দেবী অধিষ্ঠিতা। এর সম্মুখে টিনের আট চালায় নাট মন্দির। এ মন্দিরের পশ্চিমে,বামেশ ভৈরবের দালান। পুরী মধ্যস্থ ভবানীশ্বর শিবের মন্দির, হরেশ্বরের মন্দির,প্রভৃতি বিধ্বস্ত প্রায় এবং যজ্ঞের দালান এক্ষণে অব্যবহার্য। মন্দির অঙ্গনের কিঞ্চিৎ পূর্বদিকে রাজবাড়ী অবস্থিত ছিল। উক্ত স্থানে একটি রাজ প্রাসাদ ছিল। প্রাসাদটি মহারাজার অবস্থানের জন্য ব্যবহৃত হতো। এছাড়া ঠাকুদের বাস স্থানও ঐখানেই ছিল। ভবানীপুরে এক সময় উন্নত মানের সন্দেশ ও ক্ষীর তক্তি পাওয়া যেতো। ভবানীপুর বাজারের পূর্ব দিকে তদানীন্তন নায়েবের বাসা পর্যন্তু সাঁতৈলের রাণী শর্বানীর পুষ্করিনী বিস্তৃত ছিল। সরোবরটি পরবর্তী কালে ভরাট হয়ে জংগলাকীর্ণ হয়ে উঠে। জংগলা পুকুরটির নাম "পাটা ধোওয়া"। এর দক্ষিণে জলটুংগী পুকুর। পুরীর প্রায় শতাধিক হাতদূরে পশ্চিম দিকে রুপরঙ্গ পুষ্করিনী। এটি শেরপুর বাসিনী রূপমনি ও রঙ্গিনী নাম্নী দু'জন বার বনিতা কর্তৃক খনিত হয়েছিল। প্রাচীন পরিখা বেষ্টিত, অঙ্গনের উত্তর অর্দ্ধাংশে ভোগ পাক গৃহের

www.amarboi.org

উত্তরে শাকাই পুষ্করিণী। উহার কিঞ্চিৎ উত্তরে ফুলগাড়ী পুষ্করিণী অবস্থিত। পূর্ব পার্শ্বে বারটি মন্দির শোভিত শিববাড়ী প্রাচীন কালে অতি মনোরম স্থানছিল। শিববাড়ীর পূর্বদিকে কুমার কাঙর পুষ্করিণী। এর পূর্ব দিকে পাকুড়িয়ার নীলমনি ঠাকুরের পুষ্করিণী অবস্থিত।

ভবানীপুরে অবস্থিত মন্দির

নাটোরের তদানীন্তন মহারাণী ভবানী,ভবানীপুরের একটি বৃহদাকার বার দ্বারী মন্দির নির্মাণ করে দিয়ে,তাতে ভবানীশ্বর শিব প্রতিষ্ঠিত করেন। ভবানীপুর হতে পাকুড়িয়ার ঠাকুর বাড়ীর উত্তর পার্শ্ব দিয়ে চৌগ্রাম পর্যন্ত,প্রায় আঠার মাইল দীর্ঘ প্রশস্ত জাংগাল নির্মাণ তাঁরই অমর কীর্তি। এই জাংগলের মধ্যে কয়েকটি ছোট সেতু ও দুটি বড় আকারের পুল নির্মিত হয়েছিল। বড় দুটি পুলের একটি ভদ্রাবতী নদীর উপর, অপরটি খালের উপর নির্মিত হয়েছিল। আলোচ্য জাংগলের পার্শ্ব দিয়ে পূর্বে ভবানীপুর পর্যন্ত নৌকা যাতায়াত করতো। জাংগলটির উত্তরে খাল ও দক্ষিণে নয় ক্রোশ রাস্তার মধ্যে বড় বড় নয়টি সরোবর খনন করা হয়েছিল। পাকুড়িয়া নিবাসী রামশংকর মৈত্রের তত্বাবধানে, তিন লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সমস্ত জাংগাল ও পুলের নির্মাণ কার্যও পুষ্করিণী খনন সম্পন্ন হয়েছিল।

ভবানীপুর সংক্রান্ত বিষয়টি নাটোরের পরলোকগত তারিনী ঠাকুর মহোদয় বিরচিত ভবানী কাহিনী অবলম্বনে উপস্থাপিত হলো।

www.amarboi.org

পঞ্চম অধ্যায়

শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি

শিক্ষা দীক্ষা ও সংস্কৃতি কোন কালেই রাতারাতি বিকাশ লাভ করেনি। সভ্যতা বিকাশের নিমিত্ত শিক্ষা দীক্ষা অপরিহার্য হলেও, ইহার অভাবে তাহ্জীব তমাদ্দুন কিন্তু একেবারে নিশ্চল হয়ে থেমে থাকেনি, বরং খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হলেও পা পা করে এগেই চলেছে। গৌড় বঙ্গের শিক্ষার ধারা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। হর্ষ বর্দ্ধণের আমলে, এদেশে মগধী জবান চালু ছিল। তৎপূর্বে জৈনরা কোন ভাষায় কথা বলতো তা বলা কঠিন। হিন্দু আমলে এখানে প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষাই প্রচলিত ছিল বলে জানা যায়। মুস্লীম আমলে গৌড় বঙ্গে ফার্সি জবান কেবল সরকারী ভাষা রূপে নহে বরং জনগণের মুখেও ইহা খৈয়ের মত ফুট্তো। একেতো ভাষা বদলের পালা, তদুপরি অক্ষর জ্ঞান আয়ত্ব করণের অভাব ও অনীহা, এ দুয়ে মিলে গণশিক্ষাকে বহু যোজন পেছনে ঠেলে দিয়েছিল। তাইতো দেখা গিয়েছে যে, আজ হতে একশ বছর পূর্বে শেরপুরে কোন সুশিক্ষিত লোক তো দূরের কথা, একজন অর্ধ শিক্ষিত লোকও খুঁজে পাওয়া যেতনা। অবশ্য এর কিছু দিন পর, জনৈক বিদ্যোৎসাহী হিন্দু ব্যক্তি এ জাতীয় দুর্নাম খন্ডন করে সর্বপ্রথম এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

সেকালে মহল্লার কোন অল্প শিক্ষিত লোক, সাংসারিক কার্যের পাশা-পাশি দু'চার জন ছাত্রকে প্রাথমিক শিক্ষা দিতেন। ছাত্রগণ বিনিময়ে উস্তাদের গৃহস্থালীর কাজে কিছু সহায়তা করতো, অথবা কিছু নগদ পয়সা কড়িও দিত। শিক্ষকগণ পারিতোষিক স্বরূপ কিছু তরি-তরকারি অথবা ফল-মূল ও পেতেন। সেকালে ছাত্ররা পড়ুয়া এবং উস্তাদগণ গুরু মহাশয় নামে অভিহিত হতেন। পূর্বে চাল ভাজার নির্যাস দিয়ে কালি তৈরী এবং কলাপাতা ও তালপত্রে লেখার কাজ চলতো। এইরূপে শিক্ষাদান পদ্ধতি ক্রমান্বয়ে গতিশীল হতে থাকে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বারের মত শেরপুরে একটি সরকারী ভার্নাকুলার বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উক্ত বিদ্যালয়টি শেরপুরের পরলোকগত বিদ্যোৎসাহী জমিদার বাবু গিরিশচন্দ্র সান্ন্যাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। অতঃপর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বিদ্যালয়টি সাহায্য প্রাপ্ত ইংরেজি স্কুলে পরিনত হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর তারিখে এখানে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। অত্র এন্ট্রান্স স্কুলটি স্থাপিত হলেও পূর্ব প্রতিষ্ঠিত মধ্য ইংরেজী স্কুলটি (Upgraded) পরলোকগত জমিদার মহেশ নারায়ণ মুনসী মহাশয়ের প্রচেষ্টায় কিছু দিন চলে পরে বন্ধ হয়ে যায়। পরে শেষে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে "ডায়ামন্ড জুবিলীর" সময় উল্লেখিত এন্ট্রান্স স্কুলটি "ডায়ামন্ড জুবিলী" হাইস্কুল নামকরণ হয়েছে।

www.amarboi.org

শেরপুরের তদানীন্তন প্রধান জমিদার, পরলোকগত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী ও তাঁর পরিবারস্থ লোকেরা আলোচ্য স্কুলটি দশ সহস্র টাকা ব্যয়ে নির্মান করে দেন এবং বিদ্যালয়ের স্থায়ী তহবীলের (Reserve fund) জন্য দেড় সহস্র টাকা দান করেন। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে অত্র স্কুলের সর্ব মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল একশ পঁচিশ জন।

গণশিক্ষার এ মন্থরগতি লক্ষ্য করে, পরলোকগত শ্রী হরগোপাল দাস কুন্ডু মহাশয় "শেরপুরের ইতিহাস" গ্রন্থে আক্ষেপ করে বলেন- "শেরপুরে শিক্ষার দিকে লোকের মনোযোগ দৃষ্ট হয়না। স্কুলটি (ডায়মন্ড জুবিলী হাইস্কুল) আছে বলিয়া দেখা দেখি ছেলেকে পাঠান হয় মাত্র; কিন্তু কিরূপ করিয়া উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিতে হয়, সে বিষয়ে কেহ বড় একটা চিন্তা করেন বলিযা বোধ হয় না। আর এখানে বার মাস আমোদ প্রমোদের অনুষ্ঠান থাকায়,ছেলেরা প্রথম হইতে আমোদ প্রিয় হইয়া উঠে। সুতরাং লেখাপড়ায় সেরূপ মনোযোগী হইতে পারে না। তাহার ফলে এই বিংশ শতাব্দীতেও শেরপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নাই বললেই হয়। কেবল একমাত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল অল্প দিন হইল বি,এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শেরপুরের মুখ রক্ষা করিয়াছেন। নগেন বাবুই শেরপুরের প্রথম গ্রাজুয়েট। এন্ট্রান্স পাস জন কতেক ছাত্র আছেন। অন্যান্য স্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম হইতেও ১০/১৫ জন গ্রাজুয়েট, ৪/৫ জন ডিপুটি ইঞ্জিনিয়ার প্রভৃতি বাহির হইতে দেখা যায়। শিক্ষা বিষয়ে এই সমৃদ্ধশালী জনপদের এইরূপ পশ্চাৎপদ থাকা নিতান্তই লজ্জার বিষয় সন্দেহ নাই।"

ডায়মন্ড জুবিলী হাইস্কুল ব্যতীত তখন এখানে দুটি সংস্কৃত টোল ছিল। এছাড়া দুটি প্রাথমিক পাঠশালা, একটি বালিকা বিদ্যালয় ও একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীযুক্ত হর গোপাল দাস কুন্ডু মহাশয় তখনকার দিনের স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে মন্তব্য করেন- "স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে শেরপুর ততোধিক পশ্চাৎপদ। অল্প দিন হইল গভর্ণমেন্ট কর্তৃক একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বটে, কিন্তু শিক্ষা প্রণালী সন্তোষজনক নহে।"

আজ হতে একশ বছর পূর্বে এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ছিল খুবই সীমিত। তখনকার জনসংখ্যা তুলনায় এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতই সীমিত ছিল যে, উহার দ্বারা গণশিক্ষার কিছু মাত্র অগ্রগতি সাধিত হয়নি। শহর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়া,তখন পাড়া গ্রামের কোথাও কোন বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব ছিল না,হেতু দীর্ঘকাল পর্যন্ত মফস্বরের মানুষ শিক্ষার আলোক হতে একেবারেই বঞ্চিত ছিল। পরবর্তীকালে মফঃস্বলের দু'একটি উল্লেখযোগ্য স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। থানা সদরের সহিত মফঃস্বলের যোগাযোগ ব্যবস্থা দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন থাকায় ছেলে-মেয়েরা পাড়া গ্রামের বাইরে লেখা পড়া করার

www.amarboi.org

সুযোগ পেতনা বললেই চলে। সকল কেন্দ্রীয় পরীক্ষা তখন কলকাতা শিক্ষা বোর্ডের অধীন অনুষ্ঠিত হতো। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা খুবই সীমিত ছিল। আর্থিক অবস্থা এমন অস্বচ্ছল ছিল যে, অভিভাবকদের পক্ষে পোষ্যদের লেখাপড়ার ব্যয় ভার বহন করাছিল দুষ্কর। অনেক ধর পাকড় ও চেষ্টা চরিত্র করে যদিও বা দু'চারটি বিদ্যালয় খোলা হতো,সেখানেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ছাত্র পাওয়া যেতোনা। তাছাড়া দীর্ঘ দিনের ইংরেজদের দুঃশাসনে সাধারণ লোক জনের মধ্যে উন্নয়ন-উন্নতি ও লেখাপড়ার প্রতি উৎসাহ বোধ স্থবির হয়ে পড়েছিল। পরিশেষে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর জনগণ শিক্ষার প্রতি কিছুটা আগ্রহ শীল হয়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে পাড়া গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপনের প্রবণতা বাড়তে থাকে। তবে এই প্রবণতা বৃদ্ধি আশানূস্বরূপ ছিল না, কারণ জেলার অন্যান্য থানা অপেক্ষা শেরপুরের শিক্ষিতের হার এখনও অনেক কম। এখনও ইহা ২৩% অতিক্রম করতে পারেনি।

শেরপুর একটি ঐতিহাসিক বর্দ্ধিষ্ণু পৌরশহর হওয়া সত্বেও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে প্রতিষ্ঠিত ডায়ামন্ড জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় ও পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিত একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ছাড়া, দীর্ঘ একশ বছরের মধ্যে আর কোন উচ্চ বিদ্যালয় বা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। অবশ্য কিছু দিন পূর্বে এই শহরে এ,জে উচ্চ বিদ্যালয় ও মজিবর রহমান উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও শেরপুর টাউন ক্লাব পাবলিক লাইব্রেরী মহিলা মহাবিদ্যালয় নামে আরও তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। এর আগে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে শেরপুর ডিগ্রী কলেজটি প্রতিষ্টিত হয়েছে।একই ভাবে জামুর ইসলামিয়া কলেজ ও জয়লা কলেজ দুটি স্থাপিত হয়েছে।

যা হোক, সময়ের দাবী ও সচেতন ব্যক্তিদের তৎপরতা সহ, রাজনৈতিক নেতৃবর্গের প্রচেষ্টায় পঞ্চাশের দশকের শেষের দিকে অত্র থানার কতিপয় উল্লেখ যোগ্য স্থানে উচ্চ বিদ্যালয়, আর মাদ্রাসা ও প্রাথিমক বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয। এর ফলে সীমা বাড়ী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,ছোনকা উচ্চ বিদ্যালয়,খানপুর উচ্চ বিদ্যালয়, উচরং বন্দেআলী উচ্চ বিদ্যালয়, পেঁচুল উচ্চ বিদ্যালয়, কচুয়া পাড়া উচ্চ বিদ্যালয়,জামুর ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, থানপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ভবানীপুর উচ্চ বিদ্যালয়, তাঁতড়া উচ্চ বিদ্যালয়, বিশালপুর উচ্চ বিদ্যালয়, কালসিমাটি উচ্চ বিদ্যালয়, খামারকান্দি উচ্চ বিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি গড়ে উঠে। এক সময় শেরপুর শহীদীয়া মাদ্রাসা ব্যতীত অত্র থানায় আর কোন ধর্মীয় বিদ্যাপীঠের অস্তিত্ব ছিল না। পরবর্তীতে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হওয়ায়,এ থানায় অনেকগুলি মাধ্যমিক ও উচ্চ

www.amarboi.org

মাধ্যমিক স্তরের দাখিল ও আলীম-ফাজিল মাদ্রাসা সহ কতিপয় বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসা অস্তিত্ব লাভ করে। এক নজরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ-

		সরকারী	বেসরকারী
১।	মহাবিদ্যালয়	০	০৪টি
২।	বালক উচ্চ বিদ্যালয়	০	৩৩টি
৩।	বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়	০	০২টি
৪।	জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়	০	০৭টি
৫।	প্রাথমিক উচ্চ বিদ্যালয়	৮৭টি	৩০টি
৬।	মাদ্রাসা	০ ,,	২৬টি
৭।	কৃষি ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট	১টি	০০
৮।	সাঁটলিপি ইন্সটিটিউট		০১টি
৯।	ল্যাবরেটরি স্কুল		০১টি
১০।	কেজি স্কুল		০৯টি
১১।	শিক্ষিতের হার	২৩.৬	

শেরপুর শহীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসা

www.amarboi.org

অতীতে শেরপুরে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল খুবই পশ্চাৎপদ। এই পশ্চৎদপদতা আবার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক অপেক্ষা উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রেই ছিল অধিক হতাশা ব্যঞ্জক। সৌভাগ্যক্রমে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মীয় উচ্চ শিক্ষা সুগম করার জন্য এখানে শহীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয। লক্ষ্যনীয় যে আলোচ্য মাদ্রাসাটি স্থানীয় উদ্যোগে নহে বরং নোয়াখালী জেলা নিবাসী সুযোগ্য আলেম মরহুম মাওলানা আহমদ উল্লাহ ও ডোমর গ্রাম (বগুড়া) নিবাসী মরহুম মাওলানা হাছান আলীর যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। মাদ্রাসাটি এতদঞ্চলে ইসলাম প্রচারার্থ আগত মহান দ্বীনের সৈনিকদের অন্যতম, শহীদ বীর হযরত তুরকান (রাঃ) এর স্মৃতি স্বরূপ তাঁরই মাজার সংলগ্ন করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমগ্র শেরপুর থানায় এটিই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত দ্বীনি বিদ্যাপীঠ শেরপুরের অন্যতম সাবেক হিন্দু জমিদার চৌধুরী পরিবার এ মাদ্রাসাটি স্থাপন নিমিত্ত পাঁচ একর জমিদান করেন। ইহা ছাড়া শেরপুর থানার ধর্মপ্রাণ বিভিন্ন বিদ্যোৎসাহী মুসলমান,মাদ্রাসাটির অনুকূলে প্রায় দেড়শত বিঘা কর্ষণ যোগ্য ভূমি দান করেন। কৃষ্ণপুর নিবাসী প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন মাওলানা শামছ উদ্দিন দীর্ঘ দিন যাবৎ অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে আসছেন। এখানে ১৯৭৩-৭৪ সালে হাদিস শাস্ত্রে কামিল কোর্স প্রবর্তন করা হয়।

সাবেক আমলে শেরপুর পৌরসভায় হিন্দু ধর্ম ভিত্তিক যে দুটো টোল খোলা হয়েছিল, তা অনেক দিন পূর্বেই বন্ধ হয়ে গেছে। পৌরসভা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উলিপুর বিদ্যালয় ছাড়া শেরপুর পৌরসভায় আর কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল না। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে টাউন কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে দীর্ঘ দিন পর উহা সরকারী করণ হয়। অতঃপর থানা পরিষদ অংগনে, আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে, আর একটি সরকারী প্রাথমিক স্কুল এখানে অস্তিত্ব লাভ করে। সর্ব শেষে নছিরণ নেছা বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি চালু করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত এখানে নয়টি শিশুতোষ (কে,জি স্কুল) বিদ্যালয় চালু আছে। শেরপুর ডায়ামন্ড জুবিলী উচ্চ বিদ্যলয়টির এক্ষণে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। বিদ্যালয়টির দ্বিমুখী করা হয়েছে। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ মরহুম নাজির উদ্দিন আহমদ দীর্ঘ দিন অত্র স্কুলে সুনামের সহিত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর জনাব আহমাদ আলী উক্ত দায়িত্ব

www.amarboi.org

পালন করেন এবং এক্ষণে জনাব আব্দুল হামিদ সাহেব উক্ত স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনরত আছেন।

শেরপুরের প্রাচীনতম ডি, জে, উচ্চ বিদ্যালয়

পূর্বেই উল্লেখিত আছে যে, শেরপুরের উচ্চ শিক্ষার দ্বার দীর্ঘদিন পর্যন্ত রুদ্ধ ছিল। জেলা সদরের সাথে সাথেই যে থানাটি পৌরসভার মর্যাদায় উন্নীত হয়েছিল, সেই স্থানটি উচ্চ শিক্ষার গৌরব হতে পিছিয়ে থাকার কারণ কি হতে পারে? অজ্ঞাত কারণ অনেকেই থাকতে পারে, তবে এর মধ্যে অন্যতমটি ছিল উদ্যোগ্যের অভাব। ১৯৬৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত এখানে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ তো দূরের কথা, এ সম্পর্কে কোন আলোচনা মাত্র শোনা যায়নি। জন শ্রুতিতে জানা যায় যে, একবার নাকি জনৈক প্রভাবশালী জমিদার পুত্র,শেরপুরে কলেজ প্রতিষ্ঠার কথা প্রস্তাব করেছিলেন, কিন্তু সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করায়, তা আর হয়ে উঠেনি।

উচ্চতর শিক্ষার দাবী অনুচ্চারিত থাকলেও এর প্রয়োজনীয়তা কিন্তু অনেক মহলেই অনুভূত হচ্ছিলো। ইতিমধ্যেই চন্দনবাইশাতে কলেজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। এর পর নন্দিগ্রামেও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বিষয়টি সজোরে নাড়া দিচ্ছিলো। অবশেষে ১৯৬৭ সালের শেষের দিকে উহা স্থানীয় গণ্যমান্য বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের নিকট প্রকাশ করলে, তাঁরা আমাকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ অনূসরণ করে ১৯৬৭ সালের ২১লা নভেম্বর তারিখে কলেজ প্রতিষ্ঠা কল্পে স্থানীয় থানা পরিষদ মিলনায়তনে একটি সাধারণ সভা

www.amarboi.org

আহূত হয়। আইয়ূব- মুনঈম খাঁন ছিলেন তখন, এদেশের দন্ড মুন্ডের সর্বময় কর্তা। নতুন কলেজ খোলার অনুমতি লাভ ছিল তখন এক অসম্ভব ব্যাপার। অথচ এ দায়িত্ব বহুল ঝুঁকিটা প্রাথমিক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে আমাকেই মাথা পেতে নিতে হয়েছিল। বগুড়া আযিযুল হক মহা বিদ্যালয়ের তদানীন্তন প্রবীন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু জনাব গোলাম উদ্দিন ও মরহুম মুহ্সীন আলী দেওয়ানের পরামর্শক্রমে পূর্বোক্ত সভাটি আহূত হয়েছিল। স্থানীয় সুধী বৃন্দ ও জন-সাধারণ, কলেজ প্রতিষ্ঠার অনুকূলেই রায় দিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হলো কিন্তু শিক্ষা বছরের প্রান্তিক সময় হেতু পরবর্তী বছরের প্রতীক্ষায় দিন গণনা করতে হলো। পরিশেষে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হতে কলেজ প্রতিষ্ঠার বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয। শ্রদ্ধেয় শিক্ষা গুরু অধ্যাপক মুহসীন আলী দেওয়ান প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। স্থানীয় হিন্দু-মুসলিম জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন ও সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা বছরেই পূর্নাংগ রূপ পরিগ্রহ করে। তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, জনাব গোলাম রব্বানী সরকার (ধনকুন্ডি) প্রাথমিক অনুদান স্বরূপ তিনশত টাকা দান করেন। উক্ত টাকা সম্বল করেই কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যাত্রা শুরু হয়। স্থানীয় সাবেক প্রখ্যাত জমিদার, বাবু শৈলেন্দ্র কিশোর মুনসী (বাদল বাবু) জনাব আব্দুল মান্নান বিশ্বাস, বাবু জ্যোতিষ চন্দ্র সাহা, জনাব মাদার বখশ, মরহুম আজগর আলী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ অত্র কলেজ প্রতিষ্ঠা লগ্নে অকাতরে জমি দান করেন। কলেজটি প্রতিষ্ঠালগ্নে সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ও প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আমানুল্লাহ খানও যথেষ্ট সহযোগিতা করেন।

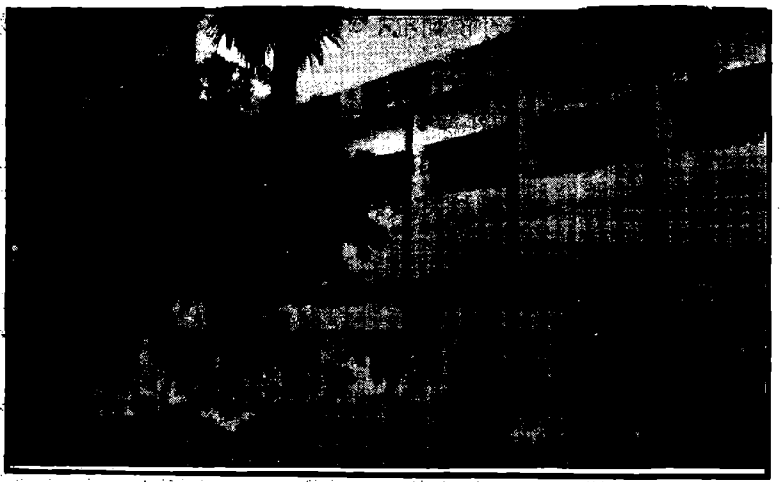

শেরপুর স্নাতক মহাবিদ্যালয় এর একাডেমিক ভবন

www.amarboi.org

তদানীন্তন টাউন কমিটির চেয়ারম্যান জনাব গাজি রহমান কলেজ পরিচালনা কমিটির প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন। কলেজ অঙ্গনের ভূমি সংগ্রহ ব্যাপারে তিনি ছিলেন শীর্ষ স্থানীয়। পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক জনাব ইজহারুল ফয়েজ, জনাব আমানুল্লা খান, মুরাদ্দুজ্জামান, মাহবুবুবর রহমান চৌধুরী (সাতানী হাউজ, বগুড়া) হাবিবুর রহমান ভান্ডারী,বাবু অমিয় গোপালকুন্ড, বাবু অমৃতলাল কুন্ড, রাধিকানাথ দত্ত, ডাঃ কে,এম, রহমাতল বারী, ডাঃ শাহ্ মতিউর রহমান, তরফদার, জনাব আব্দুল আজিজ (মৌমিনপুর) শাহ আব্দুল বারী, ডাঃ আশরাফ আলী, মাওঃ ইব্রাহীম হোসেন চন্দনী,মাওঃ অধ্যক্ষ শামছুদ্দীন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্যদের মধ্যে মরহুম অধ্যাপক এ, এস, এম, রেজাউল মোস্তফা, মাওঃ আলতাফ হোসেন, অধ্যাপক সুভাষ চন্দ্র সাহা, সাবেক দপ্তর কর্মচারী জনাব লোকমান আলী ও পিওন মরহুম এরশাদ আলী, কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্নে বিশেষ ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

বিগত স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন মহাবিদ্যালয়টির বর্ণনাতীত ক্ষতি সাধিত হয়। আর্থিক ক্ষয়-ক্ষতি ক্রমান্বয়ে পরিপূরণ হলেও এর অপূরণীয় ক্ষতিটি আজীবনেও পরিপূরিচত হবে কি না সন্দেহ। কারণ,বিগত স্বাধীনতা আন্দোলনে অত্র কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ জনাব মুহ্সীন আলী দেওয়ান,বর্বর পাক বাহিনীর হাতে নির্মম ভাবে নিহত হন। শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। তার পরিত্যক্ত শূণ্য আসনে অবশেষে আমাকেই (লেখক) অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

অত্র মহাবিদ্যালয়ে একযোগে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক শ্রেণী খোলা হয়। বর্তমানে এই কলেজের ছাত্র সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার। ১৯৮৪ সালে অত্র কলেজে ডিগ্রী শ্রেণীতে বিজ্ঞান খোলা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানে ৪৯ জন শিক্ষক বিভিন্ন বিষয়ে কর্মরত আছেন।

শেরপুরে একালে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল বলে জানা যায়। সেকালের অন্যান্য পন্ডিতদের মধ্যে পরলোকগত পন্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র তর্ক -বাগিশের নাম সমধিক উল্লেখ যোগ্য। এছাড়া এখানে টুকি-টাকি সাহিত্য চর্চা ও কাব্যালোচনাও হতো। পূর্বে "পল্লীতে কাব্যালোচনার কতকগুলি সুবিধা প্রচলিত ছিল। প্রথমতঃ কথকতা বহু শাস্ত্র পুরাণ কথকগণ বিবিধ রস সমাবেশ করিয়া পৌরানিক আখ্যায়িকা গুলি অশিক্ষিত পল্লী বাসীর মনে হৃদয় গ্রাহী ভাবে বর্ণনা করিতেন। তাহাতে সাধারণ নর-নারীর হৃদয়ে যেমন শাস্ত্র জ্ঞানের সমাবেশ

www.amarboi.org

হইত, তেমনি মধুর কাব্যকলা-বিকাশ হইয়া জীবন সরস করিয়া তুলিত। এই সমস্ত কথকতার কাব্যাংশ লইয়া নিরক্ষর গ্রাম্য কৃষক বা রমনীগণ সুন্দর সুন্দর ছড়া প্রস্তুত করিতেন.....।" সেকালে কোন নিয়মিত মক্তব, মাদ্রাসা ছিলনা। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা পরিবারের উর্দ্ধতন ব্যক্তি বা কোন মুসল্লী সাবের নিকট হতে ধর্ম সংক্রান্ত আচার-আচরণ ও কুরআন-হাদিস শিক্ষা গ্রহণ করত। পূর্ব কালে খন্দকার সাবরা, দ্বীনি শিক্ষা প্রচারার্থ গ্রাম বাংলার মুসলমান মহল্লায় ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন এবং প্রয়োজন বোধে টুকি-টাকি টোটকা চিকিৎসাও করতেন। ফার্সি ভাষায় পারদর্শী অনেক মৌলভী সাহেব, অভিজাত পরিবারে গৃহ শিক্ষকের কাজ করতেন এবং বিনিময়ে মূল্যবান পারতোষিক লাভ করতেন। সেকালে অধিকাংশ মুসলমান পরিবারে, পুথি কেতাব পঠনের প্রচলন ছিল। ছহি জংগনামা, ছায়েত নামা, কারবালা কাহিনী, কালু গাজি চম্পাবতি প্রভৃতি কেতাব পড়ে উপাদান, উপদেশ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতো। এছাড়া হিন্দু কবিদের মনসার ভাসান, রাম মংগল, যুগিয়া কাজ এবং মুসলমান কবিদের রচিত গাজির গান, রংজারি, ইমাম যাত্রা, একদিলের গান, মোনাই যাত্রা, প্রভৃতি সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হতো।

শেরপুরে তখনকার দিনে কোন প্রখ্যাত কবি জন্মগ্রণ করেছিলেন বলে জানা যায়নি। তবে পাঁচালি ও সঙ্গীত রচনায় অনেকেই উৎসাহী ছিলেন। পবলোকগত লালচাঁদ, ঘোষাল চন্দ্র, পঞ্চানন ওরফে ব্রজ মোহন দাস, পাঁচালি ও সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছেন। এতদ্ব্যতীত কেউ কেউ কাব্য, জ্যোতিষ, পাক প্রণালী প্রভৃতি নানা বিষয়ক গ্রন্থ রচণা করেন। শেরপুরের ইতিহাস প্রনেতা বাবু হর গোপাল দাস কুন্ডু মহাশয়,লালচাঁদ ও ব্রজ মোহন রচিত কয়েটি সঙ্গীত পরিবেশণ করেছেন। পাঠকের অবগতির জন্য উহার দুটি নিম্নে উদ্ধৃত হলো।

রচনা কাল- ১২২০ -

বাজিল বাঁশী হয়া উদাসী, হাসি নাইকো মুখেতে।

জটিলা গঞ্জনে আমি রইতে নারি ঘরেতে।।

ও শ্যাম তোর পীরিতি, আমি রইতে নারি ঘরেতে।

আমি রইতে নারি সম্বরিয়া, মরি বাঁশীর স্বরেতে -

আবার পীরিতের দুষ্ট দেখ, আছে আমার গৃহেতে।

আমার প্রেমের ফাঁসি দিয়া গলে, টানিতেছে মোর অন্তরে।।

ননদিনীর কুবচন নাহি পারি সহিতে।।

তুমি বাজাও বাঁশী ও শ্যাম গুপ্তকথা পুজা হয়,

www.amarboi.org

আমার ননদি দুর্জ্জন বড়, নাহি পারি যাইতে-
আমি দুপুরে যাই রন্ধনে, বৈধনা মোক বাঁশীতে।
আমি শুনিয়া তোমার বাঁশী শ্যাম,কান্দি ধূয়ার ছলেতে।
আমি ভয়াতুরা থাকি, সদা মৃগী বাঘের কোলেতে।।
কয় ব্রজ মোহন, কিসের কারণ ভাব রাধে অন্তরে।
শ্যাম থাকিতে কি করিবে শাউড়ী আর ননদে।।

(২)

কি যে ফেরে পড়লাম ওরে-
আসিয়া মা ভব ঘরে।।
ধন লোভে লোভী হয়ে, তোমায় রৈলাম পাশরিয়া-
উপায় দেখিনা তারা, কি তারিবে বল গো মোরে।।
পুরাণে শুনেছি আমি দীন হীন জনের তুমি,
বারে বারে ডাকি তোমায় তরাও মা তরা আমারে।।

পঞ্চানন, দুর্ভাগিয়া ব্রহ্মময়ী না ভরিয়া
কুসঙ্গ ভুজঙ্গ লয়ে নিশি হয়ে যাইছে ভোরে।।

এখানকার পরবর্তী লেখকদের মধ্যে দুর্গাচরণ চক্রবর্তী, গোবিন্দ চৌধুরী যোগেন্দ্র কিশোর মুনসী, রায় বাহাদুর, ও বাবু হর গোপাল দাস কুন্ডু মহাশয়ের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। দুর্গাচরণ চক্রবর্তী ছিলেন স্বভাব কবি। তিনি ফরমাইশ মাত্রই যে কোন সঙ্গীত রচণা করতে পারতেন। ইনি তরণী সেনবধ-রাম প্রভৃতি পাঁচালি রচণা করেছিলেন। গোবিন্দ চন্দ্র চৌধুরীর পিতার নাম জয়শংকর চৌধুরী। জাতিতে ইনি ব্রাহ্মণ। চৌধুরী মহাশয়ের রচিত পরমার্থ বিষয়ক সঙ্গীত গুলি বংগে বিশেষতঃ উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল। তার সম্ভাব উদ্দীপক সঙ্গীত গুলি প্রকৃতই চমকপ্রদ। নিম্ন লিখিত গ্রন্থ গুলি তিনি রচণা করেন (১) সম্ভাব সঙ্গীত (২) সঙ্গীত পুষ্পাঞ্জলী (৩) প্রমীলার

www.amarboi.org

চিতারোহণ (৪) অঙ্গুরী সংবাদ (৫) সতী নিরঞ্জন (৬) যধিষ্ঠির স্বর্গারোহন (৭) শুম্ভু নিসম্ভু বধ পাঁচালী (৮) কলংক ভঞ্জন (৯) ললিত লবঙ্গ কাব্য। কথিত আছে যে চৌধুরী মহাময় রচিত সদ্ভাব সঙ্গীতের গান গুলি শ্রবণে, প্রীত হয়ে রংপুরের তাজ হাটের পরলোকগত মহারাজা, গোবিন্দ লাল রায় বাহাদুর, উক্ত পুস্তক খানি মুদ্রিত করেছিলেন। চৌধুরী মহাশয় ভাল চিত্র ও অন্যান্য শিল্প কর্মেও বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

পরলোকগত যোগেন্দ্র কিশোর মুনসী মহাশয় ও শেরপুরের একজন সাধক কবি ছিলেন। তার রচিত গ্রন্থের নাম শ্রী শ্রী গীতা মৃত লহরী। অনুরূপ ভাবে কালি কিশোর মুনসী রায় বাহাদুর ও শেরপুরের একজন গ্রন্থকার ছিলেন। হৃদয় কুসুম ও ফুল মল্লিকা পুস্তিকাদ্বয় তারই রচিত।

বাবু হর গোপাল দাস কুন্ডু মহাশয়, একজন সার্থক গ্রন্থকার ছিলেন। আজ হতে প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শ্রীযুক্ত কালিচরণ দাস কুন্ডু। বাবু হর গোপাল ইংরেজী, বাংলা ও সংস্কৃত ভাষায় পান্ডিত্ব অর্জন করেন। বঙ্গ ভাষায় তার সর্ব শ্রেষ্ঠ রচনা "শেরপুরের ইতিহাস" রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 'এই ইতিহাস অংশ' বিশেষ সংখ্যা রূপে বঙ্গাব্দ ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। ভাষা ও ঘটনা বৈচিত্রে গ্রন্থ খানি অপূর্ব। তৎকালে বঙ্গ ভাষায় তার মত দক্ষ লেখক শুধু শেরপুরে কেন, গোটা উত্তর বঙ্গেই খুব কম দেখা যায়। তিনি ছিলেন একজন রক্ষণশীল লেখক। প্রাচীন পন্থী হলেও তার লেখায় গতিশীলতার অভাব নাই।

উল্লেখিত লেখক গোষ্ঠীর তিবোধানের পর পরবর্তী দীর্ঘ দিন পর্যন্ত আর কোন উল্লেখযোগ্য কবি সাহিত্যিক, শেরপুরে আর্ভিভূত হননি। দীর্ঘ বিরতির পর বেগম রোমেনা আফাজ এখানকার সাহিত্য সংস্কৃতির পরিমন্ডলে এক উজ্জল নক্ষত্র রূপে উদিত হন। বেগম রমেনা ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে শেরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তবে তাঁর সাহিত্য চর্চা শুরু হয় বগুড়া শহরে। লিখিকার পিতা মরহুম কাজেম উদ্দিন আহমদ ছিলেন, একজন পুলিশ ইন্‌সপেক্টর। কার্যব্যপদেশে সারা বাংলাদেশ এবং দিল্লী আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে তাকে অবস্থান করতে হয়। তাই পিতার সংগে রোমেনা আফাজ কেও ছোট বেলা হতেই স্থান হতে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করতে হয়।

www.amarboi.org

রোমেনার শিক্ষা জীবন শুরু হয় বর্দ্ধমান জেলার ধানবাদে। প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া তার বেশী দূর এগোতে পারেনি। স্কুল কলেজের লেখা পড়ায় অনগ্রসর থাকলেও সাহিত্য চর্চায় তিনি ছিলেন অগ্র পথিক। রোমেনা আফাজ মাত্র ১৩ বছর বয়সে দক্ষিণ বগুড়ার অন্যতম সমাজ কর্মী, ডাক্তার আফাজ উল্লাহর সহিত পরিণিতা হন। রোমেনা জননী ছিলেন এক বিদুষী রমণী এবং সাহিত্য রস পিপাসু মহিলা। তাঁর নিকট থেকে তিনি যথেষ্ট উৎসাহ উদ্দীপনা লাভ করেন। রোমেনা আফাজ, উত্তর বঙ্গের কবি সাহিত্যকদের মধ্যে অন্যতম। এ যাবৎ তিনি বিভিন্ন বিষয়ে ১২৫ খানা বই লিখেছেন।

বিশ্ব সাহিত্য পরিষদ, শেরপুর শাখার তৎপরতা ও অগ্রগতি প্রশংসনীয়। শেরপুর টাউন কলোনী নিবাসী, বিশিষ্ট সমাজ কর্মী, সাহিত্য সেবী ও চাকুরী জীবি জনাব বেলায়েত হোসেন আলোচ্য বিশ্ব সাহিত্য পরিষদের পাঠক ও সদস্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রানান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ইতোমধ্যেই এই পরিষদ, সাহিত্য চর্চা ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বিশ্ব সাহিত্য পরিষদ, উৎসাহী পড়ুয়াদেক দেশ-বিদেশের সাহিত্য পাঠ-পঠন ও রোমন্থনের প্রতি আগ্রহশীল করে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এখানকার কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুনদের মধ্যে, বই-পুস্তক রচণা ও প্রকাশের উদ্যোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি এমনি একজন তরুণ, মরহুম মাওঃ ইব্রাহীম হোসেন চন্দনীর পুত্র জনাব আব্দুস সালাম চন্দনী 'মুক্তিযুদ্ধ, জাতীয়তাবোধ ও জিয়াউর রহমান' নামে একখানি বই প্রকাশ ও বাজারজাত করে পাঠকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন। একই ভাবে সাংবাদিক জনাব সাইফুল বাড়ী ডাবলু 'শেরপুরের ইতিহাস' নামে একখানা ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

অধুনা শেরপুরের সাহিত্যা মোদি যারা কবিতা কাব্য ও উপন্যাস লিখে সুনাম অর্জন করেছেন তন্মধ্যে জনাব মুনশী হোসাইন বিন আব্বাছ, জনাব মনসুর আহমদ ফটিক, মরহুম মাওলানা ইব্রাহীম হোসেন চন্দনী ও জনাব আব্দুর রউফ অন্যতম। জনাব চন্দনী সাহেব, ইসলামীগজল মালা ও হক নাসিহত নামে দুখানা ছন্দময় পুস্তিকা রচণা করেন। জনাব হোসাইন বিন আবাছ একজন বলিষ্ঠ কাব্যিক। তিনি এই চরম বৃদ্ধ বয়সেও কবিতা কাব্যে ডুবে আছেন। এই বর্ষীয়ান কবির বিভিন্ন রচনা সাময়িক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

www.amarboi.org

জনাব মনসুর আহমদ একজন প্রতি শ্রুতিশীল লেখক। ১৯৩৬ সালে তিনি শেরপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুসাহিত্যিক বেগম রোমেনা আফাজের কনিষ্ঠ সহোদর। রোমেনা আফাজের মত তিনিও শিক্ষা-দীক্ষায় বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেননি। তবে সাহিত্য চর্চায় ইতোমধ্যেই তিনি অনেক দূর অগ্রসর হয়েছেন। মনসুর আহমদ শৈশব কাল থেকেই সাহিত্য সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। তার রচিত কবিতা, ছোট গল্প ও ছড়া ছন্দ উভয় বাংলার পত্র পত্রিকায় বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য চর্চা করতে গিয়ে তিনি যে কয়েক খানা উপন্যাস রচনা করেছেন তন্মধ্যে "বোবা মেয়ে, স্মৃতি রেখা, ফুল্লোরা, মধুমিলন, ও প্রিয়ার প্রেম, প্রধান। নিশীথের আলো. রহস্য উপন্যাস খানা, তাঁর প্রথম লেখা বই। লেখক দস্য ফ্লাইংহুড সিরিজ নামে একটি ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক রহস্য সিরিজ রচণাও প্রকাশ কিছুদনি অব্যাহত রাখেন।

শেরপুর থানার আর একজন সাহিত্যকের নাম জনাব আমানুল্লা খাঁন। তিনি অত্র থানার জয়লা গ্রামের জনাব খিদির উদ্দিন খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৯৪১ সালে জন্ম। তিনি ১৯৫৪ সালে চান্দাইকোনা উচ্চ বিদ্যালয় হতে প্রবেশিকা ও ১৯৬৩ সালে বগুড়া আযিযুল হক মহাবিদ্যালয় হতে বিএ, ডিগ্রী লাভ করেন। জনাব খাঁন একজন পথম শ্রেণীর বাগ্মী ও রাজনিতিক। ছাত্র জীবন হতেই তিনি বিভিন্ন আন্দোলনে জড়িত ছিলেন এবং এজন্য তাকে একবার কারা বরণও করতে হয়েছে। তিনি একজন সাবেক জাতীয় পরিষদ খ্যাতনামা সদস্য। শৈশব কাল হতেই জনাব খান সাতিত্য চর্চা আরম্ভ করেন। প্রধানতঃ তিনি একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। জনাব খাঁন কিছু দিন ঢাকা হতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক "সোণার বাংলা" পত্রিকায় সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের বগুড়া প্রতিনিধি ও ১৯৬৫ সালে উক্ত পত্রিকার ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তিনি বগুড়া হতে প্রকাশিত "দৈনিক বাংলাদেশ" পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান সম্পাদক। উত্তর বঙ্গ হতে প্রকাশিত এটিই প্রথম দৈনিক পত্রিকা। জনাব খাঁন "স্বাধীনতার দুই দশক" শীর্ষক একটি আকর্ষনীয় সংকলন সম্পাদনা করেন। Northern Trade and Industry সংকলনটি তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। জনাব আমানুল্লা খান বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় গবেষণামূলক প্রবন্ধাদি লিখে থাকেন। ইনি "আজকের বগুড়া" নামে একখানি প্রামান্য ইতিহাস ধর্মী বই রচণা করে সুনাম অর্জন করেন। জনাব আমানুল্লাহ খাঁন, ছাড়া শেরপুর থানার আর একজন সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিকের নাম জনাব রেজাউল মোস্তফা মোহাম্মাদ আসাফউদ্দৌলা। ইনি শেরপুর থানার ধনকুন্ডি গ্রামের সাবেক বিশিষ্ট জমিদার জনাব মরহুম আজগর আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র।

www.amarboi.org

কলকাতায় লেখা পড়া শেষ করে তিনি জীবিকাও পেশা হিসেবে সাংবাদিকতা আরম্ভ করেন। দীর্ঘ দিন তিনি প্রাচীন দৈনিক আজাদের সহ-সম্পাদক ছিলেন। অতঃপর তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের বার্তা সম্পাদক রূপে দীর্ঘ দিন কাজ করেন। দেশের বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য সমস্যাও গবেষনা বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। সারা বাংলাদেশে যে কয়েক জন প্রথিত যশা সাংবাদিকের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য, তন্মধ্যে জনাব আসাফউদ্দৌলা ছিলেন অন্যতম। তিনি দীর্ঘ দিন পর্যন্ত অত্যন্ত সুনামের সহিত বাংলাদেশ বেতারে পল্লী শ্রোতাদের জন্য সময়োপযোগী অনুষ্ঠান প্রচার কার্যে নিয়োজিত ছিলেন। পাক-ভারত,বাংলা উপমহদেশের মুসলীম জাগরণের অন্যতম দিশারী মহা মনীষী মরহুম ইসমাইল হোসেন সিরাজি ছিলেন তাঁর মাতামহ। তিনি সাংবাদিক শুভেচ্ছা সফরে বিশ্বের কতিপয় উল্লেখযোগ্য দেশ সফর করেন। জনাব দৌলা বিগত ১৯৮৪ সালে অকালে ইন্তেকাল করেন।

এখানকার আর একটি উল্লেখযোগ্য নাম, বেদার উদ্দীন আহমাদ। ইনি শেরপুর শহরে ১৯৫২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। জনাব বেদারউদ্দীন ছিলেন বিশিষ্ট কণ্ঠ ও সুর শিল্পী। সাংস্কৃতিক শুভেচ্ছা সফরে তিনি মধ্য প্রাচ্যের কতিপয় দেশ সফর করেন। ইনি ঢাকা বেতার ও বুলবুল একাডেমির সহিত সুসম্পৃক্ত ছিলেন।

উনিশ-শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্যন্ত শেরপুরের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমিত ছিল। এর পর কি এক অজানা কারণে সেই চর্চা টুকুও একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে এবং উহা কেবল পূজা পার্বণ,জারি ও যাত্রা গানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে থেকে যায়। দীর্ঘ দিন পর্যন্ত এই অবস্থা চলার পর আবারও একবার সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে ক্রমান্বয়ে গতি সঞ্চার হতে থাকে। তবে ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত ছিটা ফোটা ও বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা ছাড়া এ ক্ষেত্রে কোন সমন্বিত অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতি অংগনের এই শূণ্যতার কারণ উল্লেখ করে পরলোকগত গ্রন্থকার বাবু হর গোপাল দাস কুন্ডু মহাশয় নিম্নরূপ খেদোক্তি প্রকাশ করেন- "দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, অধুনা সেরপুরে সাহিত্যালোচনা সেরূপ নাই এবং গ্রাম বাসিগণের সেদিকে চেষ্টাও দেখা যায় না। কিন্তু তাই বলিয়া আমোদ প্রমোদের কোন ত্রুটি লক্ষিত হয়না। সেরপুরের গ্রামে তিন-চারিটি থিয়েটার পার্টী অপ্রতিহত ভাবে চলিয়া কচি ছেলে গুলিকে জ্যেষ্ঠতাত তত্বে পরিণত করিতেছে ও অনেকেই ধ্যানেশ্বরীর আরাধনায় তন্ময় হইয়া ইহকাল ও পরকালের পথ প্রশস্ত করিয়া রাখিতেছেন। বলিতে লজ্জিত হইতে হয়; সেরপুরের মদের

www.amarboi.org

ভাটিওয়ালা বৎসর ছয় হাজার টাকা গর্ভণমেন্টকে কর দিয়া থাকে। ইহা হইতে অনুমিত হইবে, শেরপুর কিরূপ সুরা স্রোতে প্লাবিত হইয়া ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছে-------।" ১৯৮৩ সালে এখানে একটি প্রেসক্লাব গঠিত হয় এবং এরই রেশ ধরে সাহিত্য চর্চার একটি সংক্ষিপ্ত আসর বসতে শুরু করে। এই আসরটি পরে সাহিত্য চক্র নামে আত্ম প্রকাশ করে। ঘটনাক্রমে সাহিত্য চক্রটি শুরুতেই কয়েকজন প্রতিষ্ঠিত ও অগ্রসর কবি-সাহিত্যিকের সান্নিধ্য ও সহযোগিতা লাভ করে। এঁরা হলেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি সাহিত্যিক জনাব আব্দুল মতীন, বলিষ্ঠ কবি ডাঃ আলহাজ কে. এম. রহমাতুল বারী, স্বভাব কবি জনাব আব্দুর রউফ, বর্ষীয়ান কবি জনাব হোসেন বিন আববাছ, বাবু সদানন্দ লাহিড়ী, জনাব আহমদ আলী, জনাব আজিজুল হক খন্দকার ও অতিথি পৃষ্ঠপোষক জনাব সৈয়দ মনোয়ার হোসেন।

খন্ড সাংবাদিকতা ও লেখা লেখি নিয়ে কিছুটা নাড়া-চাড়া করার সুবাদে আমি নিজেকেও সাহিত্য চক্রটির সাথে শুরু থেকেই সম্পৃক্ত করে রেখে আসছি। এছাড়া ১৯৮৩ সালে গঠিত প্রেসক্লাবটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে আমাকে কম-বেশী দশ বছর দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। বস্তুতঃ শেরপুরের ইতিহাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই প্রথমবাড়ের মত গঠিত প্রেসক্লাব ও সাহত্য চক্রটির অবদান অস্বীকার করা যায় না। শুরুতে যেখানে মাত্র ৩/৪ জন সাংবাদিক নিয়ে গঠিত হয়েছিল, কয়েক বছরের ব্যবধানে সেই প্রেসক্লাবটিতে ১২/১৩ জন সক্রিয় ও বলিষ্ঠ সাংবাদিক সদস্য পদ লাভ করেন। এইভাবে সাহিত্য চক্রটির কল্যাণে ষোল বছরের মধ্যে প্রায় ২৫/২৬ জন সুসাহিত্যিক সৃষ্টি হয়েছেন। এসব সাহিত্য সেবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েক ব্যক্তি স্থানীয় ও জেলা পর্যায়ে পুরুস্কৃত হয়েছেন। সাহিত্য চক্রের বাইরেও কয়েকজন সাহিত্য চর্চাও লেখা লেখিতে অভ্যস্ত আছেন। এদের মধ্যে তরুন লিখেয়ে জনাব শাহ্জামাল সিরাজি একজন। ভবানীপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এই তরুণ লেখক ১৯৮৮ ও ১৯৮৯ সালে ইশারা নামে দু পরস্ত অনিয়মিত পত্রিকা প্রকাশ করেন। এছাড়া শহীদ দিবস স্মরনিকা নামে ১৯৮০ সালে একখানি সাময়িকী প্রকাশ করেন। 'মুক্ত আকাশ' নামে রচিত তার উপন্যাসিক ছোট গল্পটিও প্রকাশিত হয়েছে। শেরপুরের আর একজন বলিষ্ঠ লেখক জনাব অধ্যাপক নূরমোহাম্মদ তালুকদারের রচিত ও প্রকাশিত 'বিবাগীকাল' কাব্যগ্রন্থ খানিও পাঠকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। শেরপুর মহাবিদ্যালয়ের প্রানী-বিদ্যা বিভাগের অধ্যাপক, জনাব আবুল কালাম একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক। তাঁর রচিত বিভাগীয় কয়েকখানি মূল্যবান বহি প্রকাশিত হয়েছে।

www.amarboi.org

সাংবাদিকতা ক্ষেত্রেও শেরপুর এখন আর পিছিয়ে নেই। দক্ষ অভিজ্ঞ প্রবীন সাংবাদিক জনাব মুহঃ আবদুল মতীন, জনাব আমানুল্লা খান ও তার ছোট ভাই আকরাম হোসেন খাঁন ছাড়াও অনেক কয়েক জন তরুণ সাংবাদিক বর্তমানে বিভিন্ন পত্রিকায় দায়িত্বপূর্ণ পদে কর্তব্যরত আছেন। বাবু দীপংকর চক্রবর্তী, জনাব সাইফুলবারী ডাবলু, জনাব অধ্যাপক আজগর আলী, জনাব আব্দুল আলীম, আবু সাঈদ, আব্দুল হামিদ, নিমাই ঘোষ, উজ্জ্বল মালাকার,আব্দুস সাত্তার প্রমুখ উদীয়মান ব্যক্তিগণ, সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত আছেন।

শেরপুরের সাহিত্য অঙ্গনের আর একটি পরিচিত নাম শ্রী মিনতি কুমার রায়। তিনি বগুড়া জেলার গাবতলী থানার কাকড়া গ্রামের অধিবাসী হলেও ষাটের দশক হতে তিনি শেরপুরেই বসবাস করছেন। অধ্যাপাক মিনতি কুমার একজন সফল সাহিত্যিক। সাহিত্য সমালোচনা তত্ব ও মৌলিক ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে তার মূল্যবান প্রবন্ধাদি বিভিন্ন সময় প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার, ক্লাব, পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ

মুসলীম শাসনামলের পর শেরপুরের ব্যক্তিগত পুস্তকালয় ব্যতীত কোন পাঠ চক্রের ব্যবস্থা ছিল বলে জানা যায় না। তবে ঈমায়ী ১৮৭৭ সালের মার্চ মাসে "শেরপুর রিডিং রুম" নামে এখানে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছিল বলে উল্লেখ আছে। উক্ত পাঠাগারটি কখন যে উঠে গিয়েছিল তা জানা যায়নি। অতঃপর ১'৯১০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে টাউন ক্লাব পাবলিক লাইব্রেরী নামে একটি উন্নতমানের পাঠাগার স্থাপিত হয়। পাঠাগারটি পরবর্তী কালে বহু মূল্যবান ও দুর্লভ গ্রন্থ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। একটি শক্তিশালী কমিটি দ্বারা পাঠাগারটি পরিচালিত হয়ে আসছে। টাউন ক্লাব পাবলিক লাইব্রেরীতে এমনও অনেক মহামূল্য দুর্লভ ও প্রাচীন বই পত্র সংগৃহীত হয়েছিল যা গোটা বাংলাদেশের অনেক পুস্তকালয়েই সংরক্ষিত হয়নি। এছাড়া এখানে "দেশ বন্ধু পাঠাগার" ও শেরপুর ডায়ামন্ড জুবিলী উচ্চ বিদ্যালয় গ্রন্থালয়, নামে দুটি পৃথক গ্রন্থ ভান্ডার স্থাপিত হয়। দেশ বন্ধু পাঠাগারের সমস্ত বই পত্র (প্রায় ৫০০ খান) ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে শেরপুরে মহাবিদ্যালয়ের পুস্তকালয়ে দান করা হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা আন্দোলনে পাক হানাদার বাহিনী, টাউন ক্লাব লাইব্রেরী ও শেরপুর মহাবিদ্যালয়টি সম্পূর্ণ রূপে বন্মিভূত করে দেয়। পাক বাহিনীর এ ধ্বংসলীলার ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানের ন্যায় শেরপুরের জ্ঞান

www.amarboi.org

ভান্ডারের যে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে, তা আজও পরিপূরণ করা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতার পর টাউন ক্লাব পাবলিক লাইব্রেরীটি পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অনুরূপভাবে শেরপুরে মহাবিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও পূর্নগঠিত হয়েছে।

প্রাক-স্বাধীনতা আমল হতে আজ পর্যন্ত, শেরপুরে ছোট বড় অনেকগুলি সংঘ ও ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে কারাতে মার্শাল আর্ট, সূর্য ক্লাব, গোল্ড ষ্টার ক্লাব, বিশ্ব সাহিত্য পরিষদ, উষসী সাহিত্য পরিষদ, শেরপুর সাতিত্য চক্র, শেরপুর সাহিত্য সংসদ" দত্ত পাড়ার গীতাঞ্জলী ক্লাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য এতদ্ব্যতীত শেরপুর শহীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসায়, ও একটি সমৃদ্ধ পাঠাগার রয়েছে। সম্প্রতি এখানে শিল্পকলা একাডেমি নামে,সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে। শেরপুরকে বঙ্গভূমির "পুরাতন দিল্লী" বলে আখ্যায়িত করা হয়। বাস্তব প্রস্তাবে প্রাচীনত্বে এটি পুরাতন দিল্লী অপেক্ষা কোন অংশেই কম নয়। পুরাতন দিল্লী যেমন এক সময় সমগ্র ভূ-ভারতের নাভি কেন্দ্র রূপে বিভিন্ন জাতির উত্থান পতন প্রত্যক্ষ করেছে, প্রাচীন শেরপুরও তেমনি বঙ্গভূমির অন্যতম রাজনৈতিক মঞ্চ হিসেবে নানা জাতির রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ সনাক্ত করেছে। পার্থক্য এত টুকু যে দিল্লীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের অনেক কিছুই এখনও অতীতের সাক্ষ্য বহন করছে, কিন্তু শেরপুরের আদি মাটির অনেক প্রাচীন কীর্তিই এখন, লোক চক্ষুর আড়ালে চিরতরে প্রচ্ছাদিত হয়ে পড়েছে। প্রয়োজনের তাগিদে দিল্লীর রাজাদের অনেক কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে, আর শেরপুরের প্রাচীনত্বে হোঁচট খেয়ে কাহিনী কাররা পেছনে হট্‌তে বাধ্য হয়েছেন।

প্রাচীন শেরপুরে কি ছিল আর কি ছিলনা তা বলা কঠিন। একটি রাজধানী শহরে যত কিছু থাকা সম্ভব তার সব গুলোর এখানে উপস্থিত ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু প্রামান্য দলিল অভাবে তার খুঁটি নাটি উপস্থাপন করার আপাততঃ সম্ভব নয়।

প্রাচীন বৌদ্ধযুগে অধুনা ধড়মোকাম গ্রামে গড়ে উঠেছিল এক জমকাল শহর-এক বিশাল রাজধানী। সেই রাজধানীর নাম গন্ধ এখন মিশে গেলেও তার প্রাচীন ঐতিহ্য আজও বিমূর্ত্ত। অতঃপর পোড়া রাজা, জোড়া জোড়া দালান কোঠা নির্মাণ করে, শেরপুরের ঐতিহ্যকে আরও একধাপ এগিয়ে নেন। তিনি খনন করেন নয়নাভিরাম নয়নজুলি, বৃহদাকার সলিলাধার, সুউচ্চ প্রাসাদ মালা, সেনানিবাস, প্রমোদশালা ও হরেক রকম ঘর বাড়ী।

www.amarboi.org

পোড়া রাজার এই রাজধানী অধুনা শেরপুর হতে দুমাইল দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে রাজবাড়ী (মুকন্দ) নামকস্থানে অবস্থিত ছিল। দৈর্ঘে- পূর্বদিকে করতোয়া নদী হতে পশ্চিম দিকে তিন মাইলের মত এবং প্রস্থে উত্তর-দক্ষিণে দু'মাইল বিস্তৃত ছিল এই রাজধানী শহরটি। এর চতুর্দিকে পরিখা বেষ্টিত ছিল। পরিবেষ্টিত স্থানের কোন কোন অংশ আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিখা দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছিল। এই শহর বেষ্টনীর মধ্যে বহু সংখ্যক দীর্ঘিকা, সরোবর, পুষ্করিণী, যথা, কাঁজির পুকুর, অন্দর পুকুর, চন্ডীর পুকুর, তারাই ও মেঘি ইত্যাদি পুকুর খনন করা হয়েছিল। তারাই ও মেঘি পুকুর দুটি তন্মায়ী দুজন দাসী কর্তৃক খনিত হয়েছিল বলে উক্ত নামে অভিহিত হয়ে আস্‌ছে। এখানে অনেক ক'টি স্তূপ পরিলক্ষিত হয়। এর কোন কোনটি শিবালয়, চন্ডীবাড়ী, অন্দর মহল ও বাগান বাড়ী নামে পরিচিত। অন্দর মহলটি নাকি মর্মর নির্মিত ছিল। ইষ্টক প্রোথিত বহু-রাস্তা ঘাট ও ভগ্ন ভিত্তি প্রভৃতি এখন দৃষ্টি গোচর হয়। কথিত রাজধানীকে সকলেই বল্লাল সেনের রাজবাড়ী বলে অভিহিত করে থকেন।

ভবানীপুর হতে শেরপুর পর্যন্ত নয়মাইল স্থান, পূর্বকালে বল্লাল সেনও তদ্বংশীয় দিগের লীলা ক্ষেত্র ছিল বলে অনুমান করা হয়। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে এ স্থানের সহিত সেন বংশের উল্লেখ দেখা যায়।

"আস্তে সেরপুরে হদ্যাপি সেন বংশ নিদর্শণং

পুরাতন পুরীস্থান করতোয়া নদী তটে""

ভবানীপুর কাহিনী রচয়িতা বাবু তারিনী চরণ ঠাকুর মহাশয় এই স্থান কে কমলাপুর নামে অভিহিত করেন। পূর্ব দিকে করতোয়া হতে পশ্চিমে আত্রেয়ী নদী পর্যন্ত এলাকা পূর্বকালে কমলাপুরাধিপতির রাজ্য ভুক্ত ছিল বলে জানা যায়। বল্লাল সেন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজধানীটি পরবর্তীকালে তার বংশোদ্ভব রাজা অচ্যুত সেনের হস্তগত হয়। গৌড়ের সিংহাসনে এই সময় নাসির উদ্দিন শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি নামে মাত্র দিল্লী সরকারের অধীন হলেও কার্যতঃ তিনি ছিলেন স্বাধীন। দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে এই সময় দাস, খাল্‌জি ও ত্মগলক বংশে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা চল্‌ছিল এবং এই সুযোগে ফিরোজ শাহ আপন প্রতি পত্তি অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

www.amarboi.org

ফিরোজ শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহ্ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করেন এবং বর্ণিত কমলাপুর বিজয়কল্পে এক মহা অভিযান পরিচালনা করেন কিন্তু যুদ্ধে তাকে পরাস্ত বরণ করতে হয়। এই শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি মোচন কল্পে বাহাদুর শাহ, দ্বিতীয়বার রণ-সম্ভার সহ কমলাপুর আক্রমণ করেন এবং রাজা অচ্যুত সেনসহ তার জামাতা সুনীল প্রতাপ ও প্রধান সেনাপতিকে নিহত করে যুদ্ধে জয়যুক্ত হন। এ যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে সেন বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সেন বংশের পতনের পর মুস্‌লীম আমলে শেরপুর ও কমলাপুর নবগৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। মুসলমানগণ কর্ম কেন্দ্র কমলাপুর হতে শেরপুরে স্থানান্তরিত করেন। শাসন কার্যের সুবিধার্থে এখানে তখন হতে বিভিন্ন দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। মুঘল আমলের শেষার্দ্ধে বংঙভূমির এ অঞ্চলে অনেকগুলো ছোট বড় নবাব প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নবাবগণ নিজ নিজ এলাকার সমৃদ্ধি বৃদ্ধি কল্পে শিল্প কারখানা ও অফিস আদালত স্থাপন করেন। সম্রাট আকবরের আমলে এ অঞ্চলের নবাব ছিলেন মির্যা মূরাদ খান কাকশাল। তিনি টোলা মহল্লায় বিভিন্ন প্রকার প্রাসাদ, মস্‌জিদ ও দরগাহ নির্মাণ করেন। অধুনা হামছায়াপুর তখন পাঠানঠোলা নামে পরিচিত ছিল এবং এখানে একটি তহসীল কাছারী স্থাপন করা হয়েছিল।

ইংরেজ আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এখানে নবাবী প্রথাই প্রবর্ত্তিত ছিল। পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ বেনিয়া গোষ্ঠী যখন এদেশের দণ্ড মুন্ডের সর্বময় কর্তা বনে যায়, তখন হতে শেরপুরের পূর্ব গৌরব ক্রমান্বয়ে ম্লান ও বিলুপ্ত হতে থাকে। এ আমলে শেরপুরে একটি নীল কুঠি স্থাপন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য আর কোন দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। জমিদারী আমলে রাজস্ব আদায় দপ্তর ছাড়া এখানে কোন সরকারী কার্যালয় ছিল বলে জানা যায়নি। অতঃপর কি এক কারণে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এখানে সর্বপ্রথম একটি পৌরসভা স্থাপিত হয়। তদানীন্তন বঙ্গ দেশের জেলা শহরের পাশা পাশি শেরপুর কেও একটি পৃথক পৌরসভায় উন্নীতকরণ, মোটেই কোন তুচ্ছ ব্যাপার ছিল না। কারণটি অজ্ঞাত থাকলেও সহজেই অনুমেয় যে, বগুড়া কে আনুষ্ঠানিক জেলা ঘোষণার পূর্ব পর্যন্ত ঐতিহ্য ও প্রকৃতগত ভাবেই শেরপুর ছিল এক সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য স্থান।

www.amarboi.org

তাই ঐতিহ্যময় এস্থানটির গুরুত্বকে অতিক্রম করতে অপরাগ হয়েই, বাধ্য হয়ে জেলা শহরের পাশা পাশি এখানেও পৌর সভা ঘোষণা করতে হয়েছিল। এই পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন জনৈক ম্যাজেস্ট্রেট এবং সদস্য সংখ্যা ছিল মোট বার জন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সদস্য নির্বাচন কল্পে সর্ব প্রথম ইলেকশন প্রথা প্রবর্তিত হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এ পৌরসভার সর্বমোট আয়ছিল ২৮২ পাউন্ড ৪ শিলিং মাত্র। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিল তারিখের হিসাব নিকাশ অনুযায়ী অত্র পৌরসভার খরচ বাদে স্থিতি ছিল ১১৫ পাউন্ড '১২ শিলিং মাত্র।

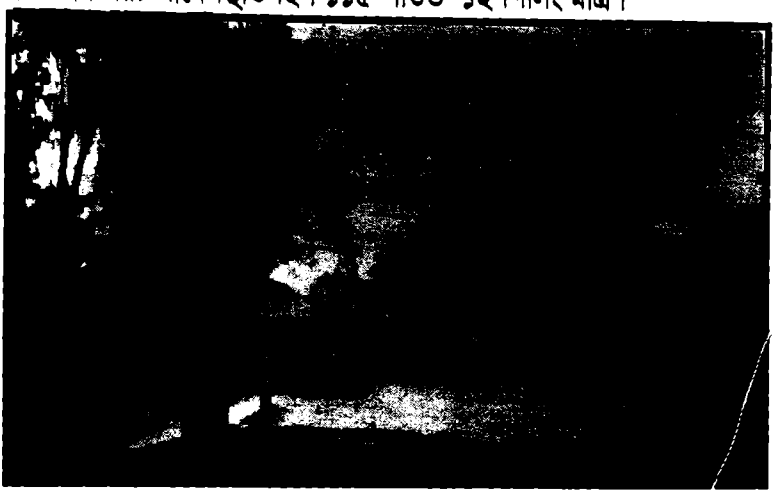

ঐতিহ্যবাহী শেরপুর পৌরসভার মহাসড়ক ধরে প্রবেশ পথ (উত্তর প্রান্ত)

খরচের জায়ঃ- পুলিশের নিমিত্ত ১০২ পাউন্ড ০২ শিলিং মাত্র, কনসার ভেমুসি কাজের নিমিত্ত ৭৫ পাউন্ড ০২ শিলিং মাত্র। এবং অন্যান্য ব্যয়ের অধিকাংশই জংগল পরিকার করার জন্য ব্যয়িত হয়েছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের সর্বমোট আয় ছিল ৮৫২১ টাকা। কর দাতার সংখ্যা ছিল ১১১০ জন এবং গৃহ সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এখানকার লোক সংখ্যা ছিল মোট ৪১০৪ জন তন্মধ্যে পুরুস ২২১৯ ও স্ত্রী লোক ১৮৮৫ জন।

শেরপুর পৌরসভায় প্রতিষ্ঠা লগ্ন হতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাঁরা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাদের নাম ও মেয়াদ কাল নিম্নরুপঃ

www.amarboi.org

১	বগুড়া ম্যাজিষ্ট্রেটগণ	২৭/২/৭৬ হতে	২১/৫/৮৫ পর্যন্ত
২	সারদা চন্দ্র মজুমদার	২২/৫/৮৫ ,,	০৪/৬/৮৫ ,,
৩	রাধা রমণ মুনসী	৫/৬/৮৫ ,,	১০/৭/৮৫ ,,
৪	যজ্ঞেশ্বর কুন্ডু	১১/৭/৮৫ ,,	৬/০১/৮৬ ,,
৫	মহেশ নারায়ন মুনসী	০৭/০১/৮৬ ,,	২৭/৭/৮৬ ,,
৬	কালী কিশোর মুনসী	২৮/৭/৮৬ ,,	৫/০৬/৯২ ,,
৭	ব্রজনাথ সান্ন্যাল	০৬/০৬/৯২ ,,	১৪/০২/৯৪ ,,
৮	কালী কিশোর মুনসী (দ্বিতীয়বার)	১৫/০২/৯৪ ,,	০৭/০৫/১৯০০,,
৯	হেমচন্দ্র সান্ন্যাল	০৮/৫/১৯০০ ,,	১৫/৪/১৯০১ ,,
১০	কেদার নাথ বাগচি	১৬/৪/১৯০১ ,,	০১/০৩/১৯০২ ,,
১১	সারদা চন্দ্র মজুমদার	০২/০৩/১৯০২ ,,	১৫/৫/১৯০৩ ,,
১২	প্রমথনাথ মুনসী	১৬/৫/১৯০৩ ,,	২১/১০/১৯০৬ ,,
১৩	হেমচন্দ্র সান্ন্যাল (দ্বিতীয়বার)	২২/১০/১৯০৬ ,,	-

ভাইস চেয়ারম্যানগণ

১	রাধা রমন মুনসী	২৭-২-৭৬ হতে	২৮/৪/৮৩ পর্যন্ত
২	মহেশ নারায়ন মুনসী	২৯-৪-৮৩ ,,	২৫/৪/৮৪ ,,
৩	ভৈরবচন্দ্র মৈত্র	২৬-৪-৮৪ ,,	২২/৬/৮৫ ,,
৪	ব্রজনাথ সান্ন্যাল	২৬-৬-৮৫ ,,	২৫/৪/৯২ ,,
৫	যজ্ঞেশ্বর কুন্ডু	২৬-৪-৯২ ,,	১৩/২/৯৪ ,,
৬	ভবানী নাথ চক্রবর্ত্তী	১৪-২-৯৪ ,,	২৪/৮/৯৪ ,,
৭	কিশোরী মোহন মৈত্র	২৫-৮-৯৫ ,,	২৪/২/৯৯ ,,
৮	হরিশচন্দ্র সান্ন্যাল	২৫/২/৯৯ ,,	২৩/৭/১৯০০ ,,
৯	যজ্ঞেশ্বর কুন্ডু (দ্বিতীয়বার)	২৪-৭০১৯০০ ,,	১৫/৫/১৯০৩ ,,
১০	মৌলভী কুরবান উল্লা	১৬-৫-১৯০৩	১৯/৯/১৯০৫ ,,
১১	দুর্গা মোহন সাহা	২০-৯-১৯০৫ ,,	২১/১০/১৯০৬ ,,
১২	গোলকেশ্বর অধিকারী	২২-১০-১৯০৬ ,,	১৯০৯
১৩	সুরেন্দ্র মোহন মৈত্র		

www.amarboi.org

শেরপুর থানার ইউনিয়ন পরিষদ পরিসংখ্যান

জাতীয় সরকারের পাশা পাশি স্থানীয় সরকারের অবস্থান অর্থবহ হলেও ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কিন্তু আমাদের দেশে এটির কোন অস্তিত্ব ছিল না। প্রশাসনিক অবকাঠামোর বিকেন্দ্রী করণের লক্ষ্যে তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের ভারতের বড়লাট লর্ড রিপন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে স্থানীয় সরকার প্রবর্তন করেন। পরে ১৮৮৫ সালে সর্বপ্রথম বঙ্গীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন আইন পাশ হয়। এ, আইন বলে ত্রি স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার প্রবর্তনের বিধান চালু হয়। গ্রাম পর্যায়ে ছিল ইউনিয়ন কমিটি, মহকুমা পর্যায়ে লোকাল বোর্ড এবং জেলা পর্যায়ে গঠিত হয় জেলা বোর্ড। এ বিধি বিধানে স্থানীয় সরকার গুলোকে পরিচালনার জন্য জন প্রতিনিধিত্বের বিধান ছিল। তখন ১০ হতে ১৫ বর্গ মাইল এলাকা নিয়ে এক একটি ইউনিয়ন কমিটি গঠিত হতো। ৫ হতে ৯ সদস্যের সমষ্টি তে ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হতো। সে সময় গ্রামাঞ্চলের রাস্তা ঘাট নির্মাণ, শিক্ষা বিস্তার, চিকিৎসা সেবা, জন্ম-মৃত্যু হার রেজিষ্ট্রি করণ, পানি নিষ্কাশন প্রভৃতি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় ইউনিয়ন কমিটি গুলোর উপর। এ সব উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্যে জেলা বোর্ড ও সরকার হতে সামাণ্য অর্থ অনুদান রূপে বরাদ্দ করা হতো। এ ব্যবস্থা ১৯১৯ পর্যন্ত চালু থাকে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের চৌকাদারী আইনও ১৮৮৫ সালের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন আইন দুটি বিলোপ করে ১৯১৯ সালের বঙ্গীয় পল্লী স্বায়ত্ব শাসন আইন প্রবর্তন করা হয়। এ বিধান বলে পঞ্চায়েত ও ইউনিয়ন কমিটি একীভূত করে ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। আর ইউনিয়ন বোর্ডগুলির প্রতিনিধিদের কার্যকালের মেয়াদ ছিল ৩ বছর। ১৯৩৬ সালে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিদের মেয়াদ কাল ৪ বছর স্থায়ী করা হয়। এ সময় ইউনিয়ন বোর্ডের ৬ জন সদস্য জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হতেন। তবে ভোটদানের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ধরণের। নির্বাচন কর্মকর্তার সামনে দাঁড়িয়ে ভোটারগণ, তাদের নিজ নিজ পছন্দ মাফিক ব্যক্তিকে মৌখিক ভাবে ভোট দিতেন। ৩জন সদস্যকে সরকার মনোনয়ন দিতেন। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের মধ্য হতে ভোটের মাধ্যমে একজন প্রেসিডেন্ট ও একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতেন। ১৯৪৬ সালে, সরকার ইউনিয়নবোর্ডের সদস্য মনোনয়ন বাতিল করে দেন। তবে ১৯৩৬ হতে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত মোট ৪ বার ভোটারদের মৌখিক ভোটের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ দুটি তৎকালে খুবই সম্মানজনক ছিল। এ সময় তহবীল গঠনের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন করার জন্য করারোপের ক্ষমতা ইউনিয়ন সমূহকে অর্পণ করা হয়। ১৯৫৭ সালে প্রথম গোপন ভোটের মাধ্যমে মাধ্যমে একজন প্রেসিডেন্ট, একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও তিনটি ওয়ার্ড হতে তিন জন সদস্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়।

www.amarboi.org

একবছর পর আইয়ুব খাঁন কর্তৃক সামরিক আইন জারির পর, দেশের সকল ইউনিয়ন বোর্ডের কমিটি ভেংগে দেয়া হয়। একজন সরকারী কর্মকর্তার উপর বোর্ড চালনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত সিলেট জেলাতে কোন ইউনিয়ন বোর্ড প্রথা ছিল না। পরিবর্তে সেখানে ছিল সার পঞ্চ ব্যবস্থা। আর পার্বত্য চট্টগ্রামেও স্থানীয় সরকার ছিল না। ১৯৫৯ সালে এক সামরিক ফরমান জারি করে বহুল সমালোচিত মৌলিক গণতন্ত্র বা বেসিক ডেমোক্রেসি (Basic democracy) ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ ব্যবস্থাপনায়, গ্রাম পর্যায়ে ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে ৪ স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। গড়ে ১০ হাজার লোক বসতি এলাকা নিয়ে নতুন করে ইউনিয়ন কাউন্সিল গুলো পুণর্গঠন করা হয়। আর ১০ হতে ১৫ জন সদস্য সমন্বয়ে ইউনিয়ন কাউনসিল গুলির কমিটি গঠনের আইন করা হয়। ইউনিয়ন কাউনসিলগুলির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ সদস্য সরকার মনোনয়ন দিতেন। নির্বাচিত ও মনোনীত সদস্যদের ভোটের মাধ্যমে, তাদের মধ্য হতে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচনের আইন করা হয়। জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রেসিডেন্ট ও জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য নির্বাচনের অধিকার হরণ করে ইউনিয়ন কাউনসিলের বি.ডি মেম্বরদের ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয। ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয়বার এ ব্যবস্থায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৯ সালে গণঅভ্যুত্থানের শুরু হলে বিডি মেম্বর গণ গণরোষের শিকার হন। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে প্রেসিডেন্টের এক আদেশ বলে মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। তখন ইউনিয়ন পরিষদ, জেলা পরিষদ ও থানা উন্নয়ন পরিষদ কমিটি গঠন করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ গুলির দায়িত্ব অর্পিত হয় একজন সরকারী কর্মচারীর উপর। ১৯৭৩ সালে ইউনিয়ন পরিষদ গুলোকে তিনটি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রতি ওয়ার্ড হতে ৩ জন মেম্বর এবং একজন চেয়ারম্যান ও একজন ভাইস-চেয়ারম্যান গোটা ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচনের বিধান করা হয়। ১৯৭৬ সালের নির্বাচনে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ বিলোপ করা হয। তবে সরকার কর্তৃক একজন কৃষক প্রতিনিধি ও ২ জন মহিলা প্রতিনিধি মনোনয়ন দানের ব্যবস্থা করা হয। এ সময় হতে চেয়ারম্যান ও মেম্বরদের মাসিক ভাতা প্রবর্তন করা হয়। এ ভাতার অর্দ্ধেক সরকার ও অর্দ্ধেক ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব আয় হতে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৯ সাল হতে ইউঃপিঃ গুলোকে বহুবিধ ক্ষমতা দেয়া হয। আয়ূব খানের আমলে বোর্ড মেম্বরদের মাধ্যমে ওয়ার্কস প্রোগ্রামের কাজ করানো হতো।

www.amarboi.org

১৯৭৬ সালে গ্রাম্য আদালত অধ্যাদেশ বলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেম্বরগণ ছোট খাট ফৌজদারী অপরাধের বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন। কাজের বিনিময়ে খাদ্য, টেষ্ট রিলিফ ও পল্লী পূর্ত কর্মসূচীর বিপুল পরিমাণ গম ও অর্থ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ব্যয়িত হয়ে থাকে।

১৯৯৭ সালের নির্বাচনে সমগ্র ইউনিয়নকে ৯টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতি ওয়ার্ড হতেএকজন করে মেম্বর নির্বাচিত হচ্ছেন। তাছাড়া এবারই প্রথম জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে প্রতি ইউনিয়নে ৩ জন মহিলা মেম্বর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। গ্রাম পরিষদ আইন রাখা হয়েছে। এ আইন বলে প্রতি গ্রামে একটি করে গ্রাম পরিষদ থাকবে। আর এটিই হবে স্থানীয় সরকারের সর্ব নিম্নস্তর।

অত্র থানার ৯টি ইউনিয়নের জনসংখ্যা ভিত্তিক বিবরণ ও পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ-

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	মৌজার সংখ্যা	গ্রামের সংখ্যা	পুরুষ	মহিলা	মোট
১	কুসুম্বী	৩৫	৩৯	১১,৩৯১ জন	১১,১০৫ জন	২২,৪৯৬ জন
২	গাড়ীদহ	২৩	৩০	১৪,৭৮৬ ,,	১৪,১৫৪ ,,	২৮,৯৪০ ,,
৩	খামারকান্দি	৫	১২	৯,১২৭ ,,	৯০১৮ ,,	১৮,১৪৫ ,,
৪	খানপুর	১০	২৮	১২,৩০৫ ,,	১১,৮২৬ ,,	২৪,১৩১ ,,
৫	মির্জাপুর	৩৬	৫৪	১৭,৬৭৯ ,,	১৭,১৯৭ ,,	৩৪,৮৭৬ ,,
৬	বিশালপুর	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
৭	ভবানীপুর	[illegible]	[illegible]	৯,৮৪৯ ,,	৯,৩৩৬ ,,	১৯,১৮৫ ,,
৮	সুঘাট	[illegible]	[illegible]	১১,৩৩৪ ,,	১১,১৫৫ ,,	২২,৪৮৯ ,,
৯	সীমাবাড়ী	[illegible]	[illegible]	১০,৪৭৯ ,,	৯,৭৭৪ ,,	২০,২৫৩ ,,
	ওয়ার্ড নং- ১			২,৫২২ ,,	২,৩৫৯ ,,	৪,৮৮১ ,,
	ওয়ার্ড নং- ২			২,৭৭৮ ,,	২,৬৮৭ ,,	৫,৪৬৫ ,,
	ওয়ার্ড নং- ৩			৩,০২০	২,৭৯২	৫,৮১২ ,,
		১১৪	৩১০	১,১৬,৫৪৫	১,১২,৪৬০	২,২৯,০০৫ ,,

অত্র থানার মোট আয়তন ১১৪.৩১ বর্গমাইল।

অত্র থানার মোট আয়তন ২৯৬.২৭ বর্গকিলোমিটার।

অত্র থানার মোট জমির পরিমাণ [illegible] একর।

অত্র থানার মোট আবাদী জমির পরিমাণ ৫৮,৫৮০ একর।

www.amarboi.org

শেরপুরে এককালে একটি বেঞ্চ কোর্ট ছিল। তখন ছোট খাট মোকদ্দমা এখানে নিষ্পত্তি হতো। বিগত ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এখানে অনুরূপ একটি থানা ম্যাজিষ্ট্রেসি প্রবর্তিত হয়। জনৈক গিয়াসউদ্দিন পাঠান উক্ত কোর্টের হাকিম নিযুক্ত হন। কিন্তু পরবর্তীতে উহা রহিত করে দেয়া হয়েছে। অবশ্য প্রেসিডেন্ট হোসাইন মোহাম্মাদ এরশাদের শাসনামলে উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তিত করা হলে পুনরায় উপজেলা

আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল কিন্তু ১৯৯১ সালের নির্বাচনে এরশাদ সরকারের পতনের পর উপজেলা আদালত পদ্ধতিবিলোপ করা হয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এখানে একটি রেজিষ্টারী অফিস স্থাপিত হয়। জনৈক মওলভী কুরবান উল্লাহ উক্ত দপ্তরের প্রথম কর্মকর্তা নিযুক্ত হন। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে এখানে একটি সরকারী ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিক ভাবে ডাক্তার খানাটি মেটো ছিল কিন্তু পরে উহা পাকা ঘরে রূপান্তরিতে হয়। বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভের পর থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র স্থাপিত হলে ডাক্তারখানাটি রহিত হয়ে যায়।

শেরপুরে একটি সাব ডাকঘর রয়েছে। পূর্বে পোষ্ট মাষ্টারই যাবতীয় কার্য পরিচালনা করতেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী হতে ২০ টাকা বেতনের একজন কেরানী নিযুক্ত করা হয়। তৎকালে শেরপুরের ডাকঘরের অধীন তিনটি শাখা অফিস ছিল যথা- ধনুট, এলাংগী, ও কল্যাণী। পরবর্তীতে ধনুট শাখা [illegible] সাব অফিসে উন্নীত হয়। শেরপুরে বর্তমানে আর একটি শাখা অফিস [illegible]। তাছাড়া [illegible] ক্রোমা, ছোনকা, মির্জাপুর, ভবানীপুর, গাড়ীদহ [illegible] স্থাপিত হয়েছে।

কিছু কাল পূর্বেও শেরপুর দাক্ষিণ বগুড়ার প্রধান থানা রূপে বিবেচিত হতো। এবং ধনুট আউট পোষ্ট তখন শেরপুর থানার অধীনে ছিল। অনেক দিন পূর্বেই ধনুট পূর্ণাংগ থানায় উন্নীত হয়েছে। বিগত ১৯৫৯ সালে শেরপুরে সার্কেল অফিসার নিয়োজিত হন। পরবর্তীতে উক্ত দপ্তর সম্প্রসারিত হলে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন), থানা কৃষি অফিসার,থানা শিক্ষা অফিস, কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি, পরিবার পরিকল্পনা অফিস, কৃষি উন্নয়ন সংস্থা, থানা পশু পালন, জল সেচ প্রভৃতি বিভাগ থানা কাউন্সিলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এছাড়া এখানে পানি উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ সরবরাহ (WAPDA) শাখা, সরকারী বন বিভাগ, পোনা মৎস্য উৎপন্ন খামার, রাজস্ব অফিস, পিডিবি, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, গবাদি পশু পালন ও দুগ্ধ খামার প্রতিষ্টিত হয়। শেরপুরে একটি ডাক বাংলো রয়েছে। স্থানীয় উদ্যোক্তা আবুল কালাম মোঃসাইফুল ইসলাম প্রথমে দি কমার্সিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন এবং পরে ১৯৯৩ সালে উহা শেরপুর বহুভাষী সাটলিপি প্রশিক্ষণ

একাডেমী নামে পরিবর্তীত হয়ে পরিচালিত হয়ে আসছে। একই ভাবে এখানে মহিপুর নামক স্থানে একটি কৃষি ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট খোলা হয়েছে।

শেরপুর হতে রাজধানী মহানগরী ঢাকা ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিদ্যমান। শেরপুর শহর হতে থানার কয়েকটি ইউনিয়নও কতিপয় গ্রামের যাতায়াত ব্যবস্থা মোটামুটি ভাল। এ থানার মোট পাকা রাস্তা ৫৫ কিলোমিটার এবং আধা পাকা ৩৫ কিঃ মিঃ। অপর দিকে কাঁচা রাস্তা রয়েছে ৫৬০ কিঃ মিঃ। নদীর সংখ্যা দুটি এবং ডাকঘর দশটি। হাট ১৯টি এবং বাজার সংখ্যা ৯টি। সিনেমা হল ৩ এবং ব্যাংকের সংখ্যা ১০টি, গ্রামীন ব্যাংক ৩ এবং নিবন্ধনকৃত ক্লাবের সংখ্যা ২৬টি। মন্দির ৫০টি, মস্‌জিদ চারশতাধিক। গভীর নলকূপ ৯টি এবং অগভীর নলকূপ ৩৯০১টি। শক্তি চালিত পাম্প ১৫০টি এবং জ্বালানী তেল সরবরাহকারী পাম্প ৩টি, ক্ষুদ্র শিল্প সংখ্যা ৫৬২টি ভারী, শিল্পের মধ্যে একমাত্র হিমাগারটি অন্যতম। ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থানঃ প্রাচীন খেরুয়া জামে মসজিদ, হযরত শাহ তুর্কানের সির মোকামও ধড় মোকাম সমাধি। প্রাচীন টোলা জামে মসজিদ, বিবির মসজিদ, জামুর বৌদ্ধ ধাপ, রাজবাড়ী মুকুন্দের মহাসরোবর, বাঘড়া দিঘী, দেবী ভবানীর মন্দির। দর্শনীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান- পল্লী উন্নয়ন একাডেমী। স্বাস্থ্য রক্ষা ব্যবস্থাঃ থানা স্বাস্থ্য কম্পেক্স-১, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৬টি , পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক ১০টি, ব্যক্তিগত ক্লিনিক ১টি, চক্ষু চিকিৎসালয়-১টি, (ডেনিস এন জিও পরিচালিত) টি,এন,টি এর পাশাপাশি বর্তমানে BRTS টেলি সার্ভিস আরম্ভ করেছে। এখানে ব্যক্তিগত ভাবে Fax Phone খোলা হয়েছে।

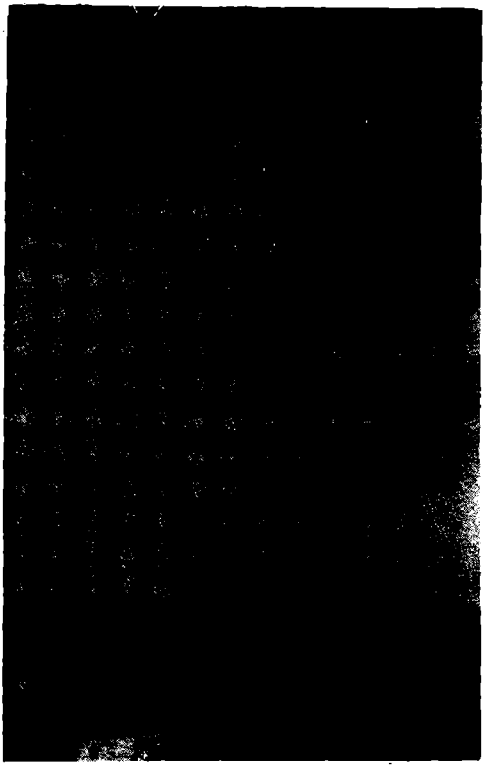

টেলিযোগাযোগ এর উন্নতির স্বাক্ষর, বি,আর,টি এ'র সুউচ্চ টাওয়ার

www.amarboi.org

শেরপুর থানা ইউনিয়ন ভুক্ত গ্রাম সমূহের তালিকা-
ইউনিয়ন-কুসুম্বী-০১

ওয়াড নং	ক্রমিক নং	গ্রামের নাম
০১	১।	তাঁতড়া
	২।	পাকুড়িয়াপাড়া
	৩।	উদয়কুড়ি
	৪।	উচল বাড়িয়া
	৫।	বাঁশ বাড়িয়া
০২	৬।	চন্ডেশ্বর
	৭।	পান্ডুয়া
	৮।	মালিয়াটা
	৯।	আকরামপুর
০৩	১০।	উত্তর পেঁচুল
	১১।	খিকিন্দা
	১২।	কুশা বাড়ী
০৪	১৩।	চকসিংড়া
	১৪।	কাশিপাড়া
	১৫।	কুসুম্বী
	১৬।	লক্ষীকোলা
	১৭।	চৌতন বাড়ী
	১৮।	মাদলবাড়ী লক্ষীকোলা
	১৯।	সেনপাড়া
০৫	২০।	দারুগ্রাম
	২১।	বেলঘড়িয়া
	২২।	মাদল বাড়িয়া
০৬	২৩।	বংশধর
	২৪।	খুরতা
	২৫।	দক্ষিণ জামুর
	২৬।	আদম জামুর
	২৭।	মধ্য জামুর
	২৮।	নামা জামুর
০৭	২৯।	কেল্লা
	৩০।	টুনিপাড়া
	৩১।	তাজপুর
	৩২।	গোঁসাই বাড়ী
০৮	৩৩।	বাঘড়া কলোনী
	৩৪।	বাঘড়া বসতি
	৩৫।	দাড়কি পাড়া
০৯	৩৬।	বানিয়া গন্দইল
	৩৭।	পোষি
	৩৮।	উত্তর আমইন
	৩৯।	দক্ষিণ আমইন
	৪০।	পোড়াপাড়া

www.amarboi.org

গাড়ীদহ ইউনিয়ন-০২

ওয়ার্ড নং	ক্রমিক নং	গ্রামের নাম
০১	১।	রামনগর
	২।	গাড়ীদহ
	৩।	কলতা পাড়া
	৪।	দড়িপাড়া
	৫।	মাশুর গাড়ী
	৬।	হাট গাড়ী
	৭।	আর.ডি.এ.
০২	৮।	হাপুনিয়া
	৯।	হাপুনিয়া কলোনী
	১০।	বন মরিচা
	১১।	গিলা বাড়ী
০৩।	১২।	মৌমিনপুর
	১৩।	হাজিপুর
	১৪।	জোয়ান পুর
	১৫।	মহিপুর
	১৬।	মহিপুর কলোনী
০৪	১৭।	কানুপুর
	১৮।	বোংগা
০৫	১৯।	বাংড়া
	২০।	দড়িপাড়া
	২১।	কালশি মাটি
০৬	২২।	শিবপুর
	২৩।	রামেশ্বর পুর
০৭	২৪।	চন্ডিযান
	২৫।	দামুয়া
	২৬।	রাণী নগর
	২৭।	চক পাথালিয়া
০৮	২৮।	ফুলবাড়ি
	২৯।	জয়নগর
০৯	৩০।	কাফুরা
	৩১।	রন-বীরবালা

খামার কান্দি ইউনিয়ন-০৩

ওয়ার্ড নং	ক্রমিক নং	গ্রামের নাম
০১	১।	পার ভবানীপুর পশ্চিম পাড়া
০২	২।	পার ভবানীপুর পূর্বপাড়া (জগন্নাথ পাড়া সহ)
০৩	৩।	ঘোড় দৌড়
০৪	৪।	খামার কান্দি পশ্চিমপাড়া ও উত্তর পাড়া (ইউনিয়ন পরিষদ এলাকা)
০৫	৫।	খামার কান্দি দক্ষিণ পাড়া ও পূর্বপাড়া এবং দহপাড়া
০৬	৬।	মাগুড়ার তাইড় খোকসা পাড়া
০৭	৭।	ঝাজড়
০৮	৮।	বিল নোথার
	৯।	দল্ ডিংগী
	১০।	বোয়ালমারি
	১১।	ভাতাড়িয়া
	১২।	বেড়েরবাড়ি
০৯	১।	শুভগাছা
	২।	হোসনাবাদ

www.amarboi.org

খানপুর ইউনিয়ন -০৪

ওয়ার্ড নং	ক্রমিক নং	গ্রামের নাম
০১	১	গজারিয়া
	২	বড়ইতলি
০২	৩	সালফা
	৪	শুবলী
	৫	পান্তাপাড়া
	৬	সানালজানি
০৩	৭	গোপাল পুর
	৮	চাঁদপুর
	৯	তাল পুকুরিয়া
০৪	১০	ভাটরা
	১১	ভীমজানি
০৫	১২	খাগা
	১৩	ভাণ্ডার কাফুরা
০৬	১৪	দড়ি খাগা
	১৫	চক খাগা
	১৬	ছাতিয়ানী
০৭	১৭	খানপুর
	১৮	দহপাড়া
	১৯	চক খানপুর
০৮	২০	নল বাড়িয়া
	২১	শৈল্যা পাড়া
	২২	দশ সিকাপাড়া
০৯	২৩	বোয়ালি কান্দি
	২৪	চৌবাড়িয়া

মির্জাপুর ইউনিয়ন-০৫

ওয়ার্ড নং	ক্রমিক নং	গ্রামের নাম
০১	১	তালতা
	২	শেলবরিশ
	৩	যাতাপাড়া
	৪	শংকর হাটা
	৫	মাথাইল চাপড়
০২	৬	ভাদাইল পাড়া
	৭	বীরগ্রাম
	৮	খোত্তা পাড়া
	৯	কদিমুকুন্দ
	১০	সুখানগাড়ী
	১১	উচরং
	১২	আয়ড়া
	১৩	বেলতা
	১৪	শ্যামপুর
	১৫	বাঘমারা
	১৬	বিল চাকলা
	১৭	আড়ংশাইল
০৩	১৮	চক আড়ংশাইল
	১৯	রাম চরম মুকুন্দ
	২০	চক আন্দি
	২১	মাকড়কোলা
	২২	রাজবাড়ী
	২৩	মামুর শাহী
০৪	২৪	সাধুবাড়ী
	২৫	খন্দকার টোলা
	২৬	চক পোতা

www.amarboi.org

০৫	২৭।	সেরুয়া
	২৮।	হামছায়াপুরপাঠান টোলা
	২৯।	আন্দিকুমড়া
	৩০।	ফুলতলা
০৬	৩১।	ঘোলা গাড়ি
	৩২।	ঘোলাগাড়ি কলোনী
	৩৩।	চক মুকুন্দ
	৩৪।	হাতিগাড়া
	৩৫।	দড়ি মুকুন্দ
	৩৬।	কানাই কান্দর
	৩৭।	চক দেউলী
	৩৮।	লোদা পাড়া
	৩৯।	কৃষ্ণপুর
	৪০।	কৃষ্ণপুর কলোনী ধড় মোকাম
০৭	৪১।	মদন পুর
	৪২।	চক মদনপুর
	৪৩।	কুনি ঘাট
	৪৪।	কাশিয়াবালা
০৮	৪৫।	মির্জাপুর
	৪৬।	রাজাপুর
	৪৭।	জাবর গাড়ি
০৯	৪৮।	বিরইল
	৪৯।	ভাদড়া
	৫০।	মাগুর গাড়ি
	৫১।	সাগর পুর

বিশাল পুর ইউনিয়ন -০৬

ওয়ার্ড নং	ক্রমিক নং	গ্রামের নাম
০১	১।	দুবলাই
	২।	দোয়াল সারা
	৩।	তেতুলিয়া
	৪।	পানিসারা
	৫।	হিন্দু পানিসারা
	৬।	নতূন পানিসারা
০২	৭।	জামাইল
	৮।	বড়পুকুরিয়া
	৯।	নান্দুয়া
	১০।	ভাদাড়
	১১।	মান্দাইল
	১২।	পেঁচুল
০৩	১৩।	চাটাইল
	১৪।	সিংড়া পাড়া
	১৫।	শাহা নগর
	১৬।	মানিক চাপড়
	১৭।	চরকুটা
	১৮।	ভাদাই কুড়ি
০৪	১৯।	ভায়ড়া
	২০।	পালাশন
	২১।	শ্যামনগর
	২২।	কহিত কুল
	২৩।	বিশদ পাড়া
	২৪।	বামী হালি
০৫	২৫।	বিশাল পুর
	২৬।	কলোনী পাড়া
	২৭।	সাগর পাড়া
	২৮।	করিম পুর
	২৯।	কামাল খাঁ
	৩০।	নায়ের পাড়া

www.amarboi.org

	৩১।	ফাগুড়া গাড়ি
০৬	৩২।	বিরাকৈড়
	৩৩।	পশ্চিম নাইশিমুল
	৩৪।	নাইশিমুল
	৩৫।	শরিফপুর
	৩৬।	গোয়াল বিশ্বা
০৭	৩৭।	কচুয়া পাড়া
	৩৮।	রণী হালি
	৩৯।	ঘোল ঘরিয়া
	৪০।	মুকুন্দপুর
	৪১।	সিমলা
	৪২।	সাত বাড়িয়া
	৪৩।	সগুনিয়া
	৪৪।	বেওড়া পাড়া
	৪৫।	সিরাজ নগর
	৪৬।	হাসাগাড়ি
	৪৭।	নয়লাপাড়া
০৯	৪৮।	তে ঘড়ি
	৪৯।	উদ গ্রাম
	৫০।	আম বাড়িয়া
	৫১।	ঝুপুনিয়া
	৫২।	পাঁচ দেউলী
	৫৩।	ঠেংগার গাতি
	৫৪।	লোকনাথ

ভবানীপুর ইউনিয়ন-০৭

ওয়ার্ড নং	ক্রমিক নং	গ্রামের নাম
০১	১।	আম্বুইল
	২।	বালেন্দা
	৩।	গোড়তা
	৪।	কেশব পুর
	৫।	জয়নগর
০২	৬।	বিশ্বা
	৭।	তিরাইল
	৮।	ফলিল
০৩	৯।	আশ গ্রাম
	১০।	টেপুরা
	১১।	আটাইল
	১২।	জামালপুর
০৪	১৩।	ছোন্‌কা
	১৪।	চন্ডিপুর
০৫	১৫।	সরো
	১৬।	হলদিবাড়ী
	১৭।	ইটালী
০৬	১৮।	ঘোগা
	১৯।	নন্দ তেঘড়ি
	২০।	নিজাম বগুড়া
	২১।	খুর্দ্দ বগুড়া
	২২।	শিখর
০৭	২৩।	ভবানীপুর
	২৪।	আফরাত গাড়ি
	২৫।	গোবিন্দপুর
	২৬।	মেন্দিপাড়া
	২৭।	দীর্ঘাই
	২৮।	জাম নগর
	২৯।	শোলাগাড়ি
০৮	৩০।	বড়াই দহ
	৩১।	খলিসাগাড়ি
	৩২।	বেলগাড়ি
	৩৩।	বেলগাড়ি কলোনী
০৯	৩৪।	আমিনপুর
	৩৫।	আমিনপুর নতুন কলোনী
	৩৬।	আমিনপুরপুরাতন কলোনী
	৩৭।	শাহাপুর
	৩৮।	কুমার ঘাট
	৩৯।	সুবর্নহার

www.amarboi.org

সুঘাট ইউনিয়ন -০৮

ওয়ার্ড নং	ক্রমিক নং	গ্রামের নাম
০১	১।	কল্যানী
	২।	চর কল্যানী
	৩।	চর বেলগাছি
	৪।	জয়লা আলাদি
	৫।	চক বিনাই
০২	৬।	জয়লা জুয়ান
	৭।	গুয়া গাছি
	৮।	জয় নগর
০৩	৯।	চক ধলী
	১০।	চক কল্যানী
	১১।	বিল জয়সাগর
	১২।	হরিনাথ পুর
	১৩।	চক ভেড়ুয়া
০৪	১৪।	বিনোদপুর
	১৫।	চক সাদী
০৫	১৬।	সাতারা
	১৭।	চক রাজিব
	১৮।	সাতারা সারাজি
	১৯।	ওমর পাড়া
	২০।	গোয়াল জানি
০৬	২১।	সূত্রাপুর
	২২।	বানিয়াগাতি
	২৩।	আখেরি পাড়া
	২৪।	শটিবাড়ী
	২৫।	জোড়গাছা
	২৬।	মাছকান্দি
০৭	২৭।	দড়ি হাসড়া
	২৮।	খিদির হাসড়া
	২৯।	চক পাইাড়ি
	৩০।	চক নর্শি
০৮	৩১।	চমর পাথালিয়া
	৩২।	সুঘাট
	৩৩।	শরিফ সুঘাট
	৩৪।	আওলাকান্দি কুঠির পাড়া
০৯	৩৫।	ফুলজোড়
	৩৬।	সাতানী ফুলজোড়
	৩৭।	হাস্না ফুল জোড়
	৩৮।	সাদেক পুর
	৩৯।	মধ্যভাগ

সীমাবাড়ী ইউনিয়ন -০৯

ওয়ার্ড নং	ক্রমিক নং	গ্রামের নাম
০১	১।	সদর হাসড়া
	২।	কদিম হাসড়া
	৩।	গাঁড়ই
	৪।	বামুনিয়া
	৫।	সেন বামুনিয়া
০২	৬।	ধনকুন্ডি
০৩	৭।	সীমাবাড়ী
	৮।	রড়োয়া
০৪	৯।	আট মিসা
	১০।	বেতগাছি
০৫	১১।	ঘাসুরিয়া
	১২।	নকুয়া
	১৩।	টাকা ঝুকুরিয়া
০৬	১৪।	নাকুয়া
	১৫।	কালিয়া কেড়
	১৬।	কালিয়াকেড় পাঁচ বাড়িয়া
	১৭।	কালিয়াকেড় চক গোলাম-
০৭	১৮।	লাংগল মোড়া
	১৯।	চকা কেশব
০৮	২০।	বেটখেড়
০৯	২১।	সিমলা
	২২।	নিশিন্দারা

www.amarboi.org

সমাজনীতি (আমোদ-প্রমোদ, পোশাক-আশাক, সামাজিক অবস্থা ও বিচার-আচার)

আমরা এখন বিংশতিতম শতাব্দির সমাপ্তি যুগে উপনীত। আমাদের সমাজনীতি এখন পরম উৎকর্ষতায় পরিবর্তিত ও পরিবর্দ্ধিত। কিন্তু তাই বলে আমরা প্রাচীনদের সমাজ ব্যবস্থা হতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত ও বিচ্ছিন্ন নহি। প্রাচীনদের সমাজ বিধি আংশিক অবিজ্ঞান প্রসূত হলেও তার অধিকাংশই ছিল মানবিক। আমরা ওয়ারিশ সূত্রে প্রাচীন প্রথার উত্তর পথিক। পূর্ব কালের সমাজ ব্যবস্থার পূর্ণ বিবরণ হুবহু নকল করা সম্ভব নহে। সার্বিক অবস্থা ছাড়া স্থানবিশেষের বিবরণ পেশ করা ততোধিক কঠিন। অনুমিত হয় যে তৎকালে কমবেশী সমগ্র বাঙ্গলার সমাজ নীতি প্রায় একই ধারায় প্রবাহিত ছিল। এখানে বাবু হর গোপাল দাস কুন্ডু বিরচিত "শেরপুরের ইতিহাসের" পাতা হতে প্রাচীন সামাজিক অবস্থা সম্পৃক্ত বিবরনীর কিয়দংশ উদ্ধৃত হলো। " বৌদ্ধ যুগের ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে সেকালের ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যানুশীলনের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পৌন্ড্রবর্দ্ধনের দেবনর্তকী কমলার বাসগৃহ রাজ প্রাসাদের ন্যায়, শোভিত বিবিধ কক্ষে পরিপূরিত ছিল এবং তাহাতে সুবর্ণ সিংহাসন ও সুবর্ণ ঘটা শোভা সম্পাদন করিত। বেশ্যা কমলা ও বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথোপকথন করিত। এই বিবরণ হইতে এ অংশের তৎকালীন অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারে।

পূর্বের প্রায় সকল লোকই অস্ত্র শস্ত্র রাখিত। এবং তাহা চালাইতে জানিত। লোকেরা সাহসী, বলবান, পরিশ্রমী ও সুস্থ্যকায় ছিল। দেবদ্বিজ গুরুজনের প্রতি ভক্তি ছিল। খাদ্য দ্রব্যের তেমন পারিপাট্যি ছিল না। কিন্তু লোকের আহার বেশী ছিল। সমস্ত দ্রব্য সস্তা ছিল। যে ব্যক্তি মাসে ২ টাকা অর্জন করিত, তাহার পরিবার প্রতি পালনে কোন কষ্ট হইত না। তখন পয়সা, আধুলি, সিকি ছিল না। টাকা ভাঙ্গাইলে এক বোঝা কড়ি পাওয়া যাইত, তাহা দ্বারাই সমস্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করা চলিত। তখন স্ত্রীলোকের উপর অতিশয় উৎপীড়ন ছিল। বৃদ্ধাদিগের সুখ ও সম্মান বরং এখন অপেক্ষা তখন ভাল ছিল। কিন্তু বৌদিগের কষ্ট ও অপমান সহ্য করিতে হইত। সেই জন্যই এই সময় হইতে শ্যালক, শ্বশুর, শাশুড়ী শব্দ গালি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। তখন রাজ দ্রোহও ডাকাতি বীর পুরুষের কার্য্য বলিয়া গণ্য ছিল। চুরি, ছুছামি, ঠগামি তখন অতি ঘৃণিত কার্য্য বলিয়া গন্য ছিল। যে সম্প্রদায়ের যে ব্যবসা, তাহা কেহ লঙ্ঘন করিত না। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের লোকেরা পূর্বে ছাগ মাংস স্পর্শ করা দূরে থাকুক- এমনকি ছাগ বলি পর্যন্ত দর্শন করিতেন না। এখন প্রায় বারআনা বৈষ্ণব অবাধে ছাগ মাংস ভোজন করিয়া থাকেন।"

www.amarboi.org

একালের বহু মুসলমান, যেমন ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত থাকা সত্বেও অনেক অনুশাসন এড়িয়ে চলে, অনুরূপ ভাবে সেকালের সাধারণ মুসলমান অজ্ঞতাবশতঃ বিভিন্ন গর্হিত ও অবাঞ্ছিত কাজে অবলীলায় অংশ গ্রহণ করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য যে পূর্বকালের অজ্ঞ মুসলমানেরা বংশদন্ডে চামুর ঝুলিয়ে পূজাবৎ উৎসব পালন করত। পাছে ছেলে পুলেকে ভুতে পেয়ে বসে, এ ভয়ে নবজাত শিশুর নাক কাণ ফুঁড়ে দেয়া হতো। কলেরা মহামারীর হাত হতে রক্ষার্থে, ছেলেপুলের কোমরে জুতার চামড়া কেটে লাগানোর প্রচলন ছিল। কোথাও কোথাও বৃহদাকার প্রাচীন বৃক্ষ শাখায় বস্ত্রকুট বেঁধে মান্নত রক্ষা করা হতো। সূতিকাগৃহে যাতে করে পেঁচো প্রবেশ করতে না পারে, তজ্জন্য গরুর হাড় হাড্ডি প্রসূতির শিয়রে স্থাপন করার নিয়ম ছিল। কলসী পূর্ণ পানি পদপ্রান্তে ঢেলে দিয়ে, নব বধূ ও বরকে বরণ করে নেয়া হতো। এছাড়া আরও অনেক শরীয়াত বিরোধী ও কুসংস্কার পূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হতো। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বর্ণিত কাজগুলি ইসলামী ব্যবস্থামতে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ বা হারাম। একালের ট্রাংক তোরংগ ও ভ্যানেটি ব্যাগের পরিবর্তে সেকালের গ্রাম বালারা বেতের ঝাপি ও চুবড়ী ব্যবহার করত।

সাধারণতঃ সেকালের লোকেরা সরল জীবন যাপন করতেন। তৎকালে যুবকগণ ব্যায়াম প্রিয় ছিল। কুস্তি, কসরত, তীর, ধনুক, বা গুলি ধনুক, তরোবারী চালনা, লাঠি খেলা, অশ্বারোহণ, নৌকাচালন, সন্তরণ, হাডু-ডু প্রভৃতি বীরোচিত দেশী ক্রীড়া-কৌশলে যুবকগণ বিশেষ দক্ষতা অর্জন করত। আড়ম্বরহীন হলেও সাত্বিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়েই পানাহার সম্পন্ন হতো। সকলেই খাদ্য দ্রব্যাদি ক্রয়ের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে যথাসাধ্য নিজ নিজ ভূমিতে উৎপন্ন করত। তখনকার বহু ভোজীর কথা শুনলে আমাদেক অবাক হতে হয়। একজনে একটা মস্ত বড় কাঠাল, পাঁচ সের রসগোল্লা, অথবা আস্ত একটা ছাগ এক বৈঠকেই উদরস্থ করে ফেলত। তখনকার দিনে লুচি সন্দেশের প্রচলন ছিল না। বড় জোর দধি চিড়া হলেই ফলাহার সম্পন্ন হতো।

সেকালের লোকেরা অশ্লীলতাকে বড় একটা আমল দিতনা। অনুরূপ ভাবে তাদের নৈতিক চরিত্র ও তেমন উন্নত ছিল না। সমাজের তথাকথিত বড় লোকেরা তখন আইনের শাসন খুব একটা মেনে চলতনা। নেতৃস্থানীয় লোকেরা উপপত্নী রাখা দোষের কথা মনে করতেন না। ছেলেরা ৯/১০ বছর বয়স পর্যন্ত উলংগ থাকত এবং হাতে বাজু ও বালা, গলায় মালা, কোমরে গোট, প্রভৃতি অলংকার পরিধান করত। পুরুষের মাথায় বাবরী রাখা, তখন এক রেওয়াজে পরিণত হয়েছিল।

www.amarboi.org

পোষাক-আষাকও প্রসাধনঃ- ভদ্র লোকেরা গায়ে অঙ্গ রাখা ও পায়ে নাগ্‌রা জুতা ব্যবহার করতেন। সম্ভ্রান্ত ঘরের লোকেরা খানসামা দ্বারা মাথায় ছাতা ধরে নিকটবর্তী স্থানে যেতেন। সাধারণ গৃহস্থরা "ঠেটি" এবং মধ্যবর্তী ভদ্রলোকেরা তন্ত্রবস্ত্র পরিধান করতেন। স্ত্রীলোকেরা সাধারণ মোটা শাড়ী ব্যবহার করত। "মেঘডুম্বর পাটের শাড়ী প্রভৃতি পোষাকী বলে গণ্য ছিল। এখনকার বডিস জ্যাকেটের পরিবর্তে তখন কাঁচুলি ব্যবহৃত হতো। সেকালের ললনাকুল প্রসাধনী দ্রব্যের ব্যবহার জানতনা। সাবানের পরিবর্তে তারা সাজি মাটি দ্বারা দেহ পরিষ্কার করত। ধনাঢ্য ঘরের ঝিয়েরা সুবাশিত কেশ তৈল ব্যবহার করত।

অলংকারঃ স্ত্রী লোকেরা স্বর্ণ-রৌপ্যের গহনার মধ্যে মাথায় ফেঁচুয়া, ঝাপটা, কর্ণে ঢেড়ি, কদমা, কুন্ডল, প্রভৃতি নাসিকায় বেসর, নথ, বুলাক প্রভৃতি গলায়, হাসুলী, পাঁচলহরী, সাতলহরী প্রভৃতি, বাহুতে বাঁজু, কাটা বাজু, তাড়, হস্তে রোয়াদানী, ছোনপৌছি, নারকেল ফুল, প্রভৃতি, কোমরে বিছা চন্দ্রহার , পায়ে বাঁক খাড়ু, আড়বেঁকি প্রভৃতি ব্যবহার করত।

ব্যায়ামঃ তখনকার গোলন্দাজ, তীরন্দাজ, পলারি ও লাঠিয়াল দিগের খুব কদর ছিল। জমিদার ও তালুকদারেরা এদেরকে পালন করতেন। এরা বন্দুক, ধনুক, কামটা, টেটা, সাঙ্গ বল্লম, প্রভৃতি অস্ত্র চালন করত। গ্রাম বাংলার সর্বত্রই তখন কুস্তি-কসরত ও লাঠি খেলার আড্ডা ছিল। কোচ গোয়ালা, কৈবর্ত, নমঃশূদ্র প্রভৃতি গোত্রের লোকেরা অস্ত্র চালনায় বেশি পটু ছিল।

আমোদ প্রমোদঃ সেকালে কবির গান, ভাসান যাত্রা, মনোহর শাহীপদ প্রভৃতি খুব আমোদ-প্রদ ছিল। এছাড়া লোকেরা কেচ্ছা-কাহিনী ও জারীগানের আসর করত। সেকালের জারী গানের প্রবক্তাকে বয়াতি বলা হতো। পূর্বকালের গান গজল ও মূর্ছিয়া ছিল ভাবোদ্দীপক ও সুর প্রধান। তখন যন্ত্রের মাতাল-ঝংকার ও চুটকি সুর বলতে কিছু ছিল না। বর্তমানে সঙ্গীত চর্চার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। সত্য,কিন্তু এতে অশুভ প্রবণতাও বেড়ে গেছে ঢেড়। উৎকট সঙ্গীত চর্চার অশুভ ফলাফল সম্পর্কে বাবু হর গোপাল কুন্ডু মহাশয়, নিম্নরূপ মন্তব্য রেখেছেন। "বস্তুতঃ এখানকার নব্যদলের কবলিত হইয়া সঙ্গীতের শিরশ্চর্বণ সাধিত হইতেছে। চুটকীসুরে নিকৃষ্ট ভারোদ্দৃপ্ত গান শুনিয়া হৃদয়ের অপকৃষ্ট বৃত্তিগুলির চরিতার্থতা সম্পাদন করাই আজিকালির সঙ্গীতানুশীলনের লক্ষিত বলিয়া বোধ হয় ------ অপিচ তাহাদিগের সঙ্গীতানুরাগ একান্ত উৎকট হওয়ায় চুট্‌কী অঙ্গের নব্য বিলাসিতা ও প্রেম লালসাক্লিষ্ট থিয়েটার সঙ্গীতের বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়।----- সঙ্গীত একটি ললিতকলা বলিয়া পরিগণিত। উহাকে উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তির সহায়রূপে অনুশীলন করিতে হয়।"

www.amarboi.org

খেলাধুলাঃ নদীমাতৃক বাংলাদেশে পূর্ব আমলে নৌকা বাইচের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এতদ্ব্যতীত লাটাই, ঘুড়ি ও চং উড়ান, মেড়া ও বুলবুলি লড়াই ও কুস্তি লড়ে, লোকেরা যথেষ্ট আমোদ উপভোগ করত। কিন্তু ইংরেজ আমদানী ক্রিকেট ও ফুটবল, ভলিবল, হকি প্রভৃতি খেলার প্রচলনে এক্ষনে বঙ্গের যুবকেরা দেশীয় খেলা ধূলাকে অচল মনে করছে।

জাতীয় দিবসে কুচ কাওয়াচ ও শারীরিক কসরত প্রদর্শনীর একটি দৃশ্য

সামাজিক অবস্থাঃ পূর্বকালে আমাদের দেশের জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল নর। তাই পাত্রী পেতে হলে তখন নারী ঘাটতির খেসারত দিতে হতো। নগদ কন্যা পন পরিশোধ না করলে তখন বিয়ে ঘটানো অসম্ভব ছিল। এখন উলটো খেসারত চলছে। নামমাত্র পাত্র পেতেও এখন কন্যার পিতাকে বস্তু ভিটা বেচে হলেও ষোলকলায় যৌতুক দিতে হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী বিধান মতে কন্যাপণ ও বাধ্যতামূলক পাত্র যৌতুক উভয়ই হারাম। পূর্বকালে হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজেই বিয়ে শাদীতে বংশগত ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হতো। অর্থাৎ, সম গোত্রীয় পরিসীমা লঙ্ঘন করে অসম গোত্রে সম্বন্ধ স্থাপন তখন দোষের কাজ বলে গণ্য ছিল। এ ব্যাপারে হিন্দু সমাজ আরও এক ধাপ অগ্রসর ছিল। তারা বিভিন্ন পঙ্‌ক্তিতে বিয়ে শাদী করা দূরে থাক, কেহ কারো হাতে বা সম পংক্তিতে বসে পর্যন্ত আহার্য গ্রহণ করতনা। এক্ষণে শ্রেণী বাতিক বহুলাংশে শিথিল হয়ে আসছে। নিম্ন শ্রেণীভুক্ত লোকেরাও এখন আত্ম-মর্যাদাশীল হয়ে উঠেছে। এখানে উল্লেখ্য যে অপরাপর সদগুন ব্যতীত কেবল বংশ মর্যাদা দাবী করে অপরকে নিকৃষ্টতর মনে করা হীনমন্যতারই একটা উৎকট লক্ষণ বটে। বাস্তব প্রস্তাবে মানবিক মাপ কাঠিতে একমাত্র তাদেরকেই কৌলিক বলা চলে- যারা, সর্ব কাজে খোদাভীতিকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

www.amarboi.org

পূর্বকালে হিন্দু সমাজে কতিপয় প্রকট মেয়েলী কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। যথাঃ রাতের প্রথম প্রহরে কেবল একটি মাত্র তারকা দেখা, দুজনের চুলে চুলে স্পর্শ হওয়া, গাত্রে ব্যজনীবাত লাগা, ছাগলের দড়ি ডিংগানো প্রভৃতি চরম দোষের কথা মনে করা হতো। অনুরূপভাবে নষ্ট চন্দ্রের দিন,চুরি করে নষ্ট চন্দ্র দর্শন জনিত সকল দোষ খণ্ডন করার নিয়ম ছিল। এতদ্ব্যতীত রাত্রিকালে সরাসরি সাপ ও বাঘের নাম উচ্চারণ না করে তৎপরিবর্তে যথাক্রমে পোকা ও বড় শেয়াল বলা হতো। আবার কোন কোন গ্রাম্য বালা, গরুকে ছেওট ও কুকুরকে হেংগাল, বিড়ালকে মেছি ও চুণ কে দই বলত। পূর্বকালের নারীগণ, গুরুজন ও স্বামীর প্রতি অগাধ ভক্তিশ্রদ্ধা পোষণ করত। এমনকি জীবন মরণ সমস্যা কালেও তারা গুরুজনের নাম মুখে তুলতনা। বর্তমান কালে এই মাত্রাতিরিক্ত ভক্তি পোষণ আর নেই। এখন স্থান বিশেষে গুরুজনের নামোচ্চারণ ছাড়া তুই তুংকার পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।

ভাষাঃ এদেশের শতকরা আশি জন লোক এখনও অশিক্ষিত। সুতরাং নিরক্ষর ভাষাভাষীর কথ্য ভাষার প্রাধান্যই এখানে প্রবল। এখানকার শিক্ষিত লোকেরাও কুচিৎ বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলে থাকেন। শেরপুরের কথ্য ভাষার সার্বিক উচ্চারণ প্রায়ই অভিন্ন। তবে অঞ্চল বিশেষে উচ্চারণের সুরে কিঞ্চিৎ গরমিল পরিলক্ষিত হয়। করতোয়া নদীর পূর্বাঞ্চল হতে ধনুট নাগাদ এলাকার ভাষার কাজিপুর থানার কথ্য ভাষার প্রভাব বিদ্যমান। দক্ষিণাঞ্চলের ভাষায় পাবনা জেলার রায়গঞ্জ থানার সুর সংমিশ্রিত। মুল শেরপুরের লোকজন মোটামুটি খিয়ার এলাকার কথ্য ভাষার অনুসারী। এখানকারবিশুদ্ধ ভাষাভাষী সাধারণ লোকের রক্ষিত ভাষায় আকাশ-পাতাল প্রভেদ। গোটা বগুড়া জেলার কথ্য ভাষার পদের অন্ত "আ" কারের স্থানে "্যা" ব্যবহৃত হয়। যথা- কর্যা (করিয়া) মূল্যা, তুল্যা, ইত্যাদি। অনুরূপ ভাবে "কে" স্থানে "ক" ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা- আমাক (আমাকে), তোমাক তাক (তাহাকে) ইত্যাদি। চন্দ্র বিন্দু ও যত্র তত্র ব্যবহৃত হয়। যথা- সাপ, গুড়, ইত্যাদি। আদ্য একারের স্থানে "্যা" ব্যবহার করা হয়। যথা- ত্যাল (তেল), ব্যাল, ইত্যাদি। কোন কোন সময়ে আদ্য "ল" এর স্থানে "ন" এবং ন এর স্থলে "ল" ব্যবহৃত হয়। যথা- লক্ষ্মীন, (লক্ষ্মী), নাল (লাল), ইত্যাদি। কুণ্ঠি (কোথায়) হ্যারায় (এদিকে আইস) এবং মহিলাকুলের নিজস্ব এব্যাই, ভাস্যি, ছ্যাচাই (হিন্দি সাচ্চা শব্দ হতে), সাঝ, বিহান, প্রভৃতি শব্দ আজও প্রচলিত রয়েছে। অনুরূপ ভাবে এ্যাক্না, দুকনার ব্যবহার ও দুর্লভ নহে।

www.amarboi.org

জমিদারী ও প্রজাস্বত্বঃ প্রাচীন যুগে জমি-জমার মালিকানা স্বত্ব নিয়ে প্রজাগণ তেমন মাথা ঘামাতোনা। কারণ, সেকালে ভূমির তুলনায়, লোক সংখ্যা ছিল অতীব নগন্য। তখন এক টাকায় ৪ বিঘা পর্যন্ত জমি পাওয়া যেত। অতঃপর জমিদারী আমল শুরু হয়। এ আমলে নাম মাত্র খাজানা দিয়ে বিশাল মহল্লা ভোগ দখল করা যেত। কিন্তু এ নাম মাত্র খাজানা ও অনেকে পরিশোধ করতে পারতোনা। এমনও হয়েছে যে, খাজানার দায় হতে রেহাই পাওয়ার নিমিত্ত, কোন কোন প্রজা বাস্ত ভিটা ও জমি খামার পরিত্যাগ করে গোপনে অন্যত্র পালিয়ে যেত। জমিদারগণ বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রজা আমদানী করে স্বল্প মূল্যে এবং অনেক ক্ষেত্রে লাখেরাজ সূত্রে ভূমি পত্তনি দিতেন। এমনিভাবে দিন দিন জনসংখ্যা বেড়ে যেতে লাগ্‌লো। এদিকে জমিদারগণও ক্রমান্বয়ে রাজস্ব আদায় ক্ষেত্রে কিছুটা কঠোরতা অবলম্বন করলেন। সেকালের অধিকাংশ প্রজাই ছিল অনুগত ভৃত্যের ন্যায়। তারা নিজ নিজ জমিদারকে যমের মত ভয় করত্। পরবর্তীকালে জমিদারগণ, শোষণ ত্রাসন শুরু করে দেন। খাজানা পরিশোধ বিলম্বিত হলে, অথবা কোন অপরাধ পরিলক্ষিত হলে জমিদারগণ জুতা পেটা করে প্রজাদেক শায়েস্তা করতেন। জমিদার মহলের ত্রিসীমানার মধ্যে ছত্র মাথায় বা পাদুকা পরিহিত অবস্থায় প্রবেশ করাও নিষিদ্ধ ছিল। হিন্দু কালে জমিদারদের মাটিতে গরুজবেহ্ করা ছিল এক আমার্জনীয় অপরাধ কিন্তু মুসলমান আমলে প্রজা পীড়ন বহুলাংশে লাঘব হয়। এ আমলে দেয় রাজস্ব পরিশোধ করতে না পারলে, জমিদারী নিলাম হবার প্রথা ছিল না।

বিচার আচারঃ পূর্বকালে গ্রাম্য মোড়লেরাই অধিকাংশ ঝগড়া-বিবাদ মিমাংসা করে দিতেন। জটিল মামল-মোকদ্দামার নিমিত্ত সরকারী বিচার বিভাগও চালু ছিল। পূর্বে হিন্দু-মুসলমানের বিচারের নিমিত্ত আদালতে পন্ডিত ও কাজী নিযুক্ত থাকতেন। হিন্দু সাক্ষী দিগকে গংগাজল ও মুসলমান দিগকে কুরআন শরীফ স্পর্শ করে শপথ করতে হতো। পূর্বকালে সাজা প্রাপ্ত আসামীগণ জেল খানায় অনেক সুবিধা ভোগ করত। ঐশ্বর্যশালী লোকের কারাদন্ড হলে ঘুষ প্রদানে জেল খানাতে আমোদ প্রমোদ করতে পারতেন। এবং প্রয়োজন বোধে বাড়ী বা অপর স্থান হতেও বেড়িয়ে আসবার অনুমতি ছিল। অবশ্য এ কালেও জেল খানায় ঘুষ প্রথা অব্যাহত আছে। তবে জামিন ব্যতীত একালে ছুটি ভোগ করণের অবকাশ আর নেই। সম্ভবতঃ পূর্বকালে জামিন প্রথা রহিত ছিল। তাই, আসামীগণ ঘুষ প্রদানে ছুটি ভোগের সুযোগ পেত।

www.amarboi.org

বাংলা ১২০০ সালে রচিত "নাটোরের কবিতা" নামক একটি কবিতা হতে সেকালের বিচার পদ্ধতির নমুনার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত হলো।

"তখন সন ১২০০ সালে, হুকুম দিলা আদালতে
বাকরন্ড মারফতে কাজ।
আসামী ফৈরাদি যত, আছিলেক শত শত।
সবার মস্তকে পৈল বাজ"
এমত হুকুম যবে, সামনে খাড়া হৈলাসভে
পিতৃ পূণ্য জনের তাহাতে।
কোরান মস্তকে থুয়া, কেহ গঙ্গাজল লৈয়া
কসম করিলা আদালতে।
(শেরপুরের ইতিহাস ১০১ পৃষ্ঠা)

সভা-সমিতি ও দলীয় রাজনীতি

প্রাচীন কালে সভা-সমিতি করে জনমত গঠনের কোন প্রচলন ছিল না। জনগণ গ্রাম্য মোড়ল অথবা আঞ্চলিক প্রধানের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রকাশের কোন সুযোগ পেতনা। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন জনগণ বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীণ হতে লাগলো, তখন উহা সমাধানকল্পে নেতৃবৃন্দ, বৃহত্তর জনসমাবেশের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে লাগলেন। এমনি ভাবে পর্যায়ক্রমে তারা গণ আন্দোলন গড়ে তোলার পথে অগ্রসর হলেন। আমরা এখানে "শেরপুরের ইতিহাস" হতে গণ আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উদ্ধৃত করছি।

"১২৮৩ বঙ্গাব্দে বগুড়া" সাধারণ সভা" নামে একটি সভা স্থাপিত হয়। কলিকাতস্থ ভারত সভার এবং রাজশাহী সভার সহিত এর সংস্রব ছিল। যাহাতে এতদঞ্চলস্থ অধিবাসিগণের অভাব ও অভিযোগ সমুহ গর্ভণমেন্টের গোচর করা যাইতে পারে, তদুপায় অবলম্বন করাই এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এতদ্ব্যতীত এই জেলা বাসি গণের বিদ্যা-বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পাদি বিবিধ উপকারী বিষয় সম্বন্ধে উন্নতি বিধানের চেষ্টা ইহার অপর উদ্দেশ্য ছিল। শেরপুরের গোবিন্দ চন্দ্র মহাশয় ইহার কার্যাধ্যক্ষ এবং কালী কিশোর মুন্সী মহাশয় ইহার সম্পাদক ছিলেন। সে সময় হইতেই রাজনীতি চর্চা এ জেলায় বিস্তৃত হইয়া পড়ে। সভাটি কত দিন জীবিত ছিল জানা যায় নাই।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গ বিভাগ উপলক্ষে একটি সমিতি গঠিত হয়। সেটি উঠিয়া গিয়াছে।

www.amarboi.org

পরবর্তীকালে স্থানীয় সচেতন জনগণ রাজনীতি ক্ষেত্রে আরও তৎপর হয়ে উঠেন। কিন্তু ইংরেজ বেনিয়াদের কারসাজির দরুন ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বপর্যন্ত এখানে কোন বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। তবে জেলা পর্যায়ে যে সমস্ত আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এখানকার নেতৃবৃন্দ তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে ত্রুটি করেন নাই। জমিদারী আমলে, শেরপুরের রাজনীতি ছিল কোন ঠাসা ধরনের। তখন সাধারণ লোকজন, মুখ খুলতে সাহস করতনা। জমিদারগণ সরকারের শিখন্ডীরূপে আপন আপন স্বার্থ রক্ষা করে চলতেন। এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই জনস্বার্থ বিপন্ন হতো। বিক্ষুব্ধ জনতা কোন সংগঠনের মাধ্যমে আন্দোলন গড়ে তুললে স্বার্থান্বেষী কুচক্রী শাসকমণ্ডলী তা কঠোর হস্তে দমন করতেন। এমনকি মিথ্যা অভিযোগ খাড়া করে উদ্যোক্তাদেক জেল জুলমে ও ফাসিয়ে দেয়া হতো।

স্থানীয় স্বার্থনেষী ও প্রভাবশালী জমিদারদের সহযোগিতা না পেলে হয়ত, ইংরেজ কুঠিয়ালরা এত সহজে প্রতিবাদি জনগোষ্ঠিকে দমন করতে পারতোনা। ষড়যন্ত্র মুলক চন্ড দমন নীতির ফলে, অসহায় নেতৃবর্গ গ্রেফতার ও কোনঠাসা হয়ে পড়লেও আন্দোলনের গতি কিন্তু একেবারে স্তিমিত হয়নি। বিষয়টি ধূমায়িত হতে হতে শেষে সমগ্র উৎপীড়িত জনগোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে ইংরেজ বিরোধী হতে থাকে। বাস্তবে এই ক্রান্তি লগ্নে যোগ্য ও নিঃস্বার্থ নেতৃত্ব গড়ে উঠা অতীব জরুরী ছিল। জমিদারগণ ইচ্ছে করলে, অতি সহজেই নেতৃত্বের শীর্ষে উঠে আসতে পারতেন কিন্তু জমিদারীর লোভনীয় স্বত্ব-সামীত্ব চিরস্থায়ী করে রাখার নেশায় তারা জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থ উপেক্ষা করে বসেন।

যা হোক। পরিশেষে ইংরেজ কুঠিয়ালদের ষড়যন্ত্র ও কারসাজির বাধ ভেংগে খান খান হয়ে যায়। দেশের মাটি হতে বিদেশী বেনিয়া গোষ্ঠী চিরতরে বিদায় গ্রহণ করে। পাক-ভারত বাংলা স্বাধীনতা পূর্ব ও উত্তর কালে যে সমস্ত আন্দোলন গড়ে উঠে শেরপুরের সচেতন জনগণ তাতে কম-বেশী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। তদানীন্তন পাকিস্তান আমলের প্রথম দিকে সারা দেশের মত শেরপুরেও মুসলীম লীগের একচেটিয়া প্রতিপত্তি বহাল থাকে। অতঃপর এখানে মুস্‌লীম লীগের পাশাপাশি পর্যায় ক্রমে আওয়ামী মুস্‌লীম লীগ, আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ), জামায়াতে ইসলামী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি দলের আত্ম প্রকাশ ঘটে। এখানকার প্রাক্তন মুসলীম লীগ নেতা কর্মিদের মধ্যে মরহুম মুঈন উদ্দিন শেখ, মরহুম শাহ্ আবদুল বারী, মরহুম গাজি রহমান, মরহুম কেওয়াজ উদ্দিন মন্ডল, ও মরহুম গোলাম রব্বানী সরকার প্রমুখ অন্যতম ছিলেন। মরহুম জনাব শাহ আবদুলবারী বগুড়া জেলার স্বাধীনতা (পাক-ভারত)

www.amarboi.org

আন্দোলনকারী প্রাচীন ব্যক্তিদের একজন। ইনি চন্দনবাইশার অধিবাসী হলেও পরবর্তীকালে শেরপুর শহরে স্থানান্তরিত হন এবং পড়ন্ত বয়সে এখানেই ইন্তেকাল করেন। মরহুম বারী সাহেব ১৯২৯ সালের বিলেতি সামগ্রী বর্জন আন্দোলনে, একবার গ্রেফতার হন। চান্দাই কোনার অর্ন্তগত ধনকুন্ডি গ্রামের মরহুম গোলাম রব্বানি সরকার, তদানীন্তন প্রাদেশিক পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানের একজন স্বনামধন্য ও জনপ্রিয় সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯৭১ সালে আততায়ীর হাতে নিহত হন।

জনাব গাজি রহমান স্থানীয় খিকিন্দা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন নীরব সমাজ কর্মি। এতদ্ব্যতীত তিনি একটানা দুবার শেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন। বাংলাদেশ স্বাধীনতা উত্তর কালে জনাব গাজি রহমান দালালি আইনে কিছু দিন আটক ছিলেন। তিনিও আততায়ীর হাতে বিগত ১৯৮০ সালে নিহত হন। ১৯৭১ সালের পর মুসলীম লীগের প্রভাব প্রতিপত্তি হ্রাস পেতে পেতে এক্ষণে সমগ্র শেরপুর থানায় মুসলীম পন্থী আর কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব আছে কিনা তা খুঁজে বের করা কঠিন। বস্তুতঃ ক্ষীয়মাণ মুসলীম লীগ পন্থীরা নেতৃত্বের অভাবে অপরাপর দলে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে পড়ায় এই চরম শূণ্যতা সৃষ্টি হয়েছে। ইংরেজ আমলে কুঠিয়ালরা যখন বগুড়া, শেরপুর ও ধনুট থানার বিশাল এলাকা জুড়ে নীল চাষের ফাঁদ বিস্তার করে বসে এবং স্থানীয় দরিদ্র জনগণের উৎপীড়ন শুরু করে দেয়, তখন কৃষক মজুরেরা বাধ্য হয়ে সেফাতুল্লাহ ফকিরের শরণাপন্ন হয়। সেফাতুল্লাহ সাহেব কুঠিয়াল ও জমিদারী স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলেন। শেরপুরের বাশর প্রামানিক ছিলেন এদলের সর্ব জ্যেষ্ঠ সরদার। এরা দীর্ঘ কুড়ি বছর (১৮৯৫-১৯১৫) ধরে একটানা আন্দোলন চালিয়ে যান। এ বিদ্রোহী দলটি দমন কল্পে কুঠিয়াল ও আমলা পক্ষ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করে ব্যর্থ হয়ে যান। অবশেষে এদের বিরুদ্ধে মিথ্যা ডাকাতির অভিযোগ খাড়া করে, পাইকারী হারে গ্রেফতার করা হলো- কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো। এমনি ভাবে ইংরেজ আমলের শেষ নাগাদ রাজনৈতিক তৎপরতা দাবিয়ে রাখা হয়।

জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ

জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ একটি ক্যাডার ভিত্তিক বলিষ্ঠ ইসলামী আন্দোলন। ১৯৭০ সালে এ দলটি সাধারণ নির্বাচনে বলিষ্ঠতার সহিত অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে পরাজিত হলেও সারা দেশ ব্যাপী ব্যাপক প্রচার লাভ করে। ১৯৭২ সালে দলটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। অতঃপর মেজর জিয়াউর রহমানের শাসনামলে

www.amarboi.org

১৯৭৯ সালে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহর হলে আবারও প্রকাশ্যে আন্দোলন শুরু করে দেয়। অবশ্য ১৯৭১ সালের পর, যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে শেরপুরে দলটি দুর্বল হয়ে পড়ে। বর্তমানে শেরপুর থানায় দলটির প্রভাবও পরিচিতি বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। জনাব এডভোকেট আবদুল হলিম এক্ষনে থানা আমিরের দায়িত্ব পালন করছেন। বর্তমানে শেরপুর থানার ৩৬০টি গ্রামেই জামায়াতে ইসলামির পরিচিতি রয়েছে এবং ২১ জন রুকন ছাড়াও চারশতাধিক প্রথম শ্রেণীর কর্মি দ্বীনি আন্দোলনে কর্মরত আছেন।

ন্যাপ- পূর্বে এখানে ভাসানী পন্থী সংগঠনটি জোরদার ছিল। এরপর মোজাফফর পন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি শক্তিশালী হয়ে উঠে। মরহুমআরজুল্লাহ মিঞা, জনাব শেরআলী ও জনাব সিদ্দিক হোসেন প্রমুখ এক সময় বলিষ্ঠতার সহিত পার্টির কাজে সক্রিয় ছিলেন। জনাব সিদ্দিক হোসনে ১৯৭৩/৭৪ সালে শেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

আওয়ামীলীগ

বর্তমানে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ প্রথম হতেই শেরপুরের রাজনীতির অঙ্গনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে আসছে। বিগত ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে এদলের মনোনীত প্রার্থী ছিলেন নন্দিগ্রামের আকবার আলী খান চৌধুরী ও ধনুটের ডাঃ গোলাম সরোয়ার। প্রার্থীদ্বয় জামায়াতে ইসলামীর তদানীন্তন প্রার্থী এডভোকেট জনাব ঈমান আলী ও এডভোকেট খোরশেদ আলীকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়যুক্ত হন। বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব আমানুল্লাহ খাঁন ১৯৭২ সালের সাধারণ নির্বাচনে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। জনাব ফেরদৌস জামান মুকুল ১৯৮৯ সলে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এছাড়া জনাব মিজানুর রহমান খন্দকার, জনাব মজিবর রহমান মজনু, জনাব শাহ জামাল সিরাজি, জনাব আশরাফ উদ্দিন সরকার মুকুল,আবু তালেব পিনু, এডভোকেট গোলাম ফারুক, জনাব সাইফুল বারী,ডাব্লিউ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ শেরপুর থানা আওয়ামী লীগের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আওয়ামী লীগের স্থানীয় সাবেক নেতৃত্বের মধ্যে মরহুম ডাঃ আজিজুল হক, ডাঃ গোলামনবী খান, ও মরহুম আব্দুল আজিজ ছিলেন অন্যতম। এখানকার সাবেক বামপন্থী বলিষ্ঠ নেতা জনাব কমরেড আবদুস সাত্তার ও শ্রী দীপংকর চন্দ্রবতী এক্ষণে স্থানীয় আওয়ামী লীগের প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিত্ব। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এখান হতে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রাথী ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ সাহা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তাঁর পুত্র রথিন্দ্রনাথ সাহা একসময় শেরপুর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন।

বিজ্ঞ বিচক্ষণ বামপন্থি রাজনীতিবিদ বাবু সুবোধ চন্দ্র লহিড়ী দলীয় কর্মকান্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। বর্তমানে তিনি ভারতে স্থায়ীভবে বসবাস করছেন। এখানে অবস্থান কালে তিনি কয়েকখানি মূল্যবান বই লেখেন।

www.amarboi.org

জাতীয়তাবাদি দল (বি, এন, পি)

বাংলাদেশর রাজনৈতিক ইতিহাসে বি, এন, পির ঐতিহ্য খুব বেশী দিনের না হলেও প্রভাব প্রতিপত্তি,জনশক্তি ও দলীয় মর্যাদায় এ সংগঠনটি বর্তমানে ঈর্ষনীয় অবস্থানে রয়েছে। বি, এন, পি দলীয় নেতা জনাব আলহাজ গোলাম মোহাম্মদ সিরাজ আবারও সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। শেরপুর থানার বর্তমান বি, এন,পি নেতৃবর্গের মধ্যে সর্ব জনাব এডভোকেট মাহবুবুবর রহমান, জানে আলম খোকা, শহীদুল ইসলাম বাবলু, মাহবুবুর রহমান হারেজ, পিয়ার হোসেন, পিয়ার প্রমুখ উল্লেখ যোগ্য।

জাতীয় পার্টি (জাপা)

সাবেক রাষ্ট্রপতি আলহাজ্ব হোসেন মোঃ এরশাদ গঠিত জাতীয় পার্টি এক্ষণে বিভক্ত হয়ে পড়রলেও শেরপুরে দলটি সাবেক অবস্থায় বিদ্যমান। অবশ্য এ দলের সাবেক মন্ত্রী জনাব মামদুদুল হক, এক্ষণে বি, এন, পির একজন বরেণ্য নেতা। শেরপুরের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব আব্দুল জলিল ও ধনুট নিবাসী সাবেক এম,পি জনাব শাজাহান আলী তালুকদার বর্তমানে জাতীয় পার্টির প্রধান নেতৃত্বে আছেন।

ইলমেদ্বীন ও আলেম সম্প্রদায়

শেরপুর ও বগুড়া তথা সমগ্র উত্তর বঙ্গেই ইসলামী দ্বীনের চর্চা ছিল অতীব সীমিত। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর উপমহাদেশের সর্বত্রই ইলমে দ্বীন চর্চা ভাটা পড়তে থাকে। দখলদার ইংরেজ বেনিয়ারা নিজেদের তাবেদার সৃষ্টির লক্ষ্যে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, তাতে ধর্মীয় শিক্ষার কোন সুযোগ রাখা হয়না। ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত রাখার স্বার্থে নিপীড়িত মুসলমানগণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় স্থানে স্থানে মক্তব শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলে রাখে। বলতে গেলে একটা অকাট মুর্খ সমাজ গড়ে তোলাই যেন ইংরেজদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু সুদীর্ঘ আটশ বছরের মুসলীম শাসনামলে তিলে তিলে গড়ে উঠা ধর্মানুভূতিকে এতসহজে বিলোপ করে দেয়া কি সম্ভব। পরিশেষে মুসলীম জনতার চাপের মুখে তদানীন্তন বাংলার ইংরেজ শাসন কর্তা, ওয়ারেন হিস্টিং বাধ্য হয়ে কলকতার শিয়াল দহের একটি ভাড়াটে বাড়ীতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে নামকা ওয়াস্তে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন। অভাব অনটন ও দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে বগুড়া জেলা হতে কলকাতাস্থ ঐ মাদ্রাসায় দু'একজন ছাড়া কেউ লেখাপড়া করার সুযোগ পায়নি। তবে মাদ্রাসাটির পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে বগুড়া জেলার গাবতলী থানার সোন্দাবাড়ীতে সর্বপ্রথম একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.amarboi.org

অতঃপর বগুড়া সদর থানার জোড়া গ্রামে ১৯১০ সালে,ধনুট থানার জোড় খালীতে ১৯১২ সালে এবং শেরপুরে ১৯৩৭ সালে শহীদিয়া আলীয়া মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৯৪০ সালে বগুড়া শহরে মোস্তফাবিয়া আলীয়া মাদ্রাসাটি স্থাপিত হয়। এসব মাদ্রাসার কল্যাণে কয়েক বছরের ব্যবধানে কিছু সংখ্যক আলেম বের হতে থাকেন। এদেরে মধ্যে শেরপুর থানার কৃষ্ণপুর গ্রমের অধ্যক্ষ মাওঃ শামছু উদ্দিনের পিতা- মরহুম মাওঃ ময়েজ উদ্দিন, কাফুরা নিবাসী মাওঃ আবদুল মান্নানের পিতা- মরহুম মাওঃ ইয়াছিন আলী, বাঘড়া নিবাসী মাওঃ মরহুম আবুল কাসেম, মরহুম মাওঃ রইছ উদ্দিন ও টাউন কলোনী নিবাসী মরহুম মাওঃ ইব্রাহীম হোসেন প্রমুখ ছিলেন শেরপুরের প্রবীন ও প্রাচীন আলেমে দ্বীন। এঁদের নিরলস ও নিঃস্বার্থ দ্বীনি খেদমতের কল্যাণে সমগ্র থানায় ক্ষয়িষ্ণু দ্বীনি প্রবাহ ক্রমান্বয়ে গতিশীল হতে থাকে।

১৯৫৯ সালের পুর্বে এ থানায় কোন কামিল পাস আলেম ছিলেন না। এখানে সর্বপ্রথম তিনজন শিক্ষার্থী যথা, অধ্যাপক মাওঃ আবদুল মান্নান, মাওলানা আলা উদ্দিন ও লেখক নিজে এক যোগে কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। বর্তমানে শেরপুর থানায় বিভিন্ন মানের প্রায় সহস্রাধিক আলেম, হাফেজে কুরআন, কারীউল কুরআন রয়েছেন।

এ থানায় ইমাম,মুয়াজ্জিন কেন্দ্রীয় সমিতি নামে একটি শক্তিশালী সংগঠন রয়েছে।

গণস্বাস্থ্য, চিকিৎসা ও চিকিৎসক

পূর্বে আমাদের দেশের স্বাস্থ্য বিধান ও চিকিৎসা ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। সেকালে দেশীয় গাছ-গাছড়ার রস-কষ-নির্যাস ও ছাল-বাকলার বুটি-বটিকাই ছিল একমাত্র ঔষুধ। পরবর্তীকালে আধুনিক চিকিৎসা আবিষ্কৃত হলেও এদেশের জনগণ সহজে তা গ্রহণ করে নিতে পারেনি। কারন, তারা বংশ পরম্বপরায় জড়ি-বুটি ভক্ত হয়ে উঠেছিল- তাই নবাস্কৃত ঔষুধের ক্রিয়া সম্পর্কে রীতমত সন্দেহ পোষণ করত। হাড় বকসা, চিরতা, গুলঞ্চ, নিমপাতা, হড়িতকি, আমলকি, বহেড়া, ত্রিফলা,পিপ্পলী, কন্টিকারী, ইত্যাদি তখন সর্বরোগের ঔষুধ বলে বিবেচিত হতো। হাতুড়ে বৈদ্য-কবিরাজ গণ ছিলেন সেকালের একমাত্র চিকিৎসক। ক্ষয়কাশ, টাইফয়েড, কালাজ্বর, ইত্যাদি জটিল রোগের কোন সুচিকিৎসা ছিল না। কলেরা, বসন্ত, মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে সেকালে গ্রাম বাংলার অসংখ্য লোক অকালে দেহ পাত করত। অগণিত শিশু,মাতৃকা রোগে এবং প্রসূতিগণ উপযুক্ত ধাত্রীপনা অভাবে সূতিকা গৃহেই জীবন ত্যাগ করত। অনুরূপ ভাবে আবহাওয়ার তারতম্য ও অস্বাস্থ্যকর পারিপার্শ্বিকর্তার দরুণ, স্থাণীয় অধিকাংশ বাসিন্দা, বিশেষতঃ লালমাটির লোকজন কৃশও রোগাটে ছিল। অতঃপর আবহাওয়া ও চিকিৎসা ব্যবস্থ্যার ক্রমে উন্নতি সাধিত হওয়ায় জনস্বাস্থ্যের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

www.amarboi.org

হাতুড়ে বৈদ্যযুগের ক্রমাবসানের পর শেরপুরে দু একজন নিমহেকিম আভির্ভূত হন। এদের চিকিৎসা ব্যবস্থা বিজ্ঞান সম্মত না হলেও কিছুটা হেকিমি শাস্ত্রের আওতাভুক্ত ছিল। অতঃপর কবিরাজি চিকিৎসার প্রসার ঘটে। স্বাস্থ্য রক্ষাও স্বাস্থ্যোন্নতি ক্ষেত্রে কবিরাজি চিকিৎসা এক বাস্তব পদক্ষেপ। পরবর্তী কালে এখানে এমন অনেক চিকিৎসক জন্মগ্রহণ করেন, যারা চিকিৎসায় বেশ সুনাম অর্জন করেন। শোনা যায় যে, জনৈক কবিরাজ রোগীর হস্তে সূতা সংযোগ করে উক্ত সুত্রগাত্রে অংগুলি স্থাপন করে নাড়ির স্পন্দন অনুভব করতে পারতেন। মুসলিম আমলে এইসব চিকিৎসককে, হেকিম বা তাবিব বলে আখ্যায়িত করা হতো। ব্রিটিশ ও জমিদারী আমলে এরা কবিরাজ নামে অভিহিত হন। এখানকার প্রাচীন কবিরাজদের মধ্যে বাবু জগদীস চন্দ্র সেন, বাবু তৈলক্ষ নাথ আচার্যি, ব্রজেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি ও মনিন্দ্র নাথ চক্রবর্তীর নাম বিশেষ ভাবে উলেলখযোগ্য। এঁরা সেকালে শেরপুরের সেরা চিকিৎসক হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। পরবর্তীকালে দীর্ঘ দিন যাবৎ কবিরাজি ও ডাক্তারী চিকিৎসার পাশাপাশি চলতে থাকে। কিন্তু এলোপ্যাথি চিকিৎসা ক্রমান্বয়ে ব্যাপকতর এবং এর সেবন বিধি সহজতর অনুমিত হওয়ায় কবিরাজি শাস্ত্রের ভাটা শুরু হয়। দিন দিন বিলেতি ঔষুধের প্রতি লোকজনের প্রবনতা বাড়তে থাকে। এমনি ভাবে কবিরাজি স্থলে অধুনা ডাক্তারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

শেরপুরের প্রাচীন এলোপ্যাথি চিকিৎসকদের মধ্যে ডাঃ গোপাল চন্দ্র সান্ন্যাল, ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র কুন্ডু, ডাঃ রাধিকা নাথসাহা, ডাঃ ধীরেন্দ্র নাথ সাহা, ডাঃ শ্যামসুন্দর চৌধুরী প্রভৃতির নাম স্মরণ যোগ্য। উল্লেখিত ডাক্তার বৃন্দের পর যারা এখানে চিকিৎসায় পসার লাভ করে, তাদের মধ্যে ডাঃ যামিনী মোহন্দ কুন্ডু, এম,বি, ডাঃ সাদেক আলী খন্দকার, ডাঃ আজিজুল হক, ডাঃ মনিরুজ্জামন এল,এম,এফ ও ডাঃ অতুল সান্ন্যালের নাম উল্লেখ্য।

শেরপুরের অধুনাতন এলোপ্যাথি চিকিৎকদের মধ্যে ডাঃ কে, এম, রাহ্মাতুল বারী, এম, বি,বি,এস, ডাঃ মরহুম মসিহুর রহমান, এম,বি, বি,এস, ডাঃ মরহুম খাদেম আলী খোন্দকার এমবি,বি,এস, ডাঃ আব্দুল জলিল, এম,বি,বি,এস. ডাঃ মরহুম গোলাম নবী খান-এল, এল,এফ. ডাঃ আশরাফ আলী- এল,এম,এফ প্রভৃতির চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রভূত অবদান আছে।

এখানকার প্রাচীন হোমিও প্যাথি চিকিৎসকদের মধ্যে পরলোকগত ডাঃ অমৃতলাল কুন্ডু এইচ,এম,বি, ডাঃ খগেন্দ্র চন্দ্র মুনসী ও ডাঃ ফজলুর রহমান এইচ,এম,বি অন্যতম। এছাড়া ডাঃ আতিকুল্লা এইচ, এম,বি, ডাঃ হাবিবুর রহমান এইচ এমবি, ডাঃ নজরুল ইসলাম এইচ এমরি ডাঃ মোখতাল হোসেন, ডাঃ গোলাম সবুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ হোমিও প্যাথি চিকিৎসায় সুনাম অর্জন করেছেন।

www.amarboi.org

বর্তমানে আয়ুর্বেদী শাস্ত্রীয় ঔষুধাবলী ব্যতীত, কবিরাজি চিকিৎসা অনেকটা গৌণ হয়ে পড়েছে। শেরপুরের স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি হাসপাতালে রূপান্তরিত হওয়ায় আধুনিক চিকিৎসায় উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। এখানে শেরপুর ক্লিনিক নামে একটি ব্যক্তিগত হাসপাতাল রয়েছে। এ,বি,সি নামে একটি বিশেষ চিকিৎসা কেন্দ্র আছে। এছাড়া শেরপুর থানার উল্লেখযোগ্য বিভিন্ন স্থানে ছ'টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে। এগুলোর অবস্থান নিম্নরূপঃ

(১) গাড়ীদহ উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র
(২) কুসুম্বী (আলতা দিঘী) কেন্দ্র
(৩) বিশালপুর (পেচুইল) কেন্দ্র
(৪) ভবানীপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র
(৫) সীমা বাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র
(৬) সুঘাট (জয়লা জোয়ান) উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র।

উৎপন্ন দ্রব্য হাট-ঘাট, মেলা ও বাণিজ্য

পূর্বকালে শেরপুর থানার অনেক অঞ্চল বনজংগল, ডোবা-নালা ও মজা পুকুরে পরিণত ছিল। প্রাচীন কালে, এখানে প্রতি বর্গমাইলে মাত্র ১০ জন বসবাস করত। বর্তমানে অত্র থানা ঘন বসতি পূর্ণ হয়ে উঠেছে এবং এখন প্রতি বর্গমাইলে প্রঅয় ৮৭১ জন লোক বসবাস করে। সংখ্যানুপাতে মাথাপিছু জমির পরিমাণ এখন দু'বিঘার চেয়ে বেশী নহে। পূর্বে এ থানার সাল্‌ফা পাথারের বিশাল এলাকা জল প্লাবিত হয়ে থাকত। কিন্তু এক্ষণে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে উক্ত এলাকায় প্রচুর ফসল উৎপন্ন হয়ে থাকে। অনুরূপ ভাবে অনেক খাল-বিল সংস্কার ও জংগল উচ্ছেদের দরুন শস্যোদপাদন পূর্বাপেক্ষা বহুগুনে বেড়ে গিয়েছে। মোটা মুটি ভাবে শেরপুরকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ এলাকা বলা যেতে পারে। এখানকার অধিকাংশ ভূমিই উর্বর। করতোয়া নদীর পশ্চিমাংশ, ক্ষীয়ার (ক্ষীরাভ শব্দের অপভ্রংশ) নামে পরিচিত এবং মৃত্তিকা লোহিতাভ। থানার এ অংশে ধান্যই প্রধান উৎপন্ন শস্য এবং সরিষা, কালাই দ্বিতয়ি স্থানীয়। এছাড়া এ অংশে, কচু, ভুট্টা গোল আলূ, কাঠ-বাদাম, লাউ-কুমড়া, ফুটি-তরমুজ, পাট প্রভতিও কিছু কিছু জন্মে।

করতোয়া নদীর পূর্বাংশ পলি (জলের পলাংশ) নামে পরিচিত এবং এ অংশের মৃত্তিকা শ্বেতাভ। পূর্বাংশের উৎপন্ন দ্রব্যাদির মধ্যে ধান,পাট, গম, আলু (শাখা ও গোল) তামাক, মরিচ, বেগুন, করলা, পোটল, তিল, তিষি, সরিষা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, ধনিয়া, কালাই প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আধুনিক যান্ত্রিক চাষাবাদ ও রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে এ অংশের উৎপাদিকা শক্তি দ্বিগুন-ত্রিগুন মাত্রায় বেড়ে গেছে। পূর্বকালে এখানে আউস ও আমনই ছিল প্রধান ধান্য

www.amarboi.org

ফসল। কিন্তু অধিক ফসল ফলাও' অভিযানের পর হতে এখানে বিভিন্ন প্রকার ইরি ((IRRI) International) rice Research tnstitute) বরো প্রভৃতি বহুল পরিমানে উৎপন্ন হচ্ছে। আমন ধান্য দু শ্রেণীতে বিভক্ত যথা- বুনা ও রোপা। বুনা জাতীয় ধান, জলাভূমিতে এবং রোপা অপ্লাবিত অঞ্চলে আবাদ করা হয়।

পূর্বে এখানে প্রায় আঠার রকমের আউস ও তেষট্টি প্রকারের আমন ধান্য আবাদ করা হতো। এক্ষনে আরও নতুন নতুন ধান্য ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণীর ইরি চাষ করা হয়।

রকমারি আউস ধান্য- কাঁচামনি, কৈতর মনি, গড়িয়া, ধলা গড়িয়া, কাদালোচ, কাশিয়া পাঁজা, গড়পা, দাঁড় কিসইল, থুবড়া, বলুন, ভাদাই, বঞ্চনা, সমুদ্র, ফেনা,সরষাভূতি, শাটিয়া, আতুরা, ইন্দা ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার আমন ধান্য সুখরাজ শালনা, চেংগা মাগুড়ী, খুমন,কনকচুড় উকুন মধু শালনা, দলকচু, আশিনা, কার্তিক শাইল, জনকড়াই,বীরা, গাঞ্জিয়া, নাগদুম, পংখীরাজ, গজাল গড়িয়া, সামরাশ-কনসকলম, বাঁশী কলম, কলা গাছি, টিকাফুল শালনা, শংকর মুগী, মইলসারা, সরল বাঁশী, লোহাচুড়, জাটা পানীয়া মাগুড়ী, শূল পাইন, সিংগারা, বানিয়ামুগী, শাওন, ক্ষীরা, মাপাত, শালনা, কেশর কুলী, কাকড়া, বাসফুল শালনা, মাদারজটাধারী, আপচিয়া, মাগী, কয়াড় ভোগ,কাটারি ভোগ, শূলি, শইলজটা, ফুল গাঞ্জিয়া, হাতুয়া মাগুড়ী, বেতা, সূর্য মনি, ধান কামারী, মহেশবাতান, শালনা, পান্থি, হুলদগড়, হলিদাজাতন, বিলাত কলম, রাইমুগী, গলাধরিয়া, মিহিশালনা, কেশর গাছি, ডেমফা, শাইল খাওরী পানি শাইল, পদ্মনাল ও শাটি প্রভৃতি।

শেরপুরের পলি অঞ্চল অপেক্ষা, ক্ষীয়ার এলাকায় ধান্য শস্যের ফলন অপেক্ষাকৃত কম। এখানে বিঘা প্রতি গড়ে ৮/৯ মন ধান জন্মে। তবে এ অংশের চাল সুচিককন ও উন্নত মানের। প্রকাশ থাকে যে, এখান হতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বিভিন্ন প্রকারের ধানের নমুনা লন্ডন ও ভিয়েনায় গবেষনার নিমিত্ত প্রেরীত হয়েছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে "অধিক ফসল ফলাও" অভিযান ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারী পর্যায়ে ব্যাপক গবেষণা চলছে। বর্দ্ধিত ফলন কল্পে নতুন নতুন ধান্য আবিস্কৃত হয়েছে।

শেরপুরের উত্তরাংশ সংলগ্ন মহীপুর বামুনিয়া প্রভৃতি গ্রামে উৎকৃষ্ট ধরনের পান আবাদ হয়। মহীপুরের পান সুস্বাদু বলে বিখ্যাত। খাদ্যাভাব প্রকট হওয়ায় এক্ষনে চাষীগণ ধান্য ফসলকে প্রাধান্য দিচ্ছেন। পূর্বে (১৮৭২ খ্রীঃ) বগুড়ায় জেলায় ৪৯,৫৯৯ একর ভূমিতে পাটের আবাদ হতো। ১৯০৩/৪ খ্রীঃ ৭২,০০০ একর, ১৯০৪/৫ খ্রীঃ ৭৩২,৩০০ একর এবং ১৯০৭/৮ খ্রীষ্টাব্দে ২০০.০০০ একর জমিতে পাটের চাষ করা হতো। বর্তমানে শেরপুর থানার সর্বমোট ৭,৪৪৯৫ একর জমির মধ্যে ৪৪,৫০০একরে ধান্য ১২০০ একরে পাট অবশিষ্ট অন্যান্য ফসল হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

ফল-মুলঃ- এখানকার ফল মূলের মধ্যে আম, জাম,লিচু, কাঁঠাল, বেল, কলা, আনারস, তাল, খেজুর,ও খেজর রস, বাতাবী লেবু,দাড়িম্ব,পেপে, ক্ষীরিকা, তরমুজ, ফুটি, শশা, তেতুল, কুল প্রভৃতি প্রধান। এ ছাড়া শেরপুরের নিকটবর্তী পশ্চিমাংশে বাঘড়া ও হাপুনিয়ার বিল,দুবলা গাড়ী প্রভৃতি জলাভূমি রয়েছে। সেকালে পশ্চিামাংশের ক্ষীয়ার ভূমির প্রায় সকল স্থানেই মাঝে মাঝে ছোট বন ও ঘন ঝোপ জংগল পূর্ণ ছিল। এক্ষনে ঘন জনবসতি হওয়ায় আর কোন জংগল পরিদৃষ্ট হয় না। পূর্বকালে শেরপুরের উত্তর প্রান্তে বুড়িতলা হতে বগুড়া পর্যন্ত সদর রাস্তার উভয় পার্শ্বের উচু ভূমিতে প্রচুর তুতেঁর আবাদ ছিল বলে জানা যায়। আজ হতে প্রায় সপ্ত যুগ পূর্বে এখানকার তুঁত চাষ রহিত হয়ে যায়। এখন বগুড়াস্থ সুলতানগঞ্জ ব্যতীত, এ জেলার অন্য কোথাও আর তুতের চাষ নাই।

পানীয় জলঃ- পূর্বকালে এখানকার লোকজন নদী-লালা, খাল-বিল ও ডোবার পানি পান করত। পরবর্তীকালে পর্যায় ক্রমে মেটে কূপ,পাত কূপ, ইন্দারা প্রভৃতি হতে পানীয় জল সংগ্রহ করা হতো। এক্ষণে মেটে কুপ ও ইন্দারা নেই বল্‌লেই চলে। পরিবর্তে ব্যাপক নলকূপ ব্যবহৃত হচ্ছে।

জল সেচ ব্যবস্থাঃ- ক্ষীয়ার অঞ্চলে, সর্বকালেই জলসেচের প্রয়োজন ও প্রচলন ছিল। শুষ্ক জমি জলসিক্ত করে আবাদোপযোগী করার জন্য সেকালে এবং স্থান বিশেষে একালেও ডোংগা ও সেঁউতি দ্বারা নদী বা পুকুর হতে পানি সিঞ্চন নিস্কাসন হয়ে আস্‌ছে। তবে আগেকার দিনে করতোয়া নদীর পূর্বাংশ, পলি ভূমিতে জল সিঞ্চনের কোন প্রচলন ছিল না। বর্তমানে যান্ত্রিক উপায়ে জল সেচের ব্যবস্থা হওয়ায় ডোংগা ও সেঁউতির ব্যবহার বহুলাংশে কমে আস্‌ছে। এখন পলি অঞ্চলেও যান্ত্রিক উপায়ে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে- কারণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণের ফলে এ অংশে আর প্লাবণের পানি প্রবেশ করে না। তাই যান্ত্রিক উপায়েই পানি সরবরাহ করা হয়ে থাকে। অভিজ্ঞ মহল আশংকা প্রকাশ করছেন যে স্থায়ী ভাবে বন্যার জল রহিত থাকলে পূর্বাঞ্চলে দূর-ভূবিষ্যতে মরু ভূমিতে পরিণত হতে পারে। ক্ষীয়ার এলাকায় নিয়মিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকলে আশানুরূপ ফসল উৎপন্ন হবে। কয়েক বছর পুর্বে মিরযাপুরে একটি স্থায়ী জল সিঞ্চন কল স্থাপিত হয়েছে। এর ফলে উল্লেখ যোগ্য পরিমান জমিতে বিভিন্ন মওসুমে ইরি, বরো ধান চাষাবাদ চলছে। তবে করতোয়া নদী ভরাট হয়ে যাযওয়ায়, এক্ষণে জল সেচ ভীষণভাবে বাঁধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

আজ হতে প্রায় সোয়া'শ বছর পূর্বে, ধনুটে প্রচুর নীলের চাষ হতো। বিলেতি সাহেবেরা নীল চাষের ফাঁদ বিস্তার করে, এদেশের দরিদ্র প্রজাদের উপর অকথ্য নিপীড়ন চালিয়েছে। তৎকালে ধনুটে আটটি নীল কুঠি ছিল। অনুরূপ ভাবে শেরপুর ও গাড়ীদহের মধ্য বর্ত্তী স্থানে একটি আদর্শ নীল কুঠি স্থাপিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

www.amarboi.org

হাটবাজার

শেরপুরের প্রাচীন হাট বাজারের মধ্যে শেরপুর বারদুয়ারী হাট,মিরযাপুর ও অধুনালুপ্ত গাড়ীদহের হাট প্রসিদ্ধ। বর্তমানে আরও কয়েকটি নতুন হাট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যথা- কুসুম্বী, দলসারা, ঘোঘাও রানীনগর হাট। পূর্বের ন্যায় বারদুয়ারী হাট এখনও সোমবার ও বৃহস্পতি বারেই বসে থাকে। মিরযাপুর হাট পূর্ব আমলে রবিবার ও বুধবারে বস্‌তো- কিন্তু এক্ষণে উহা শনিবার ও বুধবারে অনুষ্ঠিত হয়। এথানার আরও দুটি উল্লেখযোগ্য হাট চান্দাইকোনা ও ভবানীপুর হাট। চান্দাইকোনা হাট দু অংশে বিভক্ত- বগুড়া বাজার ও পাবনা বাজার। গাড়ীদহ হাটটি বর্তমানে আর বসেনা। এছাড়া জামুন্না, ফুলজোড়, কল্যানী, গুয়া গাছিওখানপুর গ্রামে ও হাট বসে। উল্লেখিত হাট সমূহে নিত্য প্রয়েজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী ও রফতানী হয়ে থাকে। বারদুয়ারী, মিরযাপুর ও চান্দাইকোনা হাটে অন্যান্য দ্রব্য ছাড়া বিপুল সংখ্যক গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশু আমদানী হয়। এক সময় শেরপুরের বিভিন্ন হাটে কাছিম-কচ্ছপ আমদানী হতো।

দৈনিক বাজার

শেরপুরের গাবতলা বা মথুরা মহলের বাজার প্রত্যহ পূর্বাহ্নে বসে থাকে। পূর্বে সান্ন্যাল পাড়া ও হটিলতালায় দুটি সান্ধ্য বাজার বস্‌তো। এক্ষণে উক্ত বাজারদ্বয় উঠে গিয়েছে এবং তৎপরিবর্তে সন্ধ্যা বাজারটি এখন পৌরসভার সান্যালপাড়ায় স্থায়ীভাবে বসে থাকে।

মেলা

শেরপুর হতে এক ক্রোস পশ্চিমে মাদার পীরের মতান্তরে গাজি মিঞার পর্বোপলক্ষ্যে কেল্লা পুষীতে তিন দিন স্থায়ী একটি জাঁকাল গণ মেলা বসে থাকে। পূর্বে অত্র মেলায় উর্দ্ধসংখ্যক ৭/৮ হাজার লোকের সমাগম হতো। বর্তমানে উক্ত মেলায় প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়ে থাকে। সাধারণত ইহা কেল্লা-কুশী নামে পরিচিতি। কিন্তু মতান্তরে ইহা কেলায়ে পূষী বলে অভিহিত। ইহা একটি গণমেলা। প্রতি বছর জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় রোববার হতে মংগলবার পর্যন্ত, তিন দিন ধরে এই গণ মেলাটি বসে। কেনা-কাটা ও বেচা-কেনার তাগিদেই অনেক লোকজন অত্র মেলায় যোগদান করে বটে, কিন্তু সৌখীণ বাবু, নতুন জামাই ও ভবঘুরেদের সমাগমই এখানে অধিক বলে প্রতীয়মান হয়। এ মেলা সম্পর্কে একটি প্রাচীন প্রবাদ আছে-

"কেল্লা-পুষী মেলার রাজা
মাদার পীরের চামর পূজা,
মেলা নয়তো, ঠেলার বাজার,
লোক জমে যায়, হাজার হাজার,
মেলা নামের ফাঁক
কেবল কিচড় পাঁক"

www.amarboi.org

মেলাটির নাম কেল্লা কুশির পরিবর্তে কেলায়ে পোষি হওয়াই যুক্তিসংগত। কারণ এ মেলাটি মাদার পীরের আস্তানার নামানুসারে এবং তার স্মৃতি রক্ষার্থেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কথিত আছে যে, পূর্বকালে (১৫৫০-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) পশ্চিম মুল্লুক হতে একদল বীর মুজাহিদ ইসলাম প্রচারার্থ এখানে আগমন করেন। আগত এই কাফেলাটি শাহ্ মাদারের দল বলে পরিচিত। আলোচ্য কাফেলাটি বর্ণিত মেলার স্থানে সর্বপ্রথম চামড়ার ছাউনী (পোষি) দ্বারা আস্তানা বা কেল্লা স্থাপন করেন। তাই এর নাম কেলায়ে পোষি বা অপভ্রংশে কেল্লা কুশি হয়ে থাকবে। সমগ্র বগুড়ায় এটি প্রাচীনতম মেলা। মুসলমান সুফী-সাধক বিশেষের নামে, প্রবর্তিত এতদঞ্চলে এটিই একমাত্র মেলা। বাস্তব প্রস্তাবে কোন সুফী-সাধক, মেলা ভিত্তিক ধর্ম মত প্রচার করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ মেলা প্রবর্তনের মুল কাহিনীটাই বানোয়াট মাত্র। বদর পীর,মাদার পীর, ঘোড়াপীর, ন্যাড়া পীর, চোংগাপীর, ভিটা পীর, ইটাপীর প্রভৃতি সাধকদের কোন প্রমাণ্য ইতিহাস নেই।

কেল্লা পোষি মেলাটি কালবৈশাখীর শেষ পর্বে অনুষ্ঠিত হওয়ায় প্রায় প্রতি বছরই ঝড়-বাদলার কবলিত হয়ে থাকে এবং এর ফলে স্থানটি পংক-পাঁকে ভর্তি হয়ে যায়। এই মেলার বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য, কাষ্ঠ নির্মিত আসবাব, মিষ্টি মিষ্টান্ন, ছাতা, জুতা, ট্রাংক, তোরঙ্গ প্রভৃতি সৌখীন দ্রব্যাদি আমদানী হয়ে থাকে। পূর্বকালে অত্র মেলায় বার বণিতাদের খেলা ও চলতো। কৌতুহলী দর্শকদের জন্য এখানে সার্কাস, বাজীকরণ, ঐন্দ্রজালিক খেল-তামাশা প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়ে থাকে। সর্বোপরি চামর মন্ডিত মাদারের বংশ দন্ডের উৎসবই কেলায়ে পোষি মেলার এক বিচিত্র আকর্ষণ। মূলতঃ ইহা বংশদন্ড পুজারই নামান্তর মাত্র। কুসংস্কার বিমুক্ত? বিংশ শতাব্দীতে কুসংস্কারাচ্ছন্ন চামরপুজা আজও যে চলছে, তা ভাবতেও অবাক হতে হয়। ইসলামী বিধান মতে এ প্রকার আনন্দোৎসব কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ। এতদসত্বেও কতিপয় জাহেল অজ্ঞের দল এ প্রথাটি পালন করে আস্‌ছে। ব্যবসায় বানিজ্য ক্ষেত্রে মেলাটির গুরুত্ব কম নহে। তবে এর দ্বারা সামাজিক যে কুসংস্কার বিস্তৃত হচ্ছে, সেটিও উপেক্ষনীয় নহে। মাদার পূজা সম্পর্কে বগুড়ার ইতিহাস প্রনেতা জনাব কে, এম,মিছের সাহেবের বক্তব্য নিম্নরূপ- "প্রবাদ প্রচলিত যে, মাদারের আগমনের পরবর্তীকাল হইতে এ দেশে ইসলাম সমাজে নানা প্রকার কুপ্রথার প্রচলন ও বাঁশ পূজা, চৈতন রাখা, কপালে তিলক কাটা, পাথর পূজা, ঘোড়া ও হাতী পূজা, পীর পূজা, ওরস, কবরে চেরাগী, বুড়ি পূজা, সত্য পীরের পূজা, সিন্নী মানত, মাদারের ওঠ, কাজী সাহেবের খানা, অসংখ্য অনৈসলামিক মুসলিম বিশ্বাস ও আচার বিরুদ্ধ প্রথা প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র কারণ, তৎকালীন মোগল সম্রাটের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের কুফল, যদিও মোগল বাদশাহের শাসণ ও শৃংখলা প্রশংসনীয় ছিল। এই যুগের প্রারম্ভে ইসলামের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাদশাহ আকবরের কাল্পনিক মতবাদ, দ্বীন-ইলাহী ধর্মের স্রোতে মুসলমান সমাজের শরীয়তী ইসলাম, লৌকিক ইসলামে পরিণত হইয়াছিল।

www.amarboi.org

সপ্তম অধ্যায়

পীরপাল, প্রাকৃতিক সম্পদ, আমদানী রপ্তানী-ইত্যাদি

যদিও বাদশাহ আকবর সুন্নি মুসলমান রূপে বাল্যকালে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, তথাপি হিন্দু স্ত্রীদের সাহচর্য্য ও হিন্দু পারি পার্শ্বিকতার দরুন তাঁহাদের ধর্মীয় প্রভাব এড়াইয়া উঠিতে পারেন নাই। শোনা যায় মাদারের দাপটে দেশে হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছিল। তৎকালে মুসলমানেরা আল্লাহকে ভূলিয়া সম্ভবতঃ মাদারের সম্মান রক্ষার্থে প্রতি পরগনায় মোগল সম্রাটগন লাখেরাজ (নিষ্কর) জমির ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, যাহা গ্রামের লোকেরা পীর বা মাদেরর ভূমি বলিয়া তাহার উপস্বত্ব দিয়া বাঁশ পূঁজা ও গওয়ারাদি করিতেন"-৪০২ পৃষ্ঠা

শাহ- মাদার ও এই শ্রেনীর অসংখ্য পীর? এক সময়ে এদেশে ব্যাপক প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন সত্য,কিন্তু তাঁদের দ্বারা সামাজিক কোন উল্লেখযোগ্য কল্যাণ সাধিত হয়েছিল বলে মনে হয়না। বগুড়া জেলার এখানে সেখানে আজও অনেক পীর পাল স্বত্ব সংরক্ষিত রয়েছে। বগুড়া সদর থানার অন্তর্গত দাঁড়িকামারী গ্রামে একটি প্রাচীন দরগাহ পরিদৃষ্ট হয়। ইষ্টক নির্মিত ক্ষুদ্র প্রকোষ্টময় এ দরগাহটি সাধারণ্যে পীর পালের আস্তানা বলে পরিচিত। এসব দরগাতে অজ্ঞ লোকেরা চেরাগীও ভোগ দিয়ে থাকে।

এদেশে আগত এই পীরদল সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা না গেলেও একটি বিষয়ে আমরা একমত হতে পারি যে, এঁরা কোন বৈষয়িক লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে এতদ্দেশে আগমন করেননি- কারণ, এতদ্দেশে এঁদের কাউকে বৈবাহিক অথবা কোন ওয়ারিশ সূত্রে জড়িত দেখা যায়না। এঁরা একক ভাবে এসেছিলেন এবং ব্যক্তি বিশেষের তিরোভাবের পর, তার কার্যক্রমের পরি সমাপ্তি ঘটেছে। এঁদের কেউ কেউ বাউল পন্থী, কেউ বা নানক কবিরের ভাবশিষ্য অথবা সুন্নী মতবাদ ব্যতীত অন্য মতাদর্শের প্রবক্তা ছিলেন। এঁদের সম্পর্কে আমরা আরও একমত পোষণ করতে পারি যে, এঁরা তৎকালীন সরকারের বিশেষ সাহায্য পুষ্ট ছিলেন। কারণ এঁদের প্রত্যেকেই কোন না কোন লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। বগুড়ার ইতিহাস প্রনেতা কে,এম, মিছের সাহেব এঁদের নামে বরাদ্দকৃত পীর পালের যে সংখ্যা উল্লেখ করেছেন, তা নিম্নরূপ "বগুড়া কালেকটরী রেকর্ডে আটশত সাতষট্টি টি, ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে জমিদারী বিবরনীতে দুই হাজার সাতশত,দাবীকারী পীর পালের উল্লেখ দেখা যায়। প্রকাশ থাকে যে, স্থানে স্থানে তাঁহাদের ধর্মমত প্রচারের নিমিত্ত উক্ত পীরপাল, আয়মা নিষ্করের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মুসলমান বাদশাহ ও নওয়াবের উদারতায় হিন্দু সমাজে দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, মহাত্রান, সন্ন্যাসোত্তর, বৈদ্যোত্তর ও বৈষ্ণবোত্তর ও উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের জামিদারীর রিটার্নে উল্লেখিত দেবোত্তরের সংখ্যা ১৭০৭টি বিষ্ণুত্তোর ২১টি বিষ্ণুবৃত্তি ৩টি শিবোত্তর ৬৯ টি।" এখানে উল্লেখ্য যে ইসলাম প্রচারার্থ প্রাক-মুগল যগে যে সব বী

www.amarboi.org

মুজাহিদ এতদ্দেশে আগমন করেছিলেন তাঁদের কেউ সরকারী সক্রিয় সাহায্য প্রাপ্ত তো দূরের কথা, সামান্যতম মৌখিক সহানুভূতিও পাননি। তাঁরা নিঃস্বার্থ ভাবে আগমন করেছিলেন এবং জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও ইসলাম প্রতিষ্ঠা কল্পে চেষ্টা করেগিয়েছেন। এঁরা ছিলেন ইসলামের প্রকৃত সৈনিক এবং এদের প্রচারিত মতবাদ ছিল নির্ভেজাল ও গোজামিল বিবর্জিত। শতশত বছর পরেও এঁদের মতবাদে এতটুকু অনিয়ম বা ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। তাইতো যুগ যুগ ধরে অযুতকণ্ঠে এঁদের নাম ধ্বনিত এবং অগনিত ভক্ত এঁদের জেহাদী প্রেরনায় আজও উদ্বুদ্ধ। এ দলের যারা পুরধা ছিলেন তন্মধ্যে বাবা আদম, শাহ তুরকান, শাহ সুলতান মাহী সাওয়াব, শাহ জালাল, শাহ বন্দেগী, শাহ ফতেহ আলী, পীর বাবা শাহ মাখদুম প্রমুখ অন্যতম।

কিন্তু সুলতানী উত্তর কালে,বিশেষতঃ মুগল সম্রাট আকবরের যুগে যারা এসেছিলেন, তাদের কার্য কলাপ ও প্রচারনীতি ছিল সম্পুর্ন ভিন্নতর। তদানীন্তন ভারতেশ্বর মহামতি আকবর ইসলামের সনাতন মতবাদকে জলাঞ্জলী দিয়ে জগা খিচুড়ী প্রসূত যে পাঁচ মিশালী দ্বীনে এলাহী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা দীর্ঘ স্থায়ী না হলেও সুন্নী মতবাদ ঘায়েল করার পক্ষে উহা যে এক সুদূর প্রসারী পদক্ষেপ ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ ভিত্তিহীন দ্বীনে ইসলাহীর ছত্র ছায়ায় আশ্রিত হয়ে, কতিপয় ভিন্ন মতালম্বী প্রচারক, এদেশে আগমন করলে বাদশাহ তাদেক মোক্ষম বাহন রূপে, স্থানে স্থানে মনগড়ানীতি প্রসার ও প্রচারার্থ প্রেরণ করেন। খুব সম্ভব এরা সবাই ছিলেন শিয়া মতালম্বী।" তাই, দিকে দিকে ঘোড়াপীর, তেনাপীর, উইপীর, লেংটি পীর, হাতী পীর, পাঞ্জা পীর, বাঘপীর, ইটাপীর, ভিটাপীর, (বাস্তপীর). চোঙ্গাপীর, লেঙ্গাপীর, বুড়া পীর, ন্যাড়াপীর, প্রভৃতির বিপুল সমাবেশ ঘটে। এই সময়ে সাধারণ মানুষ, একত্ব বাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল হেতু, কথিত পীরদের নামে শক্তি পূজার আখরা গ্রামে গ্রামে গড়িয়া উঠে।। তাই দেখা যায়, যিনি ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতেন, তিনি ঘোড়াপীর নামে পরিচিত। যিনি হাতীতে বা উঠে আরোহন করিতেন তাহাকে বলা হইত হাতীপীর বা উষ্ট্রপীর। বাঘের সোওয়ারী পীরকে বলা হইত বাঘাপীর। তেনা পরিহিত পীর, তেনা পীর নামে, যিনি চোঙ্গা লইয়া দ্রব্যাদি ভিক্ষা করিতেন তিনি চোঙ্গা পীর নামে, যিনি লাঙ্গা বা উলঙ্গ থাকিতেন তিনি লাঙ্গা পীর নামে পরিচিত ছিলেন। ---------- অদ্যাবদি পাড়া গ্রামের অজ্ঞ জন সাধারন এই সব পীরের স্মারক প্রস্তত করিয়া বিবিধ সিন্নী সালাৎ ও পূজা পার্বন করিয়া থাকে।----- যাঁহাদের মাথায় একটি ঝুটি থাকিত তাহাদিগকে বলা হইত ঝুটি পীর। তাঁহাদের তিরোধানের পর এই সবের সমন্বয়ে মাদারের পাঞ্জা বা নিশানের পূজা জন্ম লাভ করে। ঝুটির অনুকরণে বাঁশের মাথায় চামর বাঁধিয়া নাচাইবার প্রথা প্রবর্তিত হয়। মা ফাতেমার বা বিবি সাহেবানীই হইতেছে এইসব পূজার উৎস। গাজীপীর, হটিলার পীর, একদিল, সত্যপীর, মাদার পীর, সবই কুসংস্কার জাত পীর।"------পাদটীকা, বগুড়ার ইতিকাহিনী, কে এক মিছের ৪০৩ পৃষ্ঠা।

www.amarboi.org

এখানে উল্লেখ যে বর্ণিত পীর? সমূহ অজ্ঞ মুসলমান ও হিন্দু জাতি নির্বিশেষে অনেকেরই পূজা ও ভক্তির পাত্র। সূতরাং এদেরকে দ্বীনে ইলাহীর স্থলাভিষিক্ত, উদগতা বল্‌লে মোটেই অত্যুক্তি হবেনা। অধূনা সুসভ্য সমাজে কবরে পুষ্পমাল্য অর্পণের যে রেওয়াজ প্রচলিত হয়েছে তাও, এই পীর পূজারই ফল শ্রুতি। এমনকি বাতেল পন্থী পীরদের ইটা, ভিটা অতিক্রম করে এই পীর পূজা, এখন প্রকৃত অলি, আওলিয়ার পবিত্র মাজার পর্যন্ত ছেয়ে ফেলেছে। অজ্ঞ লোকেরা, নবজাত শিশুর আকিকা ও অন্যান্য মতলব সিদ্ধির জন্য মাজারে খাসী, মুরগী মান্নত করে থাকে। কেউ কেউ মাজারের ধূলা বালি মস্তক ও কপালে মর্দ্দন করে। অনেকে আবার লাস্যময়ী যুবতীদেক নিয়ে মাজার অংগনে মিনা বাজার আরাস্তা করে থাকে। এ সব কার্যকলাপ যে ডাহা শেরক, এতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। অথচ অসংখ্য মুসলমান অবলীলাক্রমে, এসব কাজে জড়িয়ে পড়ছে। অনুরূপ ভাবে মাজার পুজারী কতিপয় ভেকধারী মানুষ, সেবা কার্যের বাহানা করে কবর পূজাকে উৎসাহিত করছে। এরা মাজারে প্রদত্ত অর্থের সিংহভাগ পেয়ে থাকে। শেরক্ অবলম্বন করলে সব কাজ হাসিল না হলেও কোন কোন উদ্দেশ্য সফল হওয়া বিচিত্র কিছু নহে। কিন্তু এ কাজটি কবর অঙ্গনে না করে তুলসীতলা, কদমতলা অথবা যে কোন তুচ্ছ বৃক্ষ মূলে করলেই যথেষ্ট। কারণ, শেরকের চেয়ে মহাপাপ আর দ্বিতীয়টি নেই। অনন্ত পরকালকে উপেক্ষা করে যারা পার্থিব ক্ষুদ্রতম উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য, শেরকের মত জঘন্যতম পাপ কাজে লিপ্ত হতে পারে, তাদের দু' একটি টুকি টাকি কাজ না হয়ে পারে কি? কেল্লা পোষী মেলা ব্যতীত জামুন্নাতেও প্রতি বছর অনুরূপ একটি গণমেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। তবে এ মেলাটি শাহ মাদারের মত কোন পীরের নামে উৎসর্গীকৃত নহে। জামুন্না মেলার গন জমায়েত অপেক্ষাকৃত কম এবং এটি কেল্লা পোষী মেলার কয়েকদিন পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়। এতদ্ভিন্ন হিন্দু পর্বোপলক্ষে, শেরপুর নদী তটে দুটি বারনী মেলা বসে। বারনী দিনে হিন্দু ললনা কুল করতোয়া স্নানে ধন্য হয়ে মেলা উপভোগকরে। এসব মেলায় হিন্দুয়ানী দ্রব্যাদি ছাড়া, লোহার দা কাটারী ইত্যাদি পাওয়া যায়। শ্রী পঞ্চমী উপলক্ষ্যে পূর্বকালে মুনসী বাবুদের বাড়ীর নিকট পনের দিন স্থায়ী একটি মেলা বস্‌তো। উক্ত মেলায়, জামা,জুতা, বাসন-কোসন, মনোহারী দ্রব্য ও কাঠের খাট, চৌকি প্রভৃতি আমদানী হতো। এছাড়া আষাঢ়ে, গুঞ্জা বাড়ীর রথের মেলা, আশ্বিণে দুয়ারীর বিজয় দশমীর মেলা, কচুর ঘাটে লক্ষীর মেলা, হরির মাঠে জগদ্ধাত্রীর মেলা, ও গোঁসাই ঘাটে বাসন্তীর মেলা অনুষ্টিত হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

শেরপুরের আমদানী ও রফতানী

পূর্বকালে এখান হতে প্রচুর দ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হতো এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্য বিদেশ হতে আমদানী করা হতো। বর্তমানে এখানকার উৎপন্ন সামগ্রী ও পন্যজাত দ্রব্যের ঘাটতি বই বাড়তি নেই। অথচ এখনও পূর্ববৎই এখান হতে দ্রব্যাদি রপ্তানী হয়ে থাকে। মওসুম কালে এখানকার কৃষককুল, নির্বিচারে প্রচুর ধান, পাট, আলু, বেগুন, সরিষা, মুগ-মুশুর প্রভৃতি রপ্তানী করে থাকে। এখান কার সরার দৈ দেশের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হয়। আমদানী দ্রব্যাদির মধ্যে কৃত্রিম সার, ঔষুধ, নারকেল, কাপড় চোপড়, জুতা-মুজা, ছাতা, গরু গাড়ীর চাকা, প্রসাধনী দ্রব্য তেল,তামাক ও মনোহরী দ্রব্য, কাগজ,কলম,কলকার খানার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি প্রধান।

খনিজ দ্রব্য

সাধারনতঃ লোহিত মৃত্তিকাময় স্থানে লোহ খনির সম্ভাবনা থাকে। শেরপুরের মাটি খনন কালে অনেক লৌহ মিশ্রিত অনু কনা পরিলক্ষিত হয়। আইনে আক বরী মতে বাজুহা সরকারের মধ্যে লৌহ খনির অস্তিত্ব ছিল বলে উল্লেখ আছে। তবে শেরপুরের কোন্ অংশে উহা বিদ্যমান, তা নির্ণয় করা কঠিন। বিগত ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এতদঞ্চলে খনিজ দ্রব্য আবিস্কার কল্পে একটি পরীক্ষা মূলক জরীপ হয়েছে। এর ফলাফল আজও অপরিজ্ঞাত।

মুক্তা

পূর্বে এদেশের ঝিনক ব্যবসায়ীগণ করতোয়া নদী ও অন্যান্য খাল বিল ও ডোবা পুষ্করিনী হতে ঝিনুক উত্তোলন করতো। উহা হতে প্রচুর পরিমাণ মুক্তাসংগ্রহ করতো। তবে স্থানীয় ব্যাবসায়ী গণ মুক্তার ব্যবহার জানতনা বলে উহা স্বল্প মূল্যে অন্যত্র চালান করা হতো। "সেতিহাস বগুড়া বৃত্তান্ত গ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে যে" চারি আনা কি পাঁচ আনা দিলে এক ভরি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতি পাওয়া যায়। এদেশের অনেক বৈদ্য ঐ সকল ক্রয় করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করে।" বর্তমানে ঝিনুক সংগ্রহের কাজ অব্যাহত থাকলেও ঝিনুক হতে মুক্তা নিষ্কাষনের ব্যবস্থা নেই বল্লেই চলে।

ঘুটিং

শেরপুরের লাল মৃত্তিকাময় স্থানে স্থানে প্রাচীন দীঘি ও নদী পাড়ের মাটিতে পূর্বে ঘুটিং নামক এক প্রকার কংকর বা প্রস্তর খন্ড পাওয়া যেত বলে উল্লেখ আছে। উক্ত কংকর বা প্রস্তর পোড়ালে উৎকৃষ্ট ধরনের চূন তৈরী হত। পাকা ঘর বাড়ীর কাজে এই ঘুটিং এর চুন ব্যবহৃত হতো বলে জানা যায়। বর্তমানে এই ঘুটিং জাতীয় উপকরন পাওয়া যাবে কি-না, তা পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

www.amarboi.org

বন্যজন্তু

পূর্বকালে শেরপুরে প্রচুর বনজ সম্পদ ও বন্য জীব জন্তু পরিলক্ষিত হতো। এখানকার জংগলে অসংখ্য চিতা নাগেশ্বরী বাঘ, বন্য শুকর, সজারু প্রভৃতি জন্তু বাস করত। শেরপুরের পশ্চিমাংশ সংলগ্ন তদানীন্তন হাপুনিয়ার অরণ্যে অনেক ময়ুর বিচরণ করত বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। বর্তমানে অরণ্য শূন্য হওয়ায় কোন হিংস্র জীব জন্তু আর পরিলক্ষিত হয়না। পূর্বকালে এখানে ব্যাঘ্রের এমন উৎপাত ছিল যে বন্দুক ও লাঠি শোটা ব্যতীত জংগলে প্রবেশ সম্ভব হতোনা। কথিত আছে যে একবার শেরপুর শহরের জনৈক মহাজনের মেটে কোঠার ছাঁদে একটি চিতা বাঘ লুক্কায়িত ছিল। গৃহস্বামী কোন কার্যোপলক্ষে ছাঁদে আরোহণ করলে, আচমকা তার দৃষ্টি ব্যাঘ্রের উপর নিপতিত হয়। তিনি জন্তুটিকে শাল্না বা গন্ধ গকুল ভেবে সজোরে আঘাত করেন। আর যাবে কোথা! অমনি ব্যাঘট্রি তার ঘাড় মট্কে দেয়। অতঃপর নরখাদকটি ছাঁদ হতে লম্প দিয়ে পালাতে থাকে। পার্শ্ববর্তী লোকজন, নরঘাতক বাঘটির পেছনে ধাওয়া করলে সে আরও ২/৩ মানুষকে হত্যা করে জংগলে পালিয়ে যায়।

বনজ সম্পদ

পূর্বকালে শেরপুর ও পাঁচবিবি থানায় শালবন ছিল বলে কথিত আছে। পরবর্তী কালে নির্বিচারে শালবৃক্ষ কর্তন করায় বনগুলি ক্রমান্বয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বিগত ১৯৬১ ইং সালে সরকারী উদ্যোগে একটি আঞ্চলিক বন বিভাগ (বৃক্ষচারা বিতরন কেন্দ্র) স্থাপিত হওয়ার স্থানে স্থানে কিছু কিছু মুল্যবান বৃক্ষ উৎপন্ন হচ্ছে। অত্র কেন্দ্র হতে প্রতি বছর জুলাই আগষ্ট মাসে নাম মাত্র মূল্যে প্রচুর পরিমান, শাল, জারুল, মেহগনি, শিশু প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষের চারা রোপনোপলক্ষে বিতরন করা হয়। পূর্বে এখানকার জংগলে প্রচুর বেত উৎপন্ন হতো। এখানকার পাটনীরা বেতদ্বারা ধামা, কাঠা, পাল্লা, চেয়ার, পালকী, বেত্রাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করতো। এক্ষনে বেতস বন উচ্ছেদ হওয়ায়, খেজুর পত্রদ্বারা কিছু কিছু নিম্নমানের পাটী তৈরী হয় মাত্র। এখানে শিমূল বৃক্ষ হতে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হয়। পূর্বে পলাশ বৃক্ষ ও পুষ্প ও কাঠাল বৃক্ষ দ্বারা রেশমের রং করা হতো। পূর্বে মহীপুর জংগলে পাটীর গাছ জন্মিত এবং বিভিন্ন জলাশয়ে মাদুর নির্মানোনোপযোগী এক প্রকার চারা উৎপন্ন হতো। এতদ্ব্যতীত এখানে নানা জাতীয় আম, জামলিচু, তাল, বেল, কুল, খেজুর, পেয়ারা, সুপারী, কিছু কিছু নারকেল প্রভৃতি জন্মে। এছাড়া বন-হরিদ্রা, গুলঞ্চ, গজপিপ্পলী শতমূল, অনন্তমুল, ক্ষেতপাপড়া, অর্জ্জুন ও ভেষজ গাছ গাছড়া ও এখানে উৎপন্ন হয়।

www.amarboi.org

রেশম শিল্প

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে শেরপুর এককালে রাজশাহীর অন্তর্ভূক্ত ছিল এবং উক্ত জেলার তত্বাবধানে তৎকালে এখানে ব্যাপক রেশম চাষ করা হতো। রেশম কীটের সংস্কৃত নাম পুন্ডরীক। এই পুন্ডু "থেকে পোড়ু" অতঃপর পলুতে পরিণত হয়ে থাকবে। বগুড়া অঞ্চলে রেশম কীটকে পলু বলা হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হ্যামিল্টনের ইষ্ট ইন্ডিয়া গেজেটিয়ারে লিখিত আছে যে তদানীন্তন অবিভক্ত ভারত বর্ষের উৎপন্ন রেশমের $\frac{৪}{৫}$ অংশ একমাত্র রাজশাহীতেই উৎপন্ন হতো।

১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শেরপুরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর একটি রেশমের কুঠিছিল। অধূনা লুপ্ত "বানক বাড়ীর জংগল" কে লোকেরা আজও রেশমের কুঠি বলে আখ্যায়িত করে। বর্তমানে একমাত্র বগুড়া শহর ব্যতীত এ জেলার জন্য কোথাও রেশমের চাষ নেই।

মৎস্য ও মৎস্য জীবি

শেরপুরের খাল-বিল,নদী-নালাও পুষ্করিনীতে পূর্বে বিভিন্ন শ্রেনীর মৎস্য পাওয়া যেত। শেরপুরের ভস্তার বিল, হাপুনিয়া ও গোসাই বাড়ীর বিলকে এককালে মৎস্য ভান্ডার বলা হতো। এসব খাল-বিল হতে মাছ শিকার করে অসংখ্যা জেলে জীবিকা নির্বাহ করতো। কিন্তু এক্ষণে মৎস্যের প্রকট অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। বর্তমানে পাবনার চলন বিল ও নগর বাড়ী প্রভৃতি স্থান হতে মাছ আমদানী করে স্থানীয় অভাব পূরণ করা হচ্ছে। এতদঞ্চলে মৎস্য চাষ বাড়ানোর নিমিত্ত, সম্প্রতি শেরপুরে একটি মৎস্য খামার স্থাপিত হয়েছে। এখানকার মজা পুকুর সমূহ সংস্কার করতঃ উহাতে ব্যাপক মৎস চাষ করলে অদূর ভবিষ্যতে মৎস্যের অভাব লাঘব হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বস্ত্র ও অন্যান্য ক্ষুদ্র শিল্প

আজ হতে প্রায় ৭০/৮০ বছর পূর্বে শেরপুরে "কপদ্দুল" নামক এক প্রকার উৎকৃষ্ট ধরনের মশারী তৈরী হতো। তা ছাড়া এখানে সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্মানের কারখানাও ছিল। এক্ষণে শেরপুরে আর কোন তাঁত ব্যবসায় নেই। শেরপুরের পার্শ্ববর্তী কোন কোন স্থানে ক্ষুদে তাতীগণ এখন কিছু কিছু নিম্ন মানের গামছা কপনী তৈরী করে থাকে। বাস্তব প্রস্তাবে পাবনা জেলার ব্যবসায়ীগনই এখন শেরপুরের অন্যতম বস্ত্র সরবরাহকারী।

শেরপুরের কর্মকারগণ উৎকৃষ্ট অলংকার প্রস্তুত করে থাকেন। পূর্বে এখানকার কর্মকারগন রংপুরের মাহিগঞ্জে ব্যবসায় কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। শেরপুরে লোহার কাজও মন্দ হয় না। পূর্বে শেরপুরের কাঠ মিস্ত্রি ও রাজ মিস্ত্রিগন বিভিন্ন কারুকার্য খচিত আসবাব ও দালান কোঠার তৈরী করতে পারতেন। বর্তমানে মিস্ত্রির অভাব না থাক্লে ও সুদক্ষ কারিগরের সংখ্যা খুবই কম। যারা টিনের কাজ করে তারা এখানে ঠাটারু নামে অভিহিত। এরা উত্তম ধরনের চেরাগ, মগ, ডিব্বা প্রভৃতি তৈরী করতে পারে। মালাকারেরা, শোলা, কাগজ ও অভ্র দ্বারা নানা প্রকার ঝাড়ও আতশ বাজির সরঞ্জাম তৈরী করে থাকে।

www.amarboi.org

পূর্বে সেরুয়ার বৈরাগীরা অতিক্ষুদ্র হতে সুবৃহৎ মালা প্রস্তুত করত। পাটনীরা বেতের ধামা, কাঠা, ইত্যাদি বংশ নির্মিত ঝাকা, ডালা, কুলা, পাখা, খালই, চালনা, তাল পত্রের পাখা, ইত্যাকার সুন্দর সুন্দর জিনিষ তৈরী করতো।

পূর্বে লাহাড়ীরা, লাহা বা গালা দ্বারা নানা রকমের কংকন, বলায়, প্রভৃতি তৈরী, করত। এখানকার চর্মকারেরা চামড়া দ্বারা নানা প্রকার ঢোল খোল প্রস্তুত করে। শেরপুরে নির্মিত নাগরা জুতা এককালে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল এবং এখানকার লোকেরা তৎকালে সচরাচর এই জুতা ব্যবহার করত। পূর্বে শেরপুরের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত খামার কান্দি গ্রামে চট ও থলে প্রস্তুত হতো।

চন্ডীজান, আড়িয়া ও কল্যানীর কুম্ভকারেরা, সুন্দর সুন্দর হাড়ি, পাতিল, কলসী, ডাবর, কোলা প্রভৃতি তৈরী করে থাকে। শেরপুরের কুম্ভকারেরা ও অল্প বিস্তর মৃৎপাত্র নির্মান করে থাকে। পূর্বে সাজাপুর ও মাঝিড়া গ্রামে কাগজ তৈরী হতো বলে উল্লেখ আছে।

সুভিক্ষ, দুর্ভিক্ষ ও চৌর্যবৃত্তি। ফকির বিদ্রোহ

সুজলা, সুফলা, শস্য, শ্যামলা বাংলার মাটিতে সোণা ফলে। এ ফলিত সোনা কিন্তু খনিজাত নহে। বাংলার সরস মাটির অকৃত্রিম পরশে, এখানে জন্মে, প্রচুর স্বর্নদানা-সোণালী ধান্য-সোণালী আঁশ-মানুষেরপেটের খোরাক, আনন্দের সওগাত,জীবন গড়নের অন্যতম সম্পদ। বাংলার এ অফুরন্ত সম্পদ কোন দিন কমপড়েনি। কম পড়েনি তখন কিষানদের গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ, গোয়াল ভরা গরু, গাল ভরা হাসি-আর প্রান ভরা আশীস। বঙ্গাব্দ ১১৭৬/৭৭ এর পূর্ব পর্যন্ত বাংলার মানুষ সুভিক্ষ বই দুর্ভিক্ষ অথবা হা ভাতের সম্মুখীন হয়নি কখনও। শায়েস্তা খাঁর আমলে বাংলার মানুষেরা দেড় গন্ডা পয়সা দিয়ে কয়েকমন ধান্য খরিদ করতে পারত। ১২৬১ বঙ্গাব্দে বগুড়ায় একটাকায় একমন পঁয়ত্রিশ সের চাল ক্রয় করা যেত। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে (১১৭৬) সর্ব প্রথম বাংলার সর্বত্র হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয় এবং অসংখ্য লোকজন এ মহাদুর্ভিক্ষের কবলে নিপতিত তহয়ে জীবন ত্যাগ করে। কিন্তু এতদঞ্চলে লোকজনকে সে দর্ভিক্ষের ও সম্মুখীন হতে হয়নি। কারণ, নাটোরের তদানীন্তন মহারানীর ভবানীর বদান্যতার ফলে, শেরপুর এলাকার প্রজা অনুপ্রজা সকলেই উক্ত দুর্ভিক্ষের অভিশাপ হতে রক্ষা পায়। পরবর্তীকালে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নৈসর্গিক দুর্যোগ, অনাবৃষ্টি,

www.amarboi.org

অতি বৃষ্টি, জল প্লাবন, ব্যর্থ শাসন ও শোষনের দরুন বাংলায় আরও দু'একটা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তবে শস্য প্রধান এ স্থানের প্রজাবর্গ সে সব দুর্ভিক্ষ অতিক্রম করে আপন আপন অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হয়। বাংলার ভাংগা গড়ার ইতিহাসে আর যাই ঘটুক কিন্তু (১৯৭২-৭৪ খ্রীঃ) এর মত প্রকট খাদ্য ও বস্ত্রাভাব আর কখনও হয়েছে বলে জানা যায়নি। এ বছর প্রতি সের চাল ১৪ টাকা একসের গোস্ত ২০/২২ টাকা একখানা নিম্নমানের সাড়ীর মূল্য ১০০ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল।

চুরি ডাকাতি, হত্যা ও রাহাজানি

সর্বকালে ও সর্বদেশেই চুরি ডাকাতি, হত্যা ও রাহাজানির ন্যায় জঘন্যতম সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ আবহমান কাল হতেই চলে আস্‌ছে। পূর্বে দুবৃর্ত্তকারী গণ লাঠি শোটা, ছুরি- দা ও বল্লম প্রভৃতির সাহায্যে চুরি ডাকাতি ও রাহাজানি করত। এদেশে পন্ডিত শাহ ও মজনু শাহ ফকিরের দুধর্ষ ডাকাতির? কথা আজও লোকেরা বলে থাকে। মগ বর্গীরা যে আমাদের দেশ লুণ্ঠন করে ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল সে কথাও পরবর্তীতে প্রবাদে পরিণত হয়। বগুড়ার কাবেজ ডাকাতের কুকীর্ত্তির কথা জানেনা, এমন লোক আমাদের দেশের কমই আছে। এই সেদিনের কথা মাত্র, (১৯৭১) পাক বাহিনীর লোকেরা আমাদের দেশের অগনিত ঘর-বাড়ী জালিয়ে পুড়িয়ে ছার খার করে দিয়ে গেল। সে কথা কি সহজে ভোলা যাবে? কিন্তু দুর্বৃত্তদের কার্যকলাপ আজও কি কিছু মাত্র কমেছে? সম্প্রতি আমাদের দেশে একটা গন প্রবাদ চালু হয়ে গেছে "আমাদের ইতিকাহিনী- চুরি ডাকাতি আর খুনা-খুনি"। চোর ডাকাত ও গুন্ডার দল এখন নিত্য নতুন ফন্দি ফিকির আবিস্কার করছে। তারা সামাজিক দুর্নীতির চূড়ান্ত কৌশল স্বরূপ হাইজাক বা ছিনতাই প্রথা আবিস্কার করে ফেলেছে। দুর্বৃত্তরা এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে লোকের জান মাল হরণ করছে। সেকালে ও কি লোকজন সম্পূর্ণ নিরাপদ জীবন যাপন করতে পারত? বগুড়া তথা উত্তর বংগের প্রাচীন লোকজন আজও কুখ্যাত পন্ডিত শাহ ডাকাতের নামে আতকে উঠেন। পন্ডিতা ডাকাত এককালে চলন বিলে দুস্যু বৃত্তির আড্‌ডা খুলে দিয়েছিল। এমন কি সুরক্ষিত শেরপুর ও তাদের অত্যাচার নিপীড়ন হতে বাদ পড়েনি।

www.amarboi.org

"শেরপুরের ইতিহাস" প্রনেতা বাবু হর গোপাল দাসকুন্ডু মহাশয়ের ভাষায় পন্ডিত শাহ ও মজনু ফকিরের কার্যকলাপ নিম্নরূপ" বগুড়া জেলার পন্ডিত সা ডাকাইতের নাম বর্তমান কালেও ভীত প্রদ। সে এবং তাহার দল বগুড়া এবং শেরপুরের মাঝা মাঝি "মাঝিরা" নামক গ্রামে বাস করিত। বৃহৎ ইষ্টক স্তূপ সকল এবং অসংখ্য পুষ্করিনী থাকায় ইহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান ছিল বলিয়া বোধ হয়। সার্ভে মাপে এক বর্গ মাইলের অধিকস্থানে পঁয়ত্রিশটা পুকুরের চিহ্ন দেখা যায়। সেরপুরের উত্তর পশ্চিম কয়েক মাইল দূরে "গোহাইল" নামক স্থানে তাহার জন্য একটি আডডা ছিল। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে শেলবর্ষ পরগনার জমিদার আসজ্জমা চৌধুরী, তাহাকে ধরাইয়া রাজশাহীর ম্যাজেষ্ট্রেটের নিকট বিচারের জন্য প্রেরণ করেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে যাবজ্জীবন দীপান্তর বাসের শাস্তিদেন।

পান্ডিত সার বিশ ত্রিশ বৎসর পূর্বের সেরপুরের নিকটবর্তী মাদারগঞ্জ নামক স্থানে মজনু ফকির একদল ডাকাইত লইয়া দস্যু বৃত্তি করিত। মজনু ফকিরকে অধিক ক্ষমতা শালী ও সাহসী বলিয়া বোধ হয়। কারণ দিবা ভাগের মধ্যেই গ্রামে অগ্নি প্রদানকরিয়া লুণ্ঠন করা তাহার প্রিয় কার্য্য ছিল। তাহার অনুচরগণ অগ্নি অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া এই সকল অস্ত্র সচরাচর ব্যবহার করিত। যে প্রকারে ইহার পতন হইয়াছিল, তাহা ইংরেজ শাসন প্রারম্ভের সমসাময়িক দেশের অবস্থা বলিয়া চিত্তার্ষক।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ২০০ সংখ্যক পাশ্চিম দেশীয় ধর্ম্মোন্মত্ত একদল নাগা উত্তর পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়াছিল। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায়না। পাঞ্জাবে ইহারা লুণ্ঠন কারী বলিয়া বিখ্যাত। কিন্তু বগুড়ায় তাহাদের চরিত্রের বিরুদ্ধে এরূপ কথা জানিতে পারা যায় নাই। লোকে বলে তাহারা দস্যু দলন করিবার নিমিত্ত ভগ্বান কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিল। তাহারা বৃহৎ বৃহৎ আশ্বারোহনে সুপটু এবং দীর্ঘ তরবারী ব্যবহার করিত বলিয়া কথিত হয়। ইহারা মজনু ফকিরের অনুচরগনের সহিত প্রাতঃকাল হইতে দিবা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল। এই যুদ্ধে দস্যু দিগের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিল। নাগাগণ লুণ্ঠনের নিমিত্ত অবস্থিতি করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়না। তাহারা তৎপরেই দক্ষিণ দিকে গমণ করে এবং তৎপরে পূর্ব দক্ষিণ হইয়া ময়মনসিংহ এবং গোয়াল পাড়ায় যায়। এই শেষোক্ত স্থানে অর্দ্ধ পূর্ত্ত গীজ উপনিবেশিক গনের

www.amarboi.org

সহিত তাহাদের একযুদ্ধ হয়। তৎপর আর তাহাদের কোন বিবরণ জানা যায় নাই। "বগুড়ার ইতিকাহিনী" প্রনেতা জনাব কে,এম, মিছের সাহেব, পন্ডিত শাহ সম্পর্কে তার গ্রন্থে নিম্নরূপ বিবরণ উল্লেখ করেন।

----"বেনীরায়" শীর্ষক পাদটিকায় একস্থানে তিনি বলেন বেনীমাধব রায় একজন কুলীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন। সম্ভবতঃ সে সংস্কৃততে পন্ডিত ছিল। পরে সে "পন্ডিতা ডাকাত" নামে খ্যাত ছিল। তাহার এক পত্নী পরমা সুন্দরী ছিল। একজন মুসলমান সর্দার সেই সুন্দরীকে অপহরণ করায় সে সংসার ত্যাগ করিয়া দদ্যু বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। সে নানা জাতীয় কতকগুলি হিন্দু চেলা জোগাইয়া একদল ডাকাত প্রস্তুত করিয়া চলনবিলে একদ্বীপে বাস করিত। এই স্থানে "যবনমর্দ্দিনী" নামে এক কালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। নানাদেশ হইতে মুসলমান ধরিয়া আনিয়া এই কালীর সম্মুখে বলি দিত। এবং নিহিত যবনগনের (মুসলমানগনের) মস্তক গুলি পুঞ্জ করিয়া রাখিত। তাহার দ্বীপ কে অদ্যাপি" পন্ডিত ডাকাতের ভিটা" বলে। মুসলমানরা ঐ স্থানকে শয়তানের ভিটা বলিত।- ---------- শ্রী প্রমথ নাথ বিশী লিখিত চলনবিল।

আলোচ্য ডাকাত দল সম্পর্কে জনাব আমানুল্লা খাঁন সম্পাদিত "আজকের বগুড়া" গ্রন্থে জনাব জালাল উদ্দিন আকবর বিরচিত" ইতিহাসের আলোতে বগুড়ার একটি দস্যুদল" প্রবন্ধটি বিশেষ অনুধাবন যোগ্য মনে করি। প্রবন্ধকার জালাল উদ্দিন আকবর বলেন-" আমাদের এই বগুড়া জেলায় আবির্ভাব ঘটেছিল দস্যু মজনু ফকিরের আবির্ভাব ঘটেছিল দস্যু পন্ডিত শা'র আর আবির্ভাব ঘটেছিল দস্যু সেফাতুল্লাহ্ ফকিরের। মজনু ও পন্ডিত শাহর কথা বগুড়া গেজেটিয়ারের বলা হয়েছে। সেই কথা বর্ণিত হয়েছে "বগুড়ার ইতিহাসে" ও বগুড়ার ইতিকাহিনীতে।

বগুড়ায় মাদার পন্থী মজনু (মজনুই ভাগ্যাহত নবাব মীর কাশিম আলী খাঁন কিনা- সে বিষয়ে আজ অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন) স্বাধীন ভাবে ধর্ম পালন করার জন্য বিট্রিশ সরকারের সঙ্গে যে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন, রানী ভবানীর নিকট লিখিত মজনুরপত্র (হিষ্ট্রি অব দি সন্ন্যাসী এন্ড ফকির মুভমেন্ট গ্রন্থ দ্রষ্টব্য) সে কথা বিশেষ করে বগুড়ায় নীল কুঠিয়াল ও হিন্দু জমিদারদের অত্যাচার কাহিনী স্মরণ করেই এই প্রবন্ধের অবতারনা করছি। ----- বগুড়ার বাহিরে ও বগুড়ার শাসনতান্ত্রিক ইতিহাস ছড়িয়ে আছে। মজনু ফকিরের সম্পর্কে সঠিক বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে দিনাজপুরে পন্ডিত শাহের রেকর্ড পাওয়া যাবে রাজশাহীতে। উপরোক্ত দুই সময়ে বগুড়া দিনাজপুর ও রাজশাহীর সঙ্গে যুক্তছিল বলেই বগুড়ায় এর কোন রেকর্ড কোন দিন আসেনি। মজনুর নিহত হবার সঠিক কাল নির্ণয়ে

www.amarboi.org

তাই বগুড়া গেজেটিয়র বিভ্রান্ত হয়েছেন (বরেন্দ্রী-সংকলনে ব্রিটিশ বগুড়ার ইতিহাস দ্রষ্টব্য) হান্টার তার ষ্টাটিস টিক্যাল একাউন্ট অব বেঙ্গল গ্রন্থের ৮ম খন্ডের ১৮৯ পৃষ্টায় বলেছেন যে, পন্ডিত শাহর বিচারের জন্য তাকে রাজশাহীতে পাঠান হয়েছিল। এই খানেই বগুড়ায় পন্ডিত শাহর প্রসঙ্গ শেষ- কিন্তু পন্ডিত শাহার বিচার সংক্রান্ত নথি পত্রের কোন প্রয়োজন আমরা অনুভব করিনি -----। উল্লেখিত বিবরণের আলোকে বিচার করলে দেখা যায় যে, পন্ডিত শাহ কেবল একজন দস্যু দলপতি নহে বরং সে ছিল তৎকালে উত্তর বংগের এক মহাত্রাস। অনুরূপ ভাবে মাদার পন্থী মজনু ফকিরের কূকীর্তির ফিরিস্তি ও নেহাত কম নহে। তবে তার ব্যক্তিগত চরিত্র অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল বলে মনে হয়। গতানুগতিক সুরে ঐতিহাসিকগণ তার চরিত্র শীর্ষে কেবল কলংকের ডালিই তুলেদিয়েছেন মাত্র - কিন্তু তৎকালীন স্বৈরাচারী সরকার ও স্থানীয় জমিদারী অত্যাচারের কথা অনেকেই বিবেচনা করে দেখেননি। হতে পারে অত্যাচারের বিরুদ্ধে মজনু, তার দলবল নিয়ে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। গত্যন্তর না দেখে হয়ত। সে আত্মরক্ষা মূলক ব্যবস্থা ও গ্রহন করেছিলেন। তাই স্বৈরাচারী চক্র তার আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার নিমিত্ত ষড়যন্ত্রের ফন্দি এঁটে ছিলেন। ডাকাতের নামান্তর ঘটিয়ে তাকে শায়েস্তা করার ব্যবস্থাও করেছিলেন। তাইতো সে আজ মজনু তস্কর, ফকির নহে। ফকির ও সন্ন্যাসীদের আন্দোলনকে আরও একবার বিচার বিশ্লেষণ ও বিবেচনা করে দেখা প্রয়োজন। শক্তিধর আগ্রাসী ইংরেজদের লৌহ কঠিন প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে, এ বিদ্রোহী কাফেলা ভূ ভারতের বৃহত্তর এক অংশ ব্যাপী যে তোলপাড়ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা কি নেহাত এক লুট তরাজের কাহিনী মাত্র? তদানীন্তন ইংরেজ সরকারের দৃষ্টিতে ফকির সন্ন্যাসীদের ঐ আন্দোলনটি যেন কেবল ভীতি, সন্ত্রাসও বিশৃংখলা সৃষ্টির জন্যই আরম্ভ করা হয়েছিল। ইংরেজদের ধারনাটি হয়তঃ অমূলক ছিলনা। কারণ, চোরের মনে পুলিশ ভীতি থাকাই স্বাভাবিক। ওরা নিছক একটা বাণিজ্যের নামে আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে, বিশ্বাস ঘাতকতার অপকৌশলে মুসলমানদের নিকট হতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল। তাই মুসলমান ফকিরদের এক চিল্‌তে আন্দোলনেই ওরা মিছা মিছি চিৎকার শুরু করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, শেষ মেষ অসহায় ফকিরদের বিরুদ্ধে নানা অমূলক অপবাদ, অপপ্রচার ও অভিযোগ খাড়া করে তাদেক, শায়েস্তা করতে উঠে পড়ে লেগিছিল। ২৬ বছর স্থায়ী ঐ আন্দোলনটিকে নস্যাৎ করে দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্থানে নিয়োজিত ইংরেজ

www.amarboi.org

প্রতিনিধিরা কত যে গলদঘর্ম হয়ে ছিলেন, তা উল্লেখ করা কঠিন। সারাদেশের উৎপীড়িত ও উপেক্ষিত প্রজাদের বিভিন্ন সমস্যার প্রতি কর্নপাত মাত্র না করলেও ফকিরদের দ্বারা নাকি জন সাধারণ খুবই হয়রানি হচ্ছে,সে কথাটি বার বার অভিযোগ আকারে পেশ করা হয়েছে এবং ঠ্যাংগারে সেনা বাহিনী তলব করে তাদেক রীতিমত শায়েস্তা করনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। অসহায় ফকির বাহিনীর সদস্য সংখ্যা বাড়িয়ে কখনও কখন পাঁচ হাযারের উর্দ্ধে গণনায় আনা হয়েছে। নিঃসম্বল সদস্যরা নেহাত, পেট বাঁচানোর তাগিদে হযতঃ কোথাও কোথা হাত পেতে খাদ্য ভিক্ষা চেয়েছে, অথচ ইহাকেই জোর পূর্বক চাঁদা বাজি ও সম্পদ লুন্ঠন হিসেবে দেখানো হয়েছে। দল বেঁধে সম্পদ লূন্ঠন ও বিত্তগড়ার নজির মাত্র না থাকার পরও তাদেক লুটেরা বলে অপবাদ ও শায়েস্তা করার কারন কি হতে পারে? নিঃস্বার্থ এসব অসহায় সদস্যদেক সেনা বাহিনী দ্বারা নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে। পন্ডিত শাহ ও শেখ মজনু মাস্তানাকে যত্র তত্র ব্যাঘ্র গতিতে ধাওয়া করা হয়েছে। কয়েকবার আপোষ করার প্রস্তাব করে, আবারও আক্রমনাত্মক ভূমিকা গ্রহন করা হয়েছে। অনস্বীকার্য যে ফকির বাহিনীর মূল নেতৃত্ব শেখ মজনু মাস্তানার উপর ন্যস্ত ছিল এবং এক্ষেত্রে তিনি তিল মাত্রও হেরফের করেননি। নিজের জীবন বাজি রেখে হলেও তিনি অধীনস্থদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করেছেন। সুচতুর ইংরেজ সরকার যথার্থই অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, আজ ফকির বেশে হলেও সুযোগমত আগামীকাল সুসংঘবদ্ধ ভাবে এরা স্বৈরাচারিতার বিরুদ্ধে কঠোর ভূমিকায় অতীর্ন হতে পারে। আর, তাই প্রথম দিন হতেই তারা ফকির বহিনীর প্রতি কড়া নজর রাখতে থাকেন। শান্তিপ্রিয় এ নিরীহ বাহিনীকে

যত্র তত্র এত বেশী উত্যক্ত না করা হলে হয়তঃ এরা এতটা মরিয়া হয়ে উঠতেন না। এই ফকির বাহিনী উত্তর বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে তাদের তৎপরতা অব্যাহত রাখেন এবং মহাস্তান ও শেরপুরেও কয়েকবার আস্তানা গড়ে তোলেন।

ফকির আন্দোলন সংক্রান্ত প্রাপ্ত সব প্রাচীন তথ্যে জানা যায় যে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে ডিসেম্বর বর্ধমান শহরের বাত্তাসী কা বাগ থেকে ক্যাপটিন মার্টিন হোয়াইটের এক পত্রে ইংরেজ অবস্থানের উপর ফকিরদের আক্রমনের কথা উল্লেখিত হয়েছে। প্রকাশ যে বৃটিশদের অন্যায় আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে এদেশের ফকির সম্প্রদায় ১৭৬৩ সালে বিদ্রোহ ঘোষনা করে। ওয়ারেশ হেস্টিং সের "রোজ নামচা" দৃষ্টে জানা যায় ঐ সময়ে ফকির বিদ্রোহীরা সমবেত ভাবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

www.amarboi.org

১৭৬৩ সালের হিষ্টিংসের এক পত্রে বাখেরগঞ্জে একদল ফকিরের উপদ্রপ, লুটপাট এবং তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিনিধি মিঃ কেলীর জীবন বিপন্ন করার কথা উল্লেখ আছে।

একই বছর ক্লাইভ একদল বিদ্রোহী ফকির কর্তৃক ঢাকা ফ্যাকটরী আক্রমন ও দখলের কথা বলেন। ঐ সময়ে অথবা পূর্বে সন্ন্যাসীদের দ্বারা রাজশাহীর বিখ্যাত রামপুর বোয়ালিয়ার ফ্যাকটরী (সম্ভবতঃ বড় কুঠি) আক্রান্ত হয় এবং কুঠি অধ্যক্ষ মিঃ বেনেট পাটনায় নিহত হন। ১৭৭৪ সালে কুঠিটি দ্বিতীয়বার লুণ্ঠিত হয়।

১৭৬৪ মে ১২, হুগলীর ফৌজদার,বাদল খাঁন কর্তৃক ফোর্টউলিয়ামের গভর্নরকে লেখা এক পত্রে মীর কাসিমের পক্ষে ফকির সন্ন্যাসীদের যুদ্ধ করার বিবরন আছে। এই যুদ্ধের বর্ননায় গোলাম হোসাইন সিয়ারে মুতাখিখরীন এ ৫ হাযার ফকির সেনার নেতা রূপে সমরু ও হিম্মত গীরের নাম উল্লেখ করেছেন।

১৭৬৬ সালে কুচ-বিহারের রাষ্ট্রীয় বিপ্লবে ফকির সন্ন্যাসীরা জড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে তথা কথিত নবাবের বাংগালী সিপাহীরা কিদ্রোহ করেছিল। এটিই ছিল সর্ব প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ। এর পরই শুরু হয় ফকির বিদ্রোহ।

১৭৬৭ সালে পাটনার প্রধান, এক রিপোর্টে দেশে ৫ হাজার সন্ন্যাসীর প্রবেশ করার এবং ১৭৬৮ সালে নায়েবে দেওয়ান সিতাব রায়, ভবঘুরে নাগাদের দ্বারা হালসিপুরের জমিদার উত্যক্ত হওয়ার কথা বলেন। এ সময় উত্তর বঙ্গে এই দস্যুদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। দেশের নিরপত্তা ও বিদ্রোহীদের কার্য কলাপ বন্ধ করার জন্য ক্যাপটেন ম্যাকেঞ্জীর অধীনে ১৭৬৭ সালে রংপুরে এক কোম্পানী সৈন্য মোতায়েন করা হয়।

(১) রায় বাহাদুর যামিনী মোহন ঘোষ, সন্ন্যাসী এন্ড ফকির রেইডার্স ইন বেংগল কলকাতা বেংগল সেক্রেটারিয়েট, বুক ডিপো ১৯০১

(২) ব্রজনাথ অর্জুন (৩) ঘোষঃপ্রাগুক্ত (৪) ঘোষঃ প্রাগুক্ত পৃঃ ১৫-১৬ (৫) গোলাম হোসেইন সিয়ারে মুত্তাখিরিন ২য় খন্ড।

www.amarboi.org

ইতিহাসগত কোন তথ্যকেই নির্বিচারে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। কথিত ফকির সন্ন্যাসীদের কাহিনীর সবদিকই ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ। কাজেই মেনে নিতেই হয় যে এদলটি দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টি জন্যই বুঝি তছনছ কায়কারবার শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু এরপরও কথা থেকে যায়। কোন লক্ষ্যও উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য এমন সুসংঘবদ্ধ দল গঠিত হওয়া কি আদৌ সম্ভবঃ? বৃটিশ বেনিয়াদের বিশাল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতীয় স্বার্থ ছাড়া নিরেট দলীয় কর্মসূচীতে অটল অচল থাকা কী সম্ভব? ফকির সন্ন্যাসীদের জীবন দর্শন ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য অঘোষিত থাকলে ও তাদের কার্য কলাপে কিন্তু উহার বহিঃ প্রকাশ ঘটেই গেছে। বলা হয়েছে,যে বৃটিশদের অন্যায় আচরণে বিক্ষুব্ধ হয়ে এদেশের ফকির সম্প্রদায় ১৭৬৩ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ওয়ারেশ হিস্টিংসের "রোজ নামচা" দৃষ্টে জানা যায় ঐ সময় ফকির বিদ্রোহীরা সমবেত ভাবে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়।

ফকির সম্প্রদায় বলতে নিছক ভবঘুরে কোন বাহিনী মাত্র বুঝলে বোধ হয় ঠিক হবেনা। বস্তুতঃ জাতির বিবেক সম্পন্ন কতিপয় নিঃস্বার্থ বোদ্ধা ব্যক্তিই এ বাহিনীটি গঠন করে থাকবেন। তাদের পরিকল্পনা ও অভিযান সফল হবেকি হবেনা,তা বিচেন না করে কেবল কর্তব্যরত ও অনড় অচল থাকাকেই এরা প্রাধান্য দিয়ে দিগ্বিদিক ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্রোহী এ দলটি যথেষ্ট রণ সম্ভার ও খাদ্য ভান্ডার সংগে নিয়ে বেরোয়নি। তারা যখন যেমন, অভিযান অভীষ্ট জন পদ হতেই উহা সংগ্রহের তাগিদ নিয়ে চলা চল করেছে। সম্ভবতঃ এরা নিজেদের সফলতা অর্জন অপেক্ষা দখলদার ইংরেজদের বিব্রত রাখতেই অধিক তৎপর ছিল। সেই সঙ্গে ইংরেজদের হাতে পরাজিত ঝিমিয়ে পড়া ভারত বাসীদের চেতনা বোধ জাগ্রত করাও একটি লক্ষ ছিল বই কী? জানা যায় যে এরা দেশের এখানে সেখানে ভিক্ষা চেয়ে বেড়াতো। কারুর অন্যায় করার ইচ্ছে এদের ছিলনা। উল্লেখ্য যে ১৭৭২ সালের প্রথম দিকে বিপুল সংখ্যক সশস্ত্র অনুচর সহ,মজনু শাহ পুনরায় আভির্ভূত হন এবং গত বছর তার সাথে যে দুর্ব্যবহার করা হয়েছে, তা জানিয়ে এবং অনুগ্রহ কামনা করে তিনি নাটোরের মহা রানী ভবানীর কাছে চিঠি দেন। "আমরা বহুদিন থেকে ভিক্ষা করে বাংলায় সমাদৃত হই এবং কাউকে কষ্ট বা উত্যক্ত না করে বিভিন্ন দরগাহ ও বেদীতে আল্লাহর এবাদত করে আসছি। অথচ গত বছর আমাদের ১৫০ জন ফকিরকে হত্যা করা হয়েছে। তারা বিভিন্ন দেশে ভিক্ষা করলে তাদের পোশাক এবং যা কিছু সামান ছিল সবই হারিয়ে গেছে। এই অসহায় দ্বীন হীনদের হত্যা করে কি লাভ হয়েছে এবং কি সুনামই বা অর্জিত হয়েছে? তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। আগে ফকিররা পৃথক এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে ভিক্ষা করতো। এখন আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি এবং এক সাথে ভিক্ষা করি। তারা এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে আমাদেক বিভিন্ন দরগাহ ও অন্যান্য স্থান যিয়ারত করতে বাধা দিচ্ছে। ইহা অযৌক্তিক। আপনি দেশের শাসক, আমরা ফকির। আমরা আপনার মঙ্গল কামনা করি। আমরা সম্পূর্ন আশা বাদী।'

www.amarboi.org

এখন প্রশ্ন হলো বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অবস্থায় যারা ভিক্ষে করে বেড়াতো, তাদেক উত্যক্ত ও হয়রানি করার কারনটা কি ছিল? সহজেই অনুমেয় যে, সন্দেহ পরায়ণ ইংরেজ প্রতিনিধিরা নিরীহ ফকিরদেক, পাল্টা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে পেছনে লেগে যান এবং তাদের হয়রানি করা ছাড়াও হত্যা করে ছাড়েন। দেশের মাটিতে বিদেশী দখলদারদের এই অন্যায় ও বৈরী আচরণ কি বরদাস্ত করারমত? আর তাই ফকির বাহিনী বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং জীবন বাজি রেখে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। পরিণামে সহানুভূতিশীল আরও লোকজন এদের সহযোগিতায় এগে আসে এবং ক্রমান্বয়ে দলটি ভারি হতে থাকে। পরবর্তীতে এরা মার মুখী হয়ে প্রতিরোধ গ্রহনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় এবং স্থান হতে স্থানান্তরে আস্তানা গড়ে তোলে। এদিকে ইংরেজ প্রতিনিধিরা বিষিয়টিকে আরও ভয়াবহ মনে করে, কঠোর ব্যবস্থা গ্রহন করতে থাকেন, আর ফকির রাও বাধ্য হয়ে নতুন নতুন কৌশল অবলম্বন করে রাষ্ট্রীয় শক্তির সম্ভাব্য মোকাবেলা করতে থাকে। ইংরেজ প্রতিনিধিরা ফকিরদেক নির্মূল করার জন্যে ভিন্ন অপ কৌশলে এদেক দস্যু-তস্কর ও লুটেরা নামে আখ্যায়িত করে তাদের পৈশাচিক দমন নীতি কে গ্রহন যোগ্য করে তোলেন। শুধু তাই নয়, এরা ফকিরদের স্বাধীন নড়া চড়াকে বড় ধরনের বিপ্লব কল্পনা করে, তাদেক শায়েস্তা করারজন্য যুদ্ধাবস্থা ঘোষনা করেন। ফকির বাহিনীও জীবন বাজি রেখে বিদেশী দখলদারদের বিরুদ্ধে আক্রমানা ত্বক ও আত্মরক্ষা মূলক অবস্থান গ্রহন করে, কিন্তু সুসংগঠিত ইংরেজ বাহিনীর কঠোরতায় কুলিয়ে উঠতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। ফকির বিদ্রোহীদের জয় পরাজয় ও তাদের কার্য কলাপের কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করা হলো।

১৭৬৯ ডিসেম্বর, মুরাং (নেপাল তেরাই) অঞ্চলে প্রেরীত লেফ টেন্যান্ট কীথের সম্মিলিত বাহিনী বিধবস্ত হয় এবং কীথ নিহত হন। (১) এই বিজয়ের ফলে ফকিরদের সাহস বেড়ে যায় এবং পরের বছর তারা বিপুল সংখ্যায় বাংলায় আগমন করে। (২) রংপুরের নব নিযুক্ত সুপারভাইজার ২০ এপ্রিলের চিঠিতে অতি আশাবাদী ফকিরদের অগুত তৎপরতা রোধের জন্য অতিরিক্ত সৈন্য সাহায্য কামনা করেন। (৩) ২৪ শে এপ্রিল লেঃ নেইরন (Nairn) দিনাজপুর ষ্টেশন কমান্ডার, দু'দল সন্ন্যাসীর প্রত্যাবর্তনের খবর পান,যাদের এক দলের সংখ্যা একশত এবং অপর দলকে ধাওয়া করা হয়েছে। ৪

www.amarboi.org

১৯৭০-৭১ পুর্নিয়ার সুপার ভাইজার মিঃ ডকারেল (Ducarel) ফকির সন্ন্যাসীদের আশংকায় কুশী নদীর ঘাটে এবং পথে হরকরা মোতায়েন করেছেন। তিনি ১৭৭০ অকটোবরে জানতে পারেন ম্যাচলক ও অন্যান্য আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৩০০ লোক অগ্রসর হয়েছে। তার প্রেরীত লেফটেন্যান্ট সিংকলিয়ার (Sinclair) ৫০০ ফকিরের বহর পকড়াও করেন। ধৃত ফকিরেরা মাদার পন্থী এবং তাদের মালদহ ও ঘোড়াঘাটের দশ ক্রোশ দূরবর্তী দরগাহ যিয়ারতে যাওয়ার কথা বলেছে। তাদের দলপতি কে স্থানীয় লোকেরা চিনে। সে খুবভাল মানুষ এবং কখনও মন্দ কাজ করেনি বলে জানা যায়। "যেহেতু গত বছর আমাদের কতিপয় সন্ন্যাসীদের হাতে নিহত হয়েছে সে জন্য আমরা অধিকসংখ্যায় এবং অস্ত্রসহ ভ্রমন করছি। তাদের ৫/৬ জনকে জিম্মি করে এবং অস্ত্র গুলি রেখে দিয়ে তাদেক যেতে দেয়া হয়েছে। ৪

১৭৭০ সালের নভেম্বর মাসে দিনাজপুরের সুপার ভাইজার রিপোর্টে বলেন "ফকিরদের বিরাট দল প্রদেশে উপস্থিত হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে প্রেরীত ১০ জন সিপাই এবং ১০০ বরকন্দাজ অপর্যাপ্ত বিবেচিত হওয়ায়, ফিরিয়ে আনা হয়েছে। দিনাজপুরের রাজার মতে, এদের সংখ্যা ৫ হাজার। স্বল্প শক্তি দিয়ে ওদের নিশ্চিহ্ন করা অসম্ভব"। এই চিঠির জবাবে রাজস্ব নিয়ন্ত্রক পরিষদ বলেন" সম্ভব তীর্থ যাত্রী ফকিরেরা শান্ত থাকবে। পুর্নিয়ার ঘটনা থেকে অনুমান করা যায়। সুতরাং এ কারনে তাদের সুড়সুড়ি (Moleste) দেয়া বা উত্যক্ত করা অনুচিত"।

---

১. চৌধুরী,ত শামছুর রহমান "বাংলায় ফকির বিদ্রোহ ২. ফার্মিংগার ওয়াল্টার" Bengal District Records. Rangpur.

৩. মাস্তান গড়. ৪. Letter to the Supevis or at purnea.

(ক) মুর্শিদাবাদস্থ রাজস্ব নিয়ন্ত্রক পরিষদ কতৃক রাজমহলের সুপারভাইজারের নিকট প্রেরীত পত্র। তারিখ ২৮ নভেম্ব ১৭৭০

www.amarboi.org

ইংরেজ রাজ শক্তির ভারত দখলের সংগে সংগেই চার দিক হতে প্রচন্ড প্রতিরোধ ও প্রতিশোধ গ্রহনের আন্দোলন শুরু হওয়াই স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু পলাশীর বিশ্বাসঘাতকার ফলে উহা কিছুটা বিলম্বিত হয়, আর এ সুবাদে রাজশক্তি, বড্ড স্পর্শ কাতর হয়ে উঠে। তাই ফকির বিদ্রোহীদের সামান্য নড়াচড়াতেই রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধিরা এক যোগে দারুন মাতা মাতি আরম্ভ করে দেন। উত্তর বঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, ঘোড়াঘাট রাজশাহী প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিরা তো প্রতিনিয়ত কান খাড়া করে রাখতেন। ফকিরদের আনাগোনা আঁচ করা মাত্রই বিভিন্ন স্থানে জরুরী দূত প্রেরণ করে, সংশ্লিষ্টদেক চাঙ্গা ও ওয়াকিবহাল করে দেয়া হতো। রাজমহলস্থ প্রতিনিধি ক্যাপটেন নোডসন (Knudson) দিনাজপুরের সুপারভাইজার মিঃ কট্রেল (kottrel) ম্যাকেঞ্জী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ দ্রুত মত বিনিময় করে ফকিরদের প্রতিশোধ ও প্রতিরোধের ব্যবস্থা করতেন। ফকিররা যখন পুর্নিয়া হতে পথ পরিবর্তন করে, ধর্মীয় সফরে ঘোড়া ঘাটের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলো, তখনও তারা প্রতিরোধ এড়াতে পারেনি। প্রতিনিধিদের উষ্মা ছিল যে কেন ফকিররা বার বার বাংলায় প্রবেশ করছে, আর কেনই বা বাংলাদেশকে ফকির মুক্ত করা যাচ্ছেনা। অভিযোগ ছিলযে, দেশের এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান শহর গুলিতে ফকিররা চাঁদা সংগ্রহ করছে। এমনকি তারা গঞ্জের দারোগার নিকট হতেও নগদ চাঁদা আদায় করেছে। (১) একই ভাবে ১৭৭১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে, ঢাকার প্রধান মিঃ ক্যালসেল (Kelsall) আলেপ সিংহ পরগনাস্থ বেগুনবাড়ী অঞ্চলে সন্ন্যাসীদের খবর দেন। অথচ ঢাকার সুপারভাইজার জানানযে, দেশ এখন সম্পূর্ণরূপে সন্ন্যাসী মুক্ত (২) মজনু শাহ যেন চক্ষের বালি। যেমন করেই হোক, তাকে জীবন্ত পাকড়াও করাই চাই। আর এজন্যই রেনেলের জরুরী আবেদন ক্রমে তার বাহিনীতে দু কোম্পানী অতিরিক্ত সেনা ঘোড়াঘাটে পাঠানো হয়। এযুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে রেলন বলেন" ২৫ তারিখ সকালে স্বল্পকাল স্থায়ী এক খন্ড যুদ্ধে ফকিরদল পরাজিত হয়ে, ছত্রভংগ ভাবে পলায়ন করে। তাদের নেতা শেখ মজনু ঘোড়ায় চড়ে মাস্তানগড়ে পলায়ন করে। রেনেল আরও বলেন আমি তাকে বন্দী করার আশা নিয়ে মাস্তানগড়ে গিয়ে শুনতে পেলাম, মজনু কয়েকজন অনুচর সহ পুর্নিয়ার দিকে চলে গেছে।

ঘোষ প্রাগুক্ত ৪৩, ঢাকার সুপার ভাইজারের চিঠি

www.amarboi.org

আমি তাকে পাকড়াও করার জন্যে একদল জামাদার পাঠালাম। আমার ধারণা, অসুস্থ্য মজনু দ্রুত ভাগতে পারবেনা। ফকিররা যাতে জমায়েত বদ্ধ হতে না পারে, সেজন্য টেইলর্সকে মহাস্থানে অবস্থানের জন্য নির্দ্দেশ দেয়া হলো, পুর্নিয়া ও দিনাজপুরের সুপারভাইজারকেও মজনুর স্বদেশ, মাখনপুর যাওয়ার পথ রোধ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করতে বলা হলো। পাহাড় এবং মস্তান গড়ের দরগা স্বাভাবিক শক্তিকেন্দ্র (Natural strength) বলে পরিচিত, পাহাড় ভীষণ বন্ধুর এবং ঘন গাছের সমাহারে পরিবৃত সামান্য প্রচেষ্টাতেই ইহা দুর্ভেদ্য দূর্গে পরিনত হতে পারে, যা কমপক্ষে একটি শক্তিশালী সমর বহরকে প্রতিরোধ করতে পারবে। ২

মহাস্থান গড়ের তদানীন্তন অস্থায়ী আস্তানা, ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে পেরে রেনেল খুব স্বস্তি বোধ করেন এবং এখানে একটি প্রতিরোধমূলক স্থায়ী চৌকি স্থাপন করেন।

রাজশাহী, বগুড়া ও শেরপুর অঞ্চলে ফকিরদের আভির্ভাবঃ

১৭৭২ সালে শীত মওসূমে ৫০ হাযারের একটি দল বাংলার কৃষি ভূমিতে আপতিত হয়। এ সময় রংপুরের নিকটস্থ ভিতরবন্দ ও স্বরূপ পুর (রাজশাহীর অন্তর্ভুক্ত) পরগনায় ফকিরদের অবস্থান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। খারাপ উদ্দেশ্যে তারা রংপুর ও দিনাজপুরের মধ্যবর্তী রাস্তায় অবস্থান নিয়েছিল। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে তাদের উপদ্রপ বেড়ে চলে। নিঃস্ব কৃষক, সম্পত্তি ভ্রষ্ট জমিদার ও বেকার সৈন্যদল তাদের সাথে যোগ দেয়।

বগুড়ায় সন্ন্যাসী

১৭৭৩, জানুয়ারী ৬, "বোগরার কালেক্টর মিঃ হ্যাচ (Hatch) এর রির্পোটে জানা যায় ৩ হাযারের একটি সন্ন্যাসীদল চৌগাও (Chowgaon) পরগনায় আগমন করে পরগনায় চৌধুরীর নায়েবকে টাকা না দেয়া পর্যন্ত বন্দী করে রেখেছিল এবং চলার পথে তারা নিকটস্থ গ্রামগুলি লুট করেছিল। সন্ন্যাসীরা এই সময় বোগরা শহরের ১২ মাইল দক্ষিনে শেরপুরে অবস্থান করছিল।"

www.amarboi.org

৮ জানুয়ারী অপর একটি রিপোর্টে তিনি জানান ২ হাযারের একটি দল ১শত ঘোড়া এবং ৮০টি গরুর গাড়ী বোঝাই অস্ত্র সহ বোগরায় সমবেত হয়েছে। প্রজারা ভয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। জনৈক সরকারী উকিলের মাধ্যমে সন্ন্যাসীদের সাথে আলোচনা হয়েছে। উকিলের সাথে দুই চৌধুরীর নায়েবরাও ছিল। দীর্ঘ আলোচনার পর চৌধুরী সন্ন্যাসীদের ১২০০ টাকা দিতে স্বীকার করে এবং পাবলিক ট্রেজারী থেকে ঐপরিমান টাকা দেয়া হলে সন্ন্যাসীরা শেলবর্ষ ছেড়ে শিবগঞ্জে চলে যায়। সেখানে আরও ৪ হাযার সন্ন্যাসী অপেক্ষমান ছিল।"

এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দিনাজপুরস্থ সার্কিট কমিটি,ক্যাপ এডওয়ার্ড কে সন্ন্যাসীদেক পাকড়াও করতে নির্দ্দেশ দেন।

একদল সন্ন্যাসী দেওয়ান গঞ্জ ও বোসনাপুর হয়ে পাকুড়িয়া পরগনার মধুপুর অঞ্চলে চলে যায়। জাফর শাহী পরগনায় ৫ হাজার সন্ন্যাসী লুট পাট করে। এমনকি, চৌধুরীর নিকট থেকে ১৬০০ টাকা আদায় করে। অতঃপর তারা আলোপ সিং পরগনার দিকে চলে যায়।

ঢাকা অঞ্চলে প্রবেশ করতে না পেরে,সন্ন্যাসীরা পশ্চিম দিকে ধাবিত হয়। ১৭৭৩ সালে ১লা মার্চে ৩ হাযার সন্ন্যাসীর বাহিনীর সাথে বড় বাজু পরগনায় ক্যাঃ এডওয়ার্সের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে মাত্র ১২জন সিপাহী ছাড়া সবাই নিহত হয়।

উত্তরবঙ্গে মজনুর পুনরার্বিভাব

দু বছর পর ফকিরদের প্রধান নেতা মজনু শাহ পুনরায়, বাংলাদেশে আবির্ভূত হন। ১৭৭৪-৭৫ সালের প্রথম দিকে দিনাজপুরস্থ প্রাদেশিক পরিষদ প্রধান, বোর্ডকে ২৮ শে নভেম্বর জানান "গোবিন্দগঞ্জের ১৬ ক্রোশ দক্ষিনে ভবানী পুরে একদল সন্ন্যাসীর আগমন হয়েছে। প্রাদেশিক পরিষদ সঙ্গে সঙ্গে পরগনার নায়েবদেক এ বিষয়ে সাবধনতা অবলম্বন করতে নির্দ্দেশ জারি করেন। ইদ্রাকপুরের নিরাপত্তা অফিসার কিষেন প্রসাদ তার বোগরা ও শেরপুরের হরকরা মারফত জানান যে,

দ্রষ্টব্য ঃ দিনাজপুর সার্কিট কমিটির নিকট শোলবর্ষের কলেকটরের প্রদত্ত চিটি তারিখ ৮ জানুয়ারী ১৭৭৩ গোপন বিভাগের কার্য বিবারণী তাং ২১ জানুয়ারী ১৭৭৩।

www.amarboi.org

প্রায় একশত নিরস্ত্র সন্ন্যাসী ভবানী পূজার জন্য ভবানীপুর উপস্থিত হয়েছে। পূজা শেষে তারা স্নানের জন্য ব্রহ্মপুত্রের দিকে চলে যাবে।"

১৭৭৬ হতে ১৭৮০ অব্দ পর্যন্ত সময়ে উত্তর বংগ অঞ্চলে মজনুশাহ ও তাঁর ফকির বাহিনীর নতুন তর তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। দিনাজপুর প্রাদেশিক পরিষদ প্রধান ১৯শে এপ্রিল ১৭৭৬ বোর্ডকে জানান" মস্তানগড় নিবাসী ধর্ম প্রাণ সুমন আলী তাকে বিদিত করেছেন, রাজশাহীর বিভিন্ন পরগনায় উৎপাতকারী মজনূ শাহ এখানে উপস্থিত হয়ে অসংখ্য অশান্তি সৃষ্টি করেছেন। "

২৪ মার্চ ১৭৭৬ গ্লাডউইন আবার লিখলেন "এর মধ্যেই শাহ মজনু একদল ফকির অনুচর সহ মাস্তান গড়ের মসজিদে আস্তানা গেড়েছে। এ পর্যন্ত তারা মেলা থেকে সামান্য চাঁদা তুলেছে। আমার হরকরা আগামীকল্য তাদের মালদহ যাওয়ার খবর এনেছে। আমি এখানে অবস্থান করা সংগত মনে করি, কারণ, সরকারী ট্রেজারি দিনাজপুরে পাঠাবার মত সৈন্য নেই এবং বর্তমানে কোন হামলার আশংকা করছিনা।"

২৬ মার্চ ১৭৭৬ মিঃ গ্লাডউইন আবার লেখেন "মাস্তান গড় মেলায় সামান্য চাঁদা আদায় ছাড়া, অন্য কোন অপকার্য না করে দল বল সহ মজনু বিগত রাতে মস্তানগড় ত্যাগ করেছে। জানা গেছে তারা রানী ভবানীর জমিদারীতে পৌছেছে।" ১৪ জুন, মিঃ গ্লাডউইন এক প্রতিবেদনে প্রাদেশিক পরিষদকে বলেন" শাহ মজনু একটি বিশাল সশস্ত্র ফকির বাহিনী সহ মস্তান গড়ে এসেছে"। প্রাদেশিক পরিষদের নিকট গ্লাডউইনকে সাহায্য করার মত কোন সৈন্য না থাকায়,তারা আশাবাদ ব্যক্ত করেন যেহেতু মজনু শুষ্কমৌসুমে মহাস্থানে কোন প্রকার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়নি হয়তঃ এবারও শান্ত থাকবে"

মহাস্থানগড় থেকে সমবেত শিষ্য মন্ডলীকে সরিয়ে নেয়ার জন্য অনুরোধ করে পরিষদ মজনু শাহকে পত্র দিয়ে তখনকার মত পরিতৃপ্তি লাভ করেন।, পরিষদের নিষ্ক্রিয় কার্যকালাপে অসন্তুষ্ট হয়ে গ্লাড উইন। ২৬ জুন, ১৭৭৬ জোড়ালো ভাষায় তার অভিব্যক্তি প্রকাশ করেন "ভদ্র মাহোদয় গণ আপনারা ভাবছেন, আমি মজনু শাহ সম্পর্কে অকারণ চিন্তা করছি শুধু আমার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার প্রশ্ন হলে, আপনাদের সাহায্য কামনার প্রয়োজন অনুভব করতাম না। প্রজাদের উদ্বিগ্নতা এবং প্রতিনিধিত্ব আমাকে কর্তব্য বোধে উদ্বুদ্ধ করায় আপনাদের শরণাপন্ন হতে হয়েছে। সে এবার শুধু গোটা কয়েক উচ্ছৃংখল বাংগালী সাথে নিয়ে আসেনি। রীতমত সশস্ত্র রাজপুত বাহিনীর নায়ক হিসেবে এসেছে। সে মহাস্থান গড়ে সেনা নিবাস ও গড়ে তুলতে শুরু করেছে এবং সারা

www.amarboi.org

বর্ষকাল এখানে অবস্থান করার প্রকাশ্য ঘোষণা করেছে, সেজন্য খাদ্য দ্রব্যাদিও সংগ্রহ করেছে। দিনাজপুর থেকে তার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য বাহিনী পাঠনো হচ্ছে শুনে, সে অনেক কষ্টে বোগরা (করতোয়া নদী) পাড়ি দিয়ে সোজা ব্রহ্ম পুত্রের দিকে চলে গেছে। পথে কোথাও বিশ্রাম করেনি। তার মাস্তান গড়ে আসার দুই বা তিন দিন পরে তার কাছে একজন কাজি পাঠিয়ে তার অভিপ্রায় জানতে চেয়েছিলাম। সে জানিয়েছে তার কিছু বন্ধকী দেনা-পাওনা আছে, শান্তিতে মাস্তান গড়ে থাকতে দিলে সে ঐ গুলি আদায় করে নিয়ে চলে যাবে। আর বাঁধা দেয়া হলে সে ভয় পায়না, বরং, প্রতিরোধের জন্য সেও প্রস্তুত।"

বগুড়া জেলার শেল বর্ষ পরগণায় কর্মরত ইংরেজদের বিচক্ষণ প্রতিনিধি গ্লাড উইন মজনু শাহকে কঠোর হস্তে দমন কল্পে পরিষদের ত্বরিত সাহায্য কামনা করে যে আবেগ ও উদ্বেগপূর্ণ পত্র লিখেছিলেন, তদুত্তরে পরিষদ, বিনীত ভাষায় অপারগতা স্বীকার করে বলেছিলেন যে সৈন্যদের স্বল্পতা হেতু আপনার সাহায্যার্থে সৈন্য প্রেরন সম্ভব হয়নি। আপনার দরখাস্তের গুরুত্ব অনুধাবন করাসত্বেও ব্যবস্থা গ্রহন করা যায়নি।

মজনু ফকিরের গতি বিধির উপর সার্বক্ষনিক সতর্ক দৃষ্টি রাখা হতো। ১৭৭৬-৭৭ সালে বর্ষা মওসুমে হঠাৎ করে রটনা করা হোল যে, মজনু ফকির উত্তর দিকে যাত্রা করেছেন। তাজপুর পরগণার অনিলরাম লোচন রায় এর রিপোর্টে প্রাদেশিক পরিষদ ঐ পরগনায় বহরামপুর গ্রামে মজনুর আগমনও গন্ড গোলের খবর পেয়ে ঐ দিনই (১লা সেপ্টেম্বর ১৭৭৬) সাহেব গঞ্জের ক্যাঃ পোফামকে দুই কোম্পানী সিপাই প্রেরণের নির্দেশ দেন। কিন্তু এই তথ্যটি ভ্রান্ত বলে প্রমানিত হয়। পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়ায় অসুবিধা দেখা দেয়ায় মজনু তার স্বাভাবিক আশ্রয় কেন্দ্র বোগরা জেলায় প্রত্যাবর্তন করেন। (His usual places of shelter in Bogra district) ১৭৭৬ ৩০ অক্টোবর (১৭৭৬) মিঃ গ্লাড উইন গভর্নর জেনারেল কে জানানযে, ফকিরেরা কুষ্টা থেকে ঘোড়াঘাটের দিকে চলে গিয়েছে। বর্তমানে বিচ্ছিন্ন ভাবে থাকলেও প্রচুর আদায়ের জন্য মৌসুম কালে তারা তাদের মিলন কেন্দ্র মস্তান গড়ে সমবেত হবে।" গ্লাড উইন আরও জানান যে ফকিরদের সাথে কোন এক ব্যাটেলিয়ানের ২৫ জন পলাতক সৈন্য ও আছে।

www.amarboi.org

লেঃ রবার্ট সনের নেতৃত্ব ফকিরদের বিরুদ্ধে বহরমপুর থেকে একদল সৈন্য পাঠানো হয় । ১৭৭৬ সালের নভেম্বর ১৪ তারিখে বোগরার চার মাইল দূরবর্তী এক স্থানে যুদ্ধ হয়। গ্লাডউইনের কাছে লিখিত পত্রে রবার্টসন যুদ্ধের নিম্নরূপ বর্ণনা দিয়েছেন "গত রাত ৯টায় ক্যাম্প থেকে যাত্রা করে, নয় ক্রোশ পথ অতিক্রম করে, আজ সকালে সূর্যোদয়ের আগে আমরা মজনুর শিবিরের নিকটে উপনীত হই। অতর্কিতে আক্রমন করলে তারা হাতিয়ার নিয়ে দাঁড়ায়। আমরা সরাসরি আক্রমন চালাই। ফকির দল অবস্থান স্থলের পেছনে একটি ছনের জংগলে লুকিয়ে পড়ে। সেখান থেকে তারা আমাদের প্রতিগুলি বর্ষণ শুরু করে। আমাদের পাঁচ জন সৈন্য সহ আমি নিজেও আহত হই। সম্পূর্ণ আক্রমনের পরও তারা যে এভাবে রুখে দাঁড়াতে পারবে,আমি তা ভাবতে পারিনি। প্রায় অর্দ্ধঘন্টা যুদ্ধ চলার পর, ফকির দল স্থান ত্যাগ করে। মজনু ঘোড়ায় চড়ে পলায়ন করতে সক্ষম হয়। কিছু দূরে তার আহত ঘোড়া পাওয়া গিয়েছিল। আমরা ২০ জন ফকিরের মৃত দেহ পেলাম। যুদ্ধ শেষে তাদের পরিত্যক্ত কয়েকটি লম্বা রকেট, গাদা বন্দুক তরবারি ও ঢাল পাওয়া গেছে।

জেলায় মজনুর অবস্থান দীর্ঘায়িত হয়েছিল। সম্ভবতঃ সে অপ্রত্যাশিত ভাবে অন্যদল কর্তৃক চূড়ান্ত পর্যায়ে পরাজিত হওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিলো। খুব সম্ভব এ সময় হিন্দুও মুসলমান সাধুদের মধ্যে পুরাতন শত্রুতা জাগ্রত হয়েছিল। বোগরা ডিষ্ট্রিকট গেজেটিয়ারের মতে "১৯৭৭ সালে ২০০ নাগা সন্ন্যাসীর একটি দল উত্তর দিক থেকে বোগরায় আগমন করে। তাদের আগমনের উদ্দেশ্য জানা যায়নি। লোকে বলে ডাকাতদের আড্ডাখানা ভেংগে দেয়ার জন্যেই ওদের আগমন। তারা নাকি ঘোড়ায় চড়ে লম্বা তরবারি সহ আগমন করে। সারা দিন ধরে যুদ্ধ করে। মজনুর ছোট একটি পুত্র বাদে, ডাকাত দলের সবাই নিহত হয়। এই যুদ্ধের অনতি দূরে অবস্থিত নালাটি অদ্যাবধি "ফকির কাটা নালা নামে পরিচিত। ইহা চাপাপুর গ্রামের নিকট অবস্থিত। এরপর নাগারা দক্ষিনদিকে এবং কিছু পরে পূর্বদিকে ময়মনসিংহ ও গোয়াল পাড়ায় যাত্রা করে।

দোষ প্রাগুক্ত পৃঃ ৭৪, তরফদার শামছুদ্দীন দুই শতাব্দীর বুকে।

www.amarboi.org

বাংলার ফকির সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহের কাহিনীর যেন শেষ নেই। আরও কিছুদিন হাতে সময় থাকলে, ইংরেজ প্রতিনিধিরা হযতঃ আরও নতুন নতুন কাহিনী ফেদে বসতেন। ফকিরদের বিদ্রোহের কাহিনী কোন পরোক্ষ ও গৌণ বিষয় ছিলনা। বিষয়টি অবলম্বনে বিশেষজ্ঞরা অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। রচনা গুলোর সমগ্র বিষয় বস্তুই ইংরেজ প্রতিনিদের প্রতিবেদন নির্ভর। বগুড়ার তদানীন্তন ক্যালেকটর মিং হ্যাচ (Hatch) থেকে শুরু করে গ্লাড উইন, হিস্টিংস লর্ড ক্লাইভ, ম্যাকেঞ্জী রবাটসন, মিঃ চ্যাম্পিওন, রংপুরের ক্যালেকটর মেজর ডোন, বেগুন বাড়ীর কুঠির রেসিডেন্ট হেনরি লজ, মেজর বুকানন, দিনাজপুরের সার্কিট কমিটি, দিনাজপুরের রাজস্ব পরিষদ লেঃ উইলিয়াম এডওয়ার্ডস প্রমুখ প্রতিনিধিগণ ও সংস্থা সমূহ তাদের এক পেশে কথা কাহিনীতে যেসব বেদ বাক্য তুল্য কথা লিপিরদ্ধ করেছেন, আজ তক হুবহু উহাই অসুসৃত হয়ে আসছে।

ফকির সন্ন্যাসীদের কল্পিত সেই বিদ্রোহ বগুড়া জেলার শেরপুর ও ভবানী বাড়ী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল হেতু সংগত কারনেই শেরপুরের ইতিহাসে উহার ছিটে ফোটার আলোক পাত করা হোল। ইংরেজ প্রতিবেদকগণ, ফকির সন্ন্যাসীদেক কেবল দস্যু তস্কর,লুটেরা ইত্যাদি অপবাদ সূচক ও অভিশপ্ত শব্দাবলী উপহার দিয়েই ক্ষান্ত হননি বরং শেষ কথায় তাদেক মহাপাতকী বলেও আখ্যায়িত করেছেন। এ বাহিনীকে বরাবর তুচ্ছার্থে সম্বোধন করা হয়েছে। ব্যাপারটা যেন এমন যে, সাদা চামড়ার দখলদাররা ছিলেন ফেরেস্তা তুল্য আর হৃত স্বাধীনতা উদ্ধার কামী ফকির বিদ্রোহীরা ছিল আস্ত ম্লেচ্ছ নাদান। এদের পেছনে চারদিক হতে লেলিয়ে দেয়া হতো অনুগত চৌ কোশ বাহিনীকে। ভ্রাম্যমাণ ফকির বাহিনী, একান্ত প্রাণ রক্ষার জন্য হাট বাজার হতে সামান্য চাঁদা আদায় করলেই উহাকে লুট-তরাজ বলে ঢাক ঢোল পেটানো হতো ধাওয়া করা হতো কঠোর হস্তে পাকড়াও ও শায়েস্তা করা হতো। বাংলা এবং বাংলার মাটিতেই ফকির মজনুর শিরোচ্ছেদ ঘটানো ছিল ইংরেজ প্রতিনিধিদের প্রাণপণ সংকল্প ও গভীর ষড় যন্ত্র। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উহা হয়ে উঠেনি। কারণ, মজনু ফকির নিজের জন্মস্থান মাখনপুরেই মৃত্যু বরণ করেন। মজনু ফকিরের আপাদ মস্তক কলংক লেপনের ভাষার ছড়া ছড়ি হলেও ইংরেজদের স্বহস্ত লিখিত কাহিনীতে, অলক্ষ্যে মজনু ফকিরের এমন কতিপয় সুখ্যাতি লিপি বদ্ধ হয়ে গেছে,যা গভীর ভাবে অনুধাবন করলে, তাকে সফল ফকির সম্রাট না বলে পারা যায়না।

www.amarboi.org

চৈনিক পরিব্রাজক হিউ এন্থ-সাংকথিত শেরপুরে কুড়িটি সংগারামের একটি প্রখ্যাত বৌদ্ধ ধাপযা শেরপুর থানার জামুর গ্রামে অবস্থিত। (বিষয়টি যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে।

www.amarboi.org

অষ্টম অধ্যায় (পরিশিষ্ট)

মুক্তিযুদ্ধ ও শেরপুর

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রাম যেন এক অস্বাভাবিক ব্যাপার। ইহাকে অপূর্ব ও অলৌকিক সফলতা বল্‌লে অত্যুক্তি হবেনা। কারণ, মাত্র ৯' মাসের একটি পারোক্ষ যুদ্ধ চালিয়ে পাকিস্তানের লৌহ কঠিন শাসন যন্ত্রের অক্টোপাস হতে মাতৃভূমিকে বিচ্ছিন্ন করে আনা কি ছোট্ট খানিক কথা? এ যেন আস্ত এক রাতা রাতি কান্ড আরকি? কিন্তু বাস্তবিকই কি তাই? দৃষ্টির গভীরতা দিয়ে একবার বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কেবল নয় মাস মাত্র নয়, বরং এ সময় সীমা দীর্ঘায়িত হতে হতে তিনশ বছর পর্যন্ত পেছনে চলে গেছে। ১৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের কথা। সম্রাট আকবর হঠাৎ করে আমাদের মাতৃভূমি বাংলাকে দখল করে নেন। এই অধীনতার শৃংখল ছিন্ন করার জন্য সোণার গায়ের ঈসা খাঁ, সম্রাট আকবরের দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। শেষ রক্ষা না হলেও সেদিন থেকেই আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করার পালা শুরু হয়েছিল। অতঃপর মুঘল সাম্রাজের চরম পতন যুগে ১৭৬৫ সালে শেরপুর সহ গোটা উত্তর বঙ্গ বেনিয়া ইংরেজদের করতলগত হয়ে পড়ে। এরপর শুরু হয় শোষণ ত্রাসন আর উৎপীড়নের দীর্ঘ স্থায়ী মহড়া। ইংরেজ বেনিয়াদের এই অকথ্য নির্যাতন কিন্তু নির্বিকার চিত্তে মেনে নেয়ে হয়নি তখন। বরং সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল সংগ্রামী জনতার দ্বারা। ১৭৫৭ সাল থেকে ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এদেশের বুকে অসংখ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে। এসব বিদ্রোহকে এক কথায় বলা চলে গণ বিদ্রোহ। ব্রিটিশ সৃষ্ট সামন্ত তান্ত্রিক শক্তি অর্থাৎ ভূ- স্বামী শ্রেনী ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগন তাদের অসহায় শৃংখলিত হাতে হাতিয়ার তুলে ধরেছে বহু বার। বার বার পরাজিত হয়েছে, লাঞ্ছিত হয়েছে, প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে তবুও সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়ায়নি। ব্রিটিশ শাসনারম্ভের প্রাথমিক একশ বছরের বেশী কালধরে, মুসলমানরা অবিরাম, নিশংক চিত্তে ও নিঃশেষে আত্মদানের আদর্শ নিয়ে সংগ্রাম করেছে স্বৈরাচারী ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে। মুসলমানদের বিরামহীন বেপরোয়া সংগ্রামকে ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠী একটা ভয়াবহ বিপদের উৎস বলেই মনে করতেন। তাই ভারতের রাজ প্রতিনিধি লর্ড কানিং, অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে বলেছিলেন "মহারাণীর বিরুদ্ধে অনবরত সংগ্রাম করাই কি মুসলমানদের ধর্মের অনুশাসন?"

www.amarboi.org

দেশের মোট জনসংখ্যার ৮৫ ভাগ কৃষক। শ্রমিক শ্রেণীর জন্ম ও এই কৃষক সম্প্রদায় হতেই। কিন্তু দুঃখের বিষয় জমিদার-মহাজন আর শাসক গোষ্ঠীর শাসনের প্রধান শিকার হলো এই কৃষক শ্রেণী। জমিদার, মহাজনের শাসন পীড়নের সাথে শুরু হয় ব্রিটিশ নীলকরদের অমানুষিক অত্যাচার। এই ত্রিমুখী শোষণ পীড়ন আর অত্যাচারে দিশেহারা হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার কৃষক। একই সংগে চাকুরী হতে বিতাড়িত হাযার হাযার বেকার সৈন্য ও শিল্প ধবংসের ফলে বিভিন্ন পেশা হতে বঞ্চিত অগণিত দিন মজুর এই সংগ্রামে শরীক হয়। ফলে সংঘটিত হলো ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, ত্রিপুরার শমসের গাজীর বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, সিরাজগঞ্জের বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন, ফারায়েজি আন্দোলন, সন্দ্বীপ বিদ্রোহ এবং ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহ ও নীল বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ। এসব সংগ্রাম প্রাথমিক ভাবে কৃষক জন সাধারণের মুক্তির জন্যই সংঘটিত হলেও মূলতঃ ছিল স্বাধীনতা ও মুক্তির সংগ্রাম। এসব বিদ্রোহের মধ্যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, অধিকার ও স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রয়াস ছিল সুস্পষ্ট। এ সব সংগ্রাম ও বিদ্রোহ, সুষ্ঠু পযরিকল্পনার অভাব, সাংগঠনিক দূর্বলতা ও সাম্রাজ্য বাদী সাহায্য কারীদের বিশ্বাস ঘাতকতায় ব্যর্থতায় পর্ববসিত হয়েছে। হাযার হাযার কৃষক জেল খেটেছে, মৃত্যু বরণ করেছে কিন্তু আপোষ করেননি।

সংগ্রামী হিন্দু- মুসলমানদের মধ্যে একতা থাকা স্বত্তেও ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহের দুঃখজনক পরিণতির অন্যতম কারণ- দেশের ভূ-স্বামী ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেনীর বিশ্বাস ঘাতকতা।

এই বিশ্বাস ঘাতকতার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাহত হলেও একেবারে থেমে থাকেনি। ক্রমান্বয়ে ইহাকে বেগবান করে নিখিল ভারতের একক আন্দোলনে পরিনত করা হয়। এই আন্দোলনের তোড়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ইংরেজ শক্তি, আমাদের হাতে স্বাধীনতার পতাকা তুলে দিতে বাধ্য হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান মর্মে মর্মে সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে,পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থপর হটকারী নেতৃত্ব কোন ক্রমেই ন্যায্য রাজনৈতিক অধিকার হস্তান্তর করতে আগ্রহী নহে। তারা কোন সমঝোতা ছাড়াই একটা অযৌক্তিক কিছু করে বসতে পারে হেতু, তিনি মার্চের বিপ্লবী আহবানে দেশবাসীকে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে নির্দেশ দেন। এই নির্দেশে সারা দেশের ন্যায় শেরপুরে ও আরম্ভ হয় অসহযোগ আন্দোলন। বিপ্লবী ছাত্র -জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা বিক্ষোভের ভাষায় বলতে থাকে" ভুট্টোর বক্ষে লাথি মার, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, ইত্যাদি ইত্যাদি। এখানে দতানীন্তন ছাত্র নেতা মজিবর রহমান মজনু ও আবদুস ছাত্তারের নেতৃত্বে গঠিত হয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ।

www.amarboi.org

ধারনা করা হয়েছিল যে প্রচন্ড অসহযোগ আন্দোলন হতে শিক্ষাগ্রহন করে পশ্চিম পকিস্তানের নেতৃবর্গ হয়তঃ একটা সন্তোষ জনক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন, কিন্তু তা না করে ভাঁড়ামির অপকৌশলে সময় ক্ষেপণ করে রাতারাতি হানাদার বাহিনী পাঠিয়ে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে গণ হত্যা শুরু করে দেয়। অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্ন স্বল্প শক্তিদ্বারা, গণহত্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয় হেতু অগত্যা সংগ্রামী নেতৃবর্গ পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে শরনাপণ্ন হন। সাময়িক নেতৃত্ব শূন্যতার সুযোগ হানাদার বাহিনী কোন প্রতিরোধ ছাড়াই বেপরোরা হত্যাযজ্ঞ চালাতে থাকে।

এই হত্যা যজ্ঞের বিরুদ্ধে ক্রমান্বয়ে গণ রোষ ফুঁসে উঠতে থাকে। বিষয়টি আচ করতে পেরে পাক বাহিনী কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করে। তারা নিজেদের অপকাজ লঘূ করে দেখানোর জন্য, রাজাকার বাহিনী গঠন করে নিরীহ জনগনকে জড়িয়ে ফেলে। কিন্তু এতে শেষ রক্ষার পরিবর্তে মুক্তি যোদ্ধাদের প্রতিরোধের মুখে হানাদার বাহিনী আড়ষ্ট হয়ে উঠে।

১৯৭১ সালের মার্চ মাসের ২৪ তারিখ শনিবার সকাল বেলা হঠাৎ প্রবেশ পথের দুপার্শ্বের ঘরবাড়ী শেলের মাথাতে ধ্বংশ করতে করতে মধ্য শহরের মধ্যস্থলে উপনীত হয়। এ যেন খালি ময়দানে একক দলের এক তরফা বর্বরোচিত বাহাদুরি। শহরটি তখন ছিল প্রায় জনশূন্য। অলি গলিতে দু চার জন যারা হানাদারদের সামনে পড়ে গেল অমনি তাদেক গুলির আঘাতে ঝাঝড়া করে ফেলা হলো। ইংরেজদের কবল হতে মুক্তি হয়ে আমরা ১৯৪৭ সালে যে ভূখন্ড টি লাভ করি তা পাকিস্তানের অংশ রূপে গন্য হয়। আমরা অভিন্ন স্বার্থে পাকিস্তানের অনুসরণ করতে থাকি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, তারা আমাদেক সম মর্যাদা দিতে ব্যর্থ হয় এবং বৈষম্যের পাহাড় সৃষ্টি করে বসে। তদানীন্তন পশ্চিম পকিস্তানের চরম আচরণে, বাংলার জাগ্রত জনতা ক্রমান্বয়ে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে ১৯৭১ সালে অতীত সংগ্রামের রেশধরে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হন জান প্রাণ দিয়ে। সারা বাংলার আনাচ কানাচ হতে লাখো বাংগালী পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতে আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ গ্রহন করে মাতৃভূমিকে হানাদার পাক বাহিনীর পৈশাচিক কবল হতে মুক্ত করার জন্য জান কবুল সংগ্রাম শুরু করে দেন। দেশের অগনিত মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে শেরপুরের জানবাজ নওজোয়ানরা ছিলেন অন্যতম।

www.amarboi.org

মুক্তি যুদ্ধের প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত শেরপুরের অবস্থা ছিল চরম অস্বস্তিময় ও শাসরুদ্ধ কর। মুক্তি যুদ্ধ সম্পর্কে শেরপুরের সাধারণ মানুষ প্রাথমিক অবস্থায় দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এদিকে হানাদার বাহিনী এখানে অনু প্রবেশ করেই রক্তক্ষয়ী আক্রমণ শুরু করে দেয়। হায়েনা গোষ্ঠী ভারি ভারি শেল বর্ষন করে অগ্নি সংযোগ আরম্ভ করে দেয়। শেরপুরে অবস্থিত তদানীন্তন হাবিব ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংক দুটি শেলের প্রাচন্ড আঘাতে উড়িয়ে দেয়া হয়। তাছাড়া ঘর বাড়ী দোকান পাট সহ শেরপুর কলেজটি জ্বালিয়ে দেয় তারা। কলেজ অঙ্গনে ১১ জনকে এক সংগে ব্রাস ফায়ার করে হত্যা করা হয়। এদের মধ্যে শ্রীরামপুরের জনাব মাদার বখশ কিছুদিন বেঁচে অবশেষে ধুঁকে ধুঁকে প্রাণ ত্যাগ করেন। একইভাবে বাঘড়া কলোনীর ২৬ জন নিরীহ মানুষকে একযোগে হত্যা করা হয়। মাকড় খোলাও ঘোষা ব্রীজের কাছেও একই নৃশংস কান্ড ঘটানো হয়। গণ হত্যার এই প্রচন্ড ত্রাসে পাড়া গ্রামের লোকজন বিভিন্ন দিকে পালিয়ে যায়। প্রাথমিক ভাবে পক্ষকাল পর্যন্ত একনাগাড়ে এই নির্মম হত্যা কান্ড চলতে থাকে। এ সময় শেরপুর শহরে কোন জন মানবের সাড়া শব্দ পর্যন্ত শোনা যেতোনা। শহর-বন্দর ও হাটে ঘাটে যাতায়াত সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ হয়ে যায়। যারা পাক বাহিনীকে কাম্য মনে করেছিল, তারাও ক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী হয়ে উঠে। কিন্তু পক্ষ ত্যাগ করে ভারত গমনের সাহস পায়নি তারা। কারণ, মুক্তিযোদ্ধাদের আস্থা অর্জন ছিল সন্দেহ জনক। অগত্যা তারা মরে বেঁচে এখানেই থেকে যেতে বাধ্য হয়। এক শ্রেণীর ইতর মানুষকে এই ভয়াবহ অবস্থার মধ্যেও লুন্ঠন কার্যে লিপ্ত থাকতে দেখা গেছে। প্রায় মাসাধিক কাল পর সেনাবাহিনীর উর্দ্ধতন ব্যক্তিরা এখানে এসে, শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রহসন করে শান্তি কমিটি গঠন করে। ইচ্ছার বিরুদ্ধেই অনেকের নাম কমিটি ভূক্ত করা হয়। আবার অনেকে কমিটি ভুক্ত হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে। শান্তি কমিটি আশাবাদী হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষে গঠনমূলক কাজ, যথা লুন্ঠন রোধ, পরিত্যক্ত ঘর বাড়ী ও সম্পত্তি সংরক্ষণের প্রচেষ্টা চালায় কিন্তু হানাদার বাহিনীর প্রশাসন, কোন তোয়াক্কা না করে আপন গতিতে চলতে থাকে। এসব দেখে শুনে শান্তি কামী মানুষেরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেন। অনেকে এ দুঃসহ অবস্থা লক্ষ্য করে নিরাপদ দূরত্বে চলে যান। আবার সুযোগ মত কেউ কেউ ভারতে পাড়ি জমান। জনাব আবদুর রহীম লালু প্রাথমিক অবস্থায় শেরপুরেই অবস্থান করেন, কিন্তু পরিশেষে অতীষ্ঠ হয়ে ভারতে চলে যান।

www.amarboi.org

হানাদার বাহিনী শেরপুরে জানমালের যে ক্ষয় ক্ষতি সাধন করেছে, তা হিসেব করে বলা কঠিন। মুক্তিযুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হলে এই ক্ষতির পরিমাণ আরও বহুগুণে বৃদ্ধি পেতো। মুক্তিযুদ্ধ চলা কালীন অনেকে দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করে চলেছে। এ থানার ইউনিয়ন পরিষদের এমনও চেয়ারম্যান দেখা গেছে যে, তারই সক্রিয় প্রচেষ্টা ও আদেশে নিরীহ লোকেরা রাজাকার বাহিনী গঠন করেছে, স্বাধীনতা অর্জনের পর সেই চেয়ারম্যান ব্যক্তিটি আবার রাজাকারদেক ধরে ধরে আইনে সোপর্দ্দ করেছেন। অনেকে আবার রাতারাতি মুক্তি যোদ্ধা হওয়ারও প্রয়াস পেয়েছে।

যা হোক! মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন এখানকার যোদ্ধাদের নাম শুনেছি কিন্তু একবারও মুখোমুখী হওয়া যায়নি। তাদের সংগে অনেকবারই মত বিনিময়ের ইচ্ছা করেছি কিন্তু তা হয়ে উঠেনি। অন্য থানার তুলনায় এখানকার বীর যোদ্ধারা দালাল শ্রেনীর লোকদের বিরুদ্ধে সামান্যই হস্তক্ষেপ করেছেন। অন্য কথায় বীর মুক্তি যোদ্ধাদের কৃতিত্ব অতীব প্রশংসনীয়। শেরপুর হতে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহন করেছিলেন তাদের মধ্যে সর্ব জনাব কমরেড আব্দুস সাত্তার, তোফাজ্জল হোসেন, ফেরদৌস জামান মুকুল, আশরাফ উদ্দিন সরকার মুকুল, রেজাউল করিম বাবলু, আঃ রহীম লালু, আবু জেহাদ ইবনে মোস্তফা (তাজ) আবু আলম, আল ইরাফি জুয়েল, আঃ জলিল , ইউসফ উদ্দিন, মুখলেছুর রহমান, হাবিবুর রহমান,জছিম উদ্দিন নূরুল ইসলাম আবদুর রাজ্জাক খান, আবদুর রাজ্জাক ইয়া নিমাইচন্দ্র ঘোষ জনাব জাফরউল্লা খান, জনাব আব্দুল বারী, জনাব জসিম উদ্দিন, জনাব শাহাব উদ্দিন চৌধুরী প্রমুখ ব্যক্তি সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। বীর মুক্তিযোদ্ধাদের স্মরণীয় নাম যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পাতায় অম্লান হয়ে থাকবে নিশ্চয়। মুক্তিসংগ্রাম এক অতীব ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান বটে। বিপন্ন জীবন অপেক্ষা, মৃত্যুই শ্রেয় হেতু, স্বাধীনতা কামী নওজওয়ানরা জীবনকে হাতের মঠোয় নিয়েই সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমাদের দামাল ছেলেরা তাদের জীবনকে তুচ্ছ করতে পেরেছিল বলেই মাত্র ৯ মাসেই স্বাধীনতার পতাকা উড্ডীণ করতে সক্ষম হয়েছিল। গেরিলা যুদ্ধ অর্থই বন বাদাড় আর দুর্গম্য পথে প্রান্তরে জীবন নিয়ে খেলা করা। কত সোণার ছেলেরা যে অকাতরে দেশের জন্য জীবন দিয়েছে, তার হিসাব কি আমরা জমাতে পারব? স্বাধীনতা অর্জন হয়েছে বলেই যুদ্ধ ফেরৎ দামালরা, সকল কায় ক্লেশ দুঃ খ যাতনা ভুলতে পেরেছে। এর অন্যথা হলে ওরা নিথর পাষাণ হয়ে যেতে বই কী? জীবিত মুক্তি যোদ্ধারা এখন দেশ গড়ার কাজে ব্যস্ত। তারা কথায় কথায় নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করে বেড়ায়না।

www.amarboi.org

মুক্তিযুদ্ধে সারা দেশের ন্যায় শেরপুরও ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠেছিল। হানাদার বাহিনী অতর্কিতে শেরপুর শহরে প্রবেশ করে লংকা কান্ড শুরু করে দেয়। লোমহর্ষক সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে সারাটা শহর মুহূর্তের মধ্যে তছনছ করে ফেলে। এ যেন মরার উপর খাড়ার ঘা, আর মশা মারতে কামান দাগানোর মত বর্বোরচিত কান্ড। শক্তিশালী শেল বর্ষণ করে করে শহরটা মুহুর্তের মধ্যে ছার খার করে ফিলেছিলো। হায়েনা বাহিনী আসছে শুনে এমনিতেই শহরটা আগে থেকেই জণ বিরল হয়ে পড়েছিল। ছিটা ফোটা ও বিক্ষিপ্ত ভাবে শহরের কোন কোন অংশে যারা অবস্থান করছিলো তারা আচমকা সাঁড়াশি আক্রমনের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে এদিক ওদিক পালাতে গিয়ে অনেকেই লাশ হয়ে রাস্তায় লুটে পড়ে। শ্রী অমিয় গোপাল কুন্ডুর ভ্রাতা, মনি গোপাল কুন্ড জল্লাদদের হাতে নিহত হন। একইভাবে শ্রী অনীল বসাকের যুবক পুত্র রঞ্জন বসাক মারণাস্ত্রের গুলিতে প্রাণ হারায়। নিকৃষ্টতম পেশার ঝাড়ুদাররা কমপক্ষে হায়েনাদের আক্রোশ হতে রক্ষা পাওয়ার কথাছিল। কিন্তু না। ওদেরও অনেকেই প্রাণ হারিয়েছে নিষ্ঠুর বাহিনীর হাতে। মুর্শীদাবাদ হতে বিনিময় সূত্রে আগত, জনৈক নীরহ ব্যক্তিকে ওরা সেই যে তুলে নিয়ে গেছে, আর সে ফিরে আসেনি নিজ গৃহে।

শেরপুর কলেজের যে গৃহটিতে বিজ্ঞানের সরঞ্জাম আর মূল্যবান বই পত্র সংরক্ষিত ছিল, সেটি তারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল শেলের আঘাতে। অপর একটি কক্ষে কলেজের দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় খাতা পত্র সহ সংরক্ষিত অন্যান্য দ্রব্যাদি ও জ্বালীয়ে দেয়া হয়েছিল একই সময়। এরপর হানাদার বাহিনী পশ্চিম দিকে পথ ধরে বাঘড়া কলোনীতে উপনীত হয়। কলোনীর উত্তর প্রান্তে একটি ইট ভাটার নিকট তখন আবাল বৃদ্ধ মিলে ২৬/২৭ জন সমবেত ছিল। হানাদার বাহিনী অদেক ব্রাশ ফায়ার করে ২০ জনকে নির্মম ভাবে হত্যা করে। মাতৃকোল খালি আর বিধবা করে ফেলে হতভাগ্য মা বোনদেক। বলতে গেলে সেই মুহূর্তে বাঘড়া কলোনীটি পুরুষ শূণ্য হয়ে পড়েছিল। সেই লোমহর্ষক কাহিনীটা মনে পড়লে এখনও আপাদ মস্তক শিহরে উঠে।

একই ভাবে সংঘটিত হয়েছিল আর একটি হৃদয় বিদারক ঘটনা মির্জাপুর ইউনিয়নের দড়িমুকন্দ গ্রামে। সেখানে জল্লাদ বাহিনীর লোকেরা ২৬ জন নিরীহ গ্রাম বাসী পুরুষকে কাতার বন্দী করে এক যোগে হত্যা করে।

www.amarboi.org

শেরপুর শহরে বিরতিহীন জ্বালাও পোড়াও ও নারকীয় কান্ড চল্‌তে থাকে। শান্তি প্রিয় নিরীহ লোকেরা এই ধ্বংসাত্মক ও পোড়া মাটি কার্য কলাপ দেখে হত বিহবল ও নিরাশ হয়ে পড়ে। এ চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় পরামর্শ পাওয়ার মত কোন অবকাশই ছিলনা। জ্বালাও পোড়াও আর হত্যাযজ্ঞ থেকে নিবৃত করা যায় কিনা ভেবে, কিছু সংখ্যক দরদি মানুষ, তদানীন্তন শেরপুর থানার বিচার বিভাগের ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব গিয়াস উদ্দিন পাঠানের শরণাপন্ন হয়। পাঠান সাহেব তখন আত্মরক্ষার তাগিদে থানা পরিষদ চত্বর ত্যাগ করে, শেরপুর আলীয়া মাদ্রাসার একটি কক্ষে অবস্থান করছিলেন। তাঁর পরামর্শ ক্রমে শহর ও পার্শ্ববর্তী মহল্লার প্রায় চার'শ মানুষ জীবন বাজি রেখে প্রতিবাদ ও দৃষ্টি আকর্ষণ মূলক একটি মিছিল বের করে শহরের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে, প্রধান রাস্তা ধরে উত্তর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মিছিল কারীরা পাকিস্তান যিন্দাবাদ, জ্বালাও পোড়াও বন্ধ কর, শান্তি প্রতিষ্ঠা কর ইত্যাদি বল্‌তে বল্‌তে পুরাতন ডাকঘরের কাছা কাছি এসে পড়লে এখানে সদ্য নিহত ডি,জে উচ্চ বিদ্যালয়ের নৈশ প্রহরী মোবারক আলী ও আবদুল গফুরকে রক্তে রঞ্জিত অবস্থায় পড়ে থাক্‌তে দেখে, মিছিল কারীরা হত চকিত হয়ে উঠে। ইত্যবসরে হানাদার সৈনিকরা, এদেক উত্তরদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং মৃত্যুর জন্য কাতার বন্দি হয়ে দাঁড়াতে নির্দ্দেশ দেয়। গুলির আঘাত অবধারিত ভেবে, সকলে কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে যায়। আচানক এ সময় তদানীন্তন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, মরহুম আবদুল মান্নান বিশ্বাস, ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি ভয়াবহতা লক্ষ্য করে, হানাদার কমান্ডের নিকট দ্রুত হাযির হয়ে, বিনীত আবেদন করেন। নিরীহ মিছিলকারীদের জীবন ভিক্ষে চেয়ে বসেন। কি যেন ভেবে হানাদার কমান্ড মরহুম বিশ্বাসের অনুরোধটা রক্ষা করে, আর সেই সুবাদে মরতে মরতে বেঁচে যায় প্রায় চারশ জন জিন্দাদিল মানুষ। অবশ্য এদের মধ্যকার একজন শহর বাসী, বাড়ী প্রত্যাবর্তন মাত্র ভয়াবহতার বিভীষিকায় আচ্ছন্ন হয়ে তৎক্ষণাৎ মারা যায়। উল্লেখ্য যে, বর্তমানের তুলনায় ১৯৭১ সালের শেরপুরের জন সংখ্যা অনেক কমছিল। শহরের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা আসন্ন ভয়াবহতার কথা অনুমান করে, শহর ত্যাগ করে মফঃস্বলের পথে সরে পড়েছিল। শহরের গণ্য মান্য পরিবারের লোকজন ও আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা পূর্বাহ্নেই শহর ত্যাগ করে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান গ্রহন করেন। এর ফলে সামরিক জান্তার আক্রমনে মফঃস্বল অপেক্ষা শহরের ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক ছিল। পাড়া গাঁয়ের লোকেরা সামরিক জান্তার আগমনে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লেও, প্রথম প্রথম একথা ধারনা করতে পারেনি যে, হানাদার বাহিনী কখনও মফঃস্বলেও প্রবেশ করতে পারে। বস্তুতঃ সংরক্ষিত শহরটা বিনা প্রতিরোধে সহজেই দখল করার পর, জল্লাদ বাহিনী দ্রুত পাড়া গাঁয়ের দিকে ধাবিত হয়, আর নির্বিচারে হত্যা যজ্ঞ চালাতে থাকে।

www.amarboi.org

শেরপুর শহর তো বটেই, চারদিক ও শহর সংলগ্ন মহা সড়ক লাগোয়া জনপদের সকল পরিবার ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে, ঘরবাড়ী ত্যাগ করে আশে পাশের গ্রামে আশ্রয় গ্রহন করে। সারাদিন যাযাবরের মত এদিকে ওদিকে অবস্থান করে, রাত্রি বেলায় বাড়ী-ঘরের খোঁজ খবর নেয়ার জন্য দু একজন করে ভয়ে ভয়ে প্রত্যাবর্তন করতো। এদিকে সংক্ষিপ্ত শহরটি ধ্বংস সাধন করে, নিষ্ঠুর মিলিশিয়ারা দল বেঁধে অত্র থানার বিভিন্ন গ্রামের দিকে ধাবিত্ত হতে থাকে। অবশ্য মিলিশিয়া বাহিনী রাতের বেলায় কোন অভিযান চালিয়েছে বলে জানা যায়নি। একই ভাবে অত্র থানার কোথাও নারী নির্যাতণ অথবা ধর্ষণের খবর পাওয়া যায়নি।

মিলিশিয়া বাহিনী শেরপুর থানা পরিষদ অঙ্গনে প্রায় একমাস কাল অবস্থান করে। এ সময়ে কোন লোকজন তাদের সংগে যোগাযোগ করতে সাহস করেনি। শেরপুর -বগুড়া যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণরূপে বন্ধ ছিল। বগুড়া পুলিশ লাইন সর্বাংশেই হানাদার বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। জুন মাসের শেষ নাগাদ অতীব সতর্কতার সহিত তীব্র প্রয়োজনে রিক্সা যোগে কেউ কেউ বগুড়া যাতায়াত করতো। শ্রমজীবি মানুষেরা এ সময় দারুন অভাব অনটনের সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ব্যবসায়-বানিজ্য একেবারে থমকে দাঁড়ায়। হাটে বাজারে- ক্রেতা বিক্রেতাদের উপস্থিতি একেবারে শূণ্যের কোঠায় এসে পড়ে। আমদানী -রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দুষপ্রাপ্য হয়ে পড়ে। শ্বাসরুদ্ধকর এ অবস্থায় লোকজন দারুণ হতাশা গ্রস্থ হয়ে ওঠে। আত্মীয় স্বজনের বাড়ী ও অন্যান্য স্থানে যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। সর্বত্র আহাজারি আর আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠে। প্রায় তিন সপ্তাহ কাল এভাবে অতিবাহিত হয়। এরপর জেলা প্রশাসনের দু'একজন কর্ম-কর্তা সেনাবাহিনীর ছত্র-ছায়ায় থানা সদরে পদার্পণ করেন। তেমন কোন নিশ্চয়তা না দিয়ে, তারা নাম মাত্র মৌখিক আশ্বাস প্রদান করে চলে যায়। এদিকে সামরিক অভিযান পূর্ববৎই চল্‌তেই থাকে। থানার গণ-মানুষের অবস্থা যখন অন্তিম দশায়, উপনীত, তখন বিভিন্ন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ও কতিপয় গণমাণ্য ব্যক্তিকে ডেকে, থানা পরিষদ মিলনায়তনে এক সমাবেশ করা হয়। শান্তি কমিটি নামে একটা প্রহসন মূলক কমিটিও গঠন করা হয়। এ যেন গরু মেরে জুতাদান। কমিটির সদস্যগণ শহরের পরিত্যক্ত ঘর-বাড়ী ও সহায় সম্পদ সংরক্ষণ সহ লুট-তরাজ বন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের পরামর্শ দেন, কিন্তু সামরিক কতৃপক্ষ বিষয়টির প্রতি ভ্রুক্ষেপ মাত্র করেননি। এর ফলে কমিটির সদস্যরা নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এদিকে গণহত্যার বিরুদ্ধে গনরোষ ধূমায়িত হতে থাকে। সম্ভবতঃ ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে হানাদার বাহিনী, রাজাকার দল গঠন করে গণ রোষকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চেষ্টা করে। অল্প কিছু দিনের মধ্যেই রাজাকাররা হোঁচট খেতে আরম্ভ করে। মুক্তি বাহিনীর সদস্যরা এদেক চোরা গোপ্তা হামলা করে কাবু করে ফেলে। তাছাঁড়া জনগণ ও এদের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। যতদূর মনে পড়ে নভেম্বর মাসের শেষের দিকে রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা দল ছুট হয়ে পলায়ণ করতে থাকে। অবশিষ্টরা অস্ত্রসর্ম্পণ করে অথবা মুক্তি যোদ্ধাদের হাতে বন্দি হয়ে যায়।

www.amarboi.org

৪৮-এর বগুড়া

১৯৪৮ সাল। শীতকাল। আমি তখন ৪র্থ শ্রেণীর একজন ঘরমুখো ছাত্র। ঘটনাক্রমে লালমনির হাট হতে ট্রেনে যাত্রা। এর আগে মাত্র একবার মায়ের আঁচল ধরে ট্রেনে চড়ার সুযোগ লাভ করেছিলাম। সংগী-সাথী ছাড়া একাকী বাড়ী হতে কোথাও বেরোনের মুরোদ ছিলনা আমার। ভাগ্যক্রমে শিক্ষা গুরু মাওলানা ইব্রাহীম হোসেন চন্দনী সাবের সহিত সংক্ষিপ্ত এক সফরে বের হয়েছিলাম। তিনি বগুড়া হতে চন্দনবাইশা যাবেন বলে জানালেন। গন্তব্য পথের সবটুকুই আমার অজানা ও অচেনা। হাবা পুচকে সফর সংগী হিসেবে নীরব ও নিঃশর্ত অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই করার ছিলনা আমার। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কয়েকবার স্বগোক্তি করে আপনা আপনি বলছিলেন যে বগুড়া পৌঁছে কোথা গিয়ে উঠবো?

পড়ন্ত প্রহরে ট্রেনটা বগুড়া ষ্টেশনে থেমে দাঁড়ালো। ছিটে ফোটা যাত্রীদের সহিত আমরা দুজন ও নেমে পড়লাম। ষ্টেশনের পূর্বপার্শ্বে ৪/৫ খানা রিক্সা দাঁড়ানো ছিল। ২/৩ খানা রিক্সা যাত্রী তুলে নিয়ে চলে গেল। বাকী ক'টা যাত্রী ছাড়াই শহরের দিকে ফিরে গেল। আমরা দু'জন পায়ে হেঁটেই সাতমাথা পর্যন্ত এসে পড়লাম। এ পর্যন্ত পথি পার্শ্বের কোথাও দোকান পাট নজরে পড়লোনা। লোকজনের চলাচল ও পরিলক্ষিত হলোনা। শ্রদ্ধেয় উস্তাদ কিব্‌লা একটানা হেঁটেই চললেন। উত্তরা সিনেমা হলের উত্তর পার্শ্বস্থ একটা পানের দোকানে এসে দাঁড়ালেন তিনি। দোকানীকে ছালাম দিয়ে ব্যক্তিগত কুশল বিনিময় করলেন। তাঁরা একান্তে কিছু কথা-বার্তা বল্‌লেন। জনাব চন্দনী সাবকে এবার আশ্বস্ত মনে হলো। ভাব্‌লাম,হয়তঃ তাঁর বন্ধুটির সৌজন্যে রাত্রি যাপনের একটা সুযোগ হয়ে গেছে কারণ, তিনি রাত্রি যাপনের সমস্যা নিয়ে বড্ড বেশী ভেবে উঠেছিলেন। আর ভেবে উঠাই স্বাভাবিক, কারণ তখনকার দিনে বহিরাগতদের জন্য ষ্টেশনের প্লাটফরম ছাড়া শহরের অন্য কোথাও মাথা গুঁজার ঠাঁই ছিলনা। তখন পর্যন্ত বগুড়া শহরে কোন আবাসিক হোটেল গড়ে উঠেনি। কোন কোন খাবারের হোটেলে, মশা মাছি ও ছাড় পোকার উৎপাত উপেক্ষা করে অগত্যা কেউ কেউ রাত্রি যাপন করতো।

www.amarboi.org

যা হোক। চন্দনী সাব, তাঁর দোকানী বন্ধুর সহিত আলাপরত ছিলেন। ইত্যবসররে বেলা ডুবে গেল। মাগরিব আদায় করা হোল, কিন্তু শহরের কোথাও আজানের ধ্বনী কর্ণ গোচর হলোনা। নামাজ অন্তে উস্তাদ কিবলার অনুসরণ করে আবারও একবার সাত মাথার দিকে এগে গেলাম। এ সময় কছু সিনেমা দর্শক হলের আশে পাশে ঘোরা ফেরা করছিলো। আরও একটু অগ্রসর হয়ে দেখলাম যে অধুনা ট্রাফিক পোষ্টের স্থলে একটা চৌ কোনা লণ্ঠনের মধ্যে একটা বাতি মিট মিট করে জ্বল্‌ছে। চারদিকে ভুতুড়ে অন্ধকার। দক্ষিণ পার্শ্বের এক স্থান হতে ভ্রাম্যমাণ শিয়ালেরা হুককা হুয়া শব্দে ডেকে উঠ্‌লো। কি যেন ভেবে উস্তাদ কিবলা আর অগ্রসর হলেননা।

যা হোক। আমাদের প্রিয় জেলা শহর ১৮২১ খৃষ্টাব্দে অস্তিত্ব লাভের পর হতে ক্রমান্বয়ে রূপ বদলাচ্ছে। ১৯৪৮ হতে আজ অবধি বগুড়ায় আকাশ ছোঁয়া কোন পরিবর্তন না হলেও একেবারে কম হয়নি। যে সাত মাথায় এক সময় সকাল হতে সন্ধ্যা পর্যন্ত একশ লোকের সমাগমও পরিলক্ষিত হতোনা। এখন সেখানে প্রতি মুহূর্তে হাজার হাজার লোকের ভীড় জমে থাকে। সাত মাথা সংলগ্ন প্রাচীণ বাংলা স্কুলের স্থলে এখন সপ্তপদী মার্কেটটি সাত রংগা দীপ্তি ছড়াচ্ছে সকাল সন্ধ্যায়। ষ্টেশন পর্যন্ত সড়কের উভয় পার্শ্বে অগণিত, ও বিচিত্র দোকান-পাট। হাকার্স মার্কেট আর বাস টার্মিন্যাল, যেন শহরটাকে বগল দাবা করে ফেলেছে।

তদানীন্তন বগুড়া শহরের একমাত্র আকর্ষণ থানার রোডের দুটি অস্থায়ী ষ্টলের কথা মনে পড়ে কি? সন্ধ্যালগ্নে হ্যাচাগের আলোয় ঝলমলিয়ে উঠতো তখন ষ্টল দুটি। সৌখীন ক্রেতারা কিছু কেনা কাটা অথবা অন্যরা ষ্টল দুটির সৌন্দর্য চাক্ষুস করার জন্য এখানে ভীড় জমাতো। বগুড়ার শহরের প্রাচীণ রাজা বাজার, কিন্তু তখন রাজার হালে চলতোনা। ফতেহ আলী বাজারের সেই অবিন্যস্ত জীর্ণ অবস্থা আজ ও কি ভোলা যায়? কালিতলা হাট, সে তো এক হাট ব্যতীত আর কিছুই ছিলোনা।

১৯৪৮ এর সম্মানীয় বগুড়া শহর বাসী ভাই ও বোনেরা! উল্লেখিত বক্তব্যের সহিত আপনারা পূর্ণ একমত হতে না পারলেও, কমপক্ষে দ্বিমত পোষণ করতে পারবেন না নিশ্চয়।

www.amarboi.org

চল্লিশের আগের শেরপুর

শেরপুরের অবস্থানগত গুরত্ব এবং ঐতিহ্যগত প্রাধাণ্যের তুলনায় এর ভৌত সমৃদ্ধি নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। স্থানটির অবস্থানগত গুরুত্বের কল্যাণে প্রাচীন কালে এখানে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছিল বটে কিন্তু অজ্ঞাত নানা কারণে সেই সমৃদ্ধি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। বৌদ্ধ আমলে আমাদের এই উপমহাদেশের বাইরেও শেরপুরের উল্লেখযোগ্য পরিচিতি ছিল। তখন এর বিস্তৃতি ছিল বৃহৎ এলাকা জুড়ে। প্রাচীনকালে এখানকার মহা নদী বন্দরে ভিড়তো জাপান, ইন্দোনেশিয়া, প্রভৃতি দেশের বাণিজ্যতরী। দীর্ঘ দিন পর নদী বন্দরটির ব্যবহার যোগ্যতা হ্রাস পেতে পেতে অবশেষে তা চিরতরে রহিত হয়ে যায়। বৌদ্ধ আমলের পর, পাল বংশ শেরপুরের শ্রী বৃদ্ধি কল্পে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। মুসলিম আমলের পূর্বে এখানে সেন রাজা দ্বিতীয় বল্লাল সেন, কিছুদিন ক্ষমতাসীন ছিলেন। তিনি শেরপুরের পরিবর্তে এখান হতে প্রায় ৪ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রাজবাড়ী মুকুদ নামক স্থানে কর্মস্থল প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর মুস্‌লীম আমলে শেরপুর আবারও সাবেক মর্যাদা ফিরে পায়। সুলতানী আমলে সমগ্র উত্তর বঙ্গের অবস্থা ছিল সন্তোষজনক। মুঘল ও পাঠান আমলে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। ইংরেজ আমলে শেরপুরের অবস্থা সবচেয়ে শোচনীয় হয়ে উঠে। দেওয়ানী ক্ষমতা লাভের পর বেনিয়া গোষ্ঠী রাজস্ব আদায়ের নামে প্রজা পীড়ন শুরু করে দেয়। ইংরেজ আমলের পূর্বে শেরপুরে দু দুবার প্রচন্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এর ফলে তখন এখানকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। ইংরেজদের ক্ষমতা লাভের পর এখানে কয়েক বছরের ব্যবধানে পর পর মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় এবং এতে হাযার হাযার মানুষ অনাহারে প্রাণ হারায়। পরিশেষে এখানে জমিদারী প্রথা শুরু হয়। জমিদারগণ নিজেদেক নিয়েই অধিক ব্যস্ত থাকতেন হেতু, শেরপুরের উন্নয়ন কর্মকান্ডে তারা তেমন উল্লেখ যোগ্য অবদান রাখতে পারেননি। মূলতঃ সরকারী উদ্যোগের অভাবেই এখানকার উন্নয়ন কার্য মারাত্মক ভাবে ব্যাহৃত হয়। অবশ্য জমিদারগণ শহরায়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছিলেন। কারণ, তাঁদের আবাসিক ঘর দোরও রাজস্ব আদায়কল্পে নির্মিত পাকা কাছারী বাড়ী, শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে সহায়ক হয়েছিল। সে কালে ইমারত ও পাকা ঘর বাড়ী নির্মাণ ছিল এক সাধ্যাতীত ব্যাপার। জমিদার ছাড়া

www.amarboi.org

তখন শেরপুর শহরে আর কেউ পাকা বাড়ী নির্মাণ করেছিল বলে প্রমাণ নেই। শেরপুরকে প্রাচীন কালে উত্তর বঙ্গের প্রবেশ দ্বার বলে আখ্যায়িত করা হতো। তখনকার দিনে রাজশাহীর বোয়ালিয়া এবং শেরপুর হতে ঘোড়াঘাট হয়ে কুচবিহারের সীমান্ত পর্যন্ত যাতায়াতের একমাত্র পথ ব্যতীত আর কোন বিকল্প ছিল না। এক সময় মীর জুমলা এবং পরবর্তী কালে মানসিংহ শেরপুরের পথ ধরেই সীমান্ত অতিক্রম করে কুচবিহারে প্রবেশ করেছিলেন। বগুড়া জেলার সহিত সংযুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত, শেরপুর ও নন্দিগ্রাম ছিল রাজশাহী জেলার অবিচ্ছেদ্য অংশ ও অন্যতম থানা। তখন শেরপুর হতে ভবানীপুর কালিবাড়ী হয়ে প্রখ্যাত রানীর জাংগাল ধরে নাটোর পর্যন্ত যাতায়াতের একটা ব্যবস্থা ছিল। প্রশাসনিক সুবিধা ও সমন্বয় সাধন কল্পে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা শেরপুর ও নন্দিগ্রাম থানাদ্বয়কে নবগঠিত বগুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। আজ হতে চল্লিশ বছর পূর্বে, নদী পথ ব্যতীত শেরপুর হতে সিরাজগঞ্জ অথবা উল্লাপাড়া যাতায়াতের অন্য কোন উপায় ছিল না। শেরপুরকে এক সময় বাঘের শহর বলা হতো,কারণ এখানকার বন জংগলে তখন অসংখ্য বাঘ অবস্থান করতো। তাছাড়া বাঘ ডাশা-শালনা, সজারু বন্য দাঁতাল প্রভৃতি হিংস্র জীব জানোয়ার এখানকার জংগলে স্থায়ীভাবে বাস করতো। ভাবানীপুর হতে শেরপুর পর্যন্ত তখন সমগ্র স্থানই ছিল জংগলাকীর্ন। তখন প্রায়শ্চয়ই এখানে বাঘ শিকার করা হতো। মাঝে-মধ্যে বাঘের কবলে পড়ে লোকজন আহত ও নিহত হতো। শেরপুর -ঢাকা-মহাসড়কের অধুনা মাজার গেটের সংলগ্ন স্থানটি, তখন বাঘ শিকারের একটি উল্লেখযোগ্য আস্তানা ছিল। উৎসাহী ব্যাঘ্র শিকারীরা এখানে গাছের উচ্চ ডালে মাচা নির্মান করে দিবা ভাগেই বাঘ শিকার করতেন। সেকালের বন জংগলের বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ গাছড়ার মধ্যে বেতের গাছ ছিল অন্যতম। বন জংগলে গাছ গাছড়ার এত প্রাচুর্য ছিল যে ষাট দশকের পূর্ব পর্যন্ত শেরপুরের অধিবাসীরা জ্বালানী কাঠের কোনই অভাব বোধ করত না। এখানকার খাল বিল ও বন জংগলে বিভিন্ন প্রজাতির পাখ পাখালী পাওয়া যেতো। এখানকার প্রসিদ্ধ ভন্তার বিলে প্রচুর মাছ থাকতো। তখনকার দিনে বগুড়া সদর থানার গন্ডগ্রাম, মাঝিড়া ও আড়িয়ার বৃহত্তর অংশ ঘনবনভূমি ও জংগলাকীর্ণ ছিল। অধুনা সেনা নিবাসের বিরুকটি,তখন বাঘের-আখড়া নামে পরিচিত ছিল। এখানে প্রত্যেক বছর খাঁচার ফাঁদে একাধিক বৃহদাকার বাঘ আটক করা হতো।

www.amarboi.org

আজ হতে চল্লিশ বছর পূর্বে-বগুড়া-শেরপুরের যাতায়াত ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। নাম মাত্র জেলা বোর্ডের যে রাস্তাটি শেরপুর পর্যন্ত তৈরী করা হয়েছিল তাতে যানবাহন তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটে চলাচল করাই ছিল দুষ্কর। মান্ধাতা আমলে ইট বিছানো স্বল্প পরিরের এই রাস্তাটি এমন খাদ বহুল হয়ে উঠেছিল, যা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।

খাদ বহুল ও ক্ষত বিক্ষত এই রাস্তাটি অবশেষে এক আধটু মেরামত করা হয়। পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে,এই রাস্তায় কয়েকটি সেকালে জির জিরে বাস চলাচল শুরু করে। পাশাপাশি দু চারটা টম টম গাড়ীও চলাচল করতো। এসব যানবাহনে প্রতি ২৪ ঘন্টায় গড়ে ৬০/৬৫ জনের অধিক যাত্রী যাতায়াত করতোনা। মাঝে মধ্যেই রাস্তায় যানবাহন উল্টে গিয়ে যাত্রীরা মারাত্মক আহত হতো। বর্ষাকালে শেরপুর বারদুয়ারী ঘাট হতে গয়নার নৌকা বগুড়া পর্যন্ত চলাচল করতো। যাত্রীরা এখান হতে সূর্যাস্তের পর নৌকায় আরোহন করলে পরের দিন ভোর বেলা বগুড়ার উপনীত হতে পারতো। ষাটের দশকে কোন একদিন জনৈক ব্যক্তি বগুড়া শহর হতে রিকশা চালিয়ে শেরপুরে পৌছলে অসংখ্য মানুষ সেই রিকশাটা দেখার জন্য ভীড় জমায়। কারণ, তখনকার দিনে রিক্শা চলাচল বগুড়া শহরেই সীমাবদ্ধ ছিল। শেরপুরের প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে এমনও অনেক ব্যক্তি ছিলেন, যারা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একবারও বগুড়া শহর দেখেননি।

শেরপুরের কেল্লাপুরী মেলা আর বারদুয়ারী হাটের ঐতিহ্য অতীব প্রাচীন। অনুরূপভাবে এখানকার সকাল ও বিকেল বাজারের স্থায়িত্বও দীর্ঘ দিনের। তখনকার দিনে বারদুয়ারী হাটে অপরাপর সামগ্রী সহ কাছিম-কচ্ছপও বেচা কেনা হতো। পূর্ব আমলে এখানে গরু জবাই সম্পূর্ণ নিষিদ্ধছিল। সেকাল হতেই এখানে ছোট বড় অনেক গুলি মন্দির ছিল। সংস্কার অভাবে একমাত্র হরগৌরী মন্দির ছাড়া অপরাপর মন্দির গুলো আজ ও অটুট রয়েছে। পূর্বকালে শেরপুর শহরে উলিপুর ও বারদুয়ারী ছাড়া আর কোন মসজিদ ছিল না। এক্ষনে ছোট বড় ২১টি জামে মসজিদ বিদ্যমান। শেরপুরের দই আর ক্ষীরসার ঐতিহ্য অনেক পুরাতন। প্রাচীন কাল হতেই এখানে দেশী মদ ও তাড়ির প্রাচুর্য চলে আসছে। মুলতঃ উপজাতীয় সাঁওতালদের মধ্যেই এক সময় ইহার প্রচলন সীমিত ছিল। কিন্তু পরবর্তী সময় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাড়ি সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। বর্তমানে নেশা খোরদের সংখ্যা বহু গুণে বেড়ে গেছে।

www.amarboi.org

শেরপুরকে এক সময় অর্থ লগ্নির শহর নামে আখ্যায়িত করা হতো। তখন মহাজনেরা.দরিদ্রদের মধ্যে কড়া কুসিৎ ভিত্তিক ঋণ দিয়ে, পরে তা কড়ায় গন্ডায় আদায় করে নিতো। এমনকি ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে অনেক অনেক দরিদ্র মানুষ ভিটে মাটি বিক্রি করে ফতুর হয়ে যেতো। প্রাচীন সেই লগ্নি প্রথা আজও পুরোদমেই চলছে। ১৯৫৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত এখানে খাবারের কোন হোটেল ছিল না। তখন স্থায়ী দোকান পাটের সংখ্যা ছিল খুবই নগন্য। সাবেকী আমলের শেরপুরের হিন্দু সম্প্রদায়ের পূজা পার্বণের জাঁক জমক ছিল অনন্য ও অপূর্ব। এখানকার মৃৎশিল্পের সুনাম ছিল সমগ্র জেলা জুড়ে। একাধিক যুক্তি সংগত কারণেই শেরপুরের অতীত প্রেক্ষাপট বিশেষভাবে বিশ্লেষণ ও গবেষণা যোগ্য বটে। এটা কোন চারটি খানিক কথা নয় এ যে, যেকালে অনেক জেলা শহরই পৌর মর্যাদা লাভ করতে সক্ষম হয়নি,সেখানে শেরপুরের মত একটা থানা শহর কি রূপে পৌরসভায় উন্নীত হয়েছিল।?মূলত প্রাচীন এই শহরটির অবস্থানগত গুরুত্বই একে বগুড়া শহরের সংগে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে একই দিনে পৌরি সভায় উন্নীত করতে সহায়ক হয়েছিল।

পৌরসভা দুইটির (শেরপুর ও বগুড়া) কল্যাণে উভয় স্থানের অধিবাসীরা অবশ্যই নানা ভাবে উপকৃত হয়েছিল এবং সেই সংগে তাদের বিড়ম্বনাও বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণে। কারণ, বর্দ্ধিত পৌরকর, শহরায়ণ, পয় প্রাণালী ও রাস্তা ঘাটের অব্যবস্থা ও অপ্রতুলতা ইত্যাদি কারণে, পৌর বাসীকে অকথ্য ভোগান্তি পোহাতে হতো। তাছাড়া শহর সংলগ্ন স্থানে মলভাগাড় গড়ে তোলার ফলে দীর্ঘ কয়েক যুগ পর্যন্ত উভয় পৌরবাসীদেক স্বাস্থ্যও পরিবেশগত দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে। সর্বোপরি আলোচ্য পৌরসভা দুটির প্রশাসনিক ত্রুটি বিচ্যুতি ও নানাবিধ অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও উহাদের অবদান কিন্তু মোটেই কম নয়।

www.amarboi.org

শহরায়ণ

সংগত কারণেই বগুড়া জেলার শেরপুর থানায় একটি ছোট্ট শহর গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন বাংলাদেশে, সেকালে যে সকল স্থানে শহর বন্দর গড়ে উঠেছিল, তার অধিকাংশই পরবর্তী কালে নানা কারণে অচল ও বিলুপ্ত হয়ে যায়। শেরপুর শহরটিও কয়েকবার বিলুপ্তি দশার মুখোমুখী হয়ে শেষপর্যন্ত কোন প্রকারে রক্ষা পেয়ে যায়। অবস্থানগত ও প্রাকৃতিক ও ভৌত সুবিধাদি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকায়, এখানে একটি শহর গড়ে উঠাই স্বাভাবিক ছিল। এ কারণেই যখন বাংলাদেশে অনেক জেলা শহরই পৌরসভার আওতা ভুক্তির বাইরে ছিল তখন ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশের একাদশতম পৌর সভাটি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঠিক কোন সময় এখানে শহরটির গোড়া পত্তন হয়েছিল তা ইতিহাসের নিরিখে নির্ণয় করা কঠিন। তবে অনুমিত হয়ে যে, সে কালে প্রসিদ্ধ করতোয়া নদীর শেরপুর অংশে আন্তজার্তিক নদী বন্দরটি গড়ে উঠেছিল, তখন হতেই শহরটি অস্তিত্ব লাভ করে। এখানে শহর গড়ে উঠার পেছনে বাণিজ্যিক সুবিধাই ছিল অন্যতম। বরেন্দ্রাঞ্চলীয় এই স্থানটি এক সময় উত্তর বঙ্গও আসাম মুল্লুকে যাতায়াতের প্রবেশ দ্বার হিসেবে একক গুরুত্ব লাভ করে। এই গুরুত্বের কারণেই দক্ষিনাঞ্চল হতে তিলি সম্প্রদায়ের কিছু সংখ্যক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এখানে এসে আস্তানা গড়ে তোলে। তিলি ও বসাক গণ শহরায়ণের আদি বাসিন্দা হলেও তাদের অবস্থান ছিল খুবই সীমিত। এরা শহরায়নের অগ্রগতি সাধন অপেক্ষা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা নিয়েই অধিক তৎপর ছিল। ঘটনাক্রমে পরবর্তী সময় এখানে হিন্দু জমিদার গণ বসবাস শুরু করলে, শহরটির আকর্ষণ বৃদ্ধি হতে থাকে। তবে দুঃখজনক যে, চারি পার্শ্বের মুসলীম সংখ্যা গরিষ্ঠতা থাকা সত্বেও শহরায়ণের তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত মুসলমানগণের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিলনা বল্‌লেই চলে। শহরায়ণের তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত মুসলমানদের অনুপস্থিতির একাধিক কারণ হতে পারে। প্রথমতঃ মূল শহরের $\frac{২}{৩}$ অংশ স্থান ছিল হিন্দু জমিদার ও বিত্তশালীদের করতলগত। কাজেই মুসলমানদের জন্য এখানে স্থান সংকুলান হয়ে উঠেনি। দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ মুসলমানই ছিল কৃষিজীবি দারিদ্র ক্লীষ্ট ও ব্যবসায়ে অদক্ষ ও অনিচ্ছুক। তৃতীয়তঃ প্রভাবশালী জমিদার ও বিত্তশালীদের এড়িয়ে চলার মনোভাবের কারণে মুসলমানগণ নিরাপদ দূরত্বে

www.amarboi.org

অবস্থান করে। শহরায়ণের তৃতীয় পর্যায় প্রায় ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। এরপর ক্রমান্বয়ে শেরপুর শহরের উন্নয়ন ও শ্রীবৃদ্ধি করণের কাজে মুসলমানগণ অংশ গ্রহন করতে থাকে। মূলতঃ যে কোন স্থানের শহরায়ণের প্রাণ শক্তি হলো ব্যবসায় বাণিজ্য কল কারখানা ইত্যাদি। তৃতীয় পর্যায় পর্যন্ত যে কয়েকটি সীমিত ব্যবসায় বানিজ্য এখানে প্রচলিত ছিল তার সব কয়েকটিই হিন্দু সম্প্রদায়ের করায়াত্ত ছিল। স্বর্ণকার, কুম্ভকার, দই মিষ্টি ও মুদির দোকানীরাই তখনকার দিনে প্রথম শ্রেণীর ব্যবসায়ী ছিলেন। এছাড়া বৈদ্য, কবিরাজ, রাজ মিস্ত্রী ও বাদ্য যন্ত্রের প্রস্তুত কারক ও হিন্দুরাই ছিল। তখনকার দিনে শহরায়ণের ঘর বাড়ী দোকান-পাট ইত্যাদি বিন্যাসের জন্য কোঠা বাড়ীই ছিল সর্বোচ্চ মর্যাদার গৃহায়ন। ঘটনা ক্রমে জমিদারগণ কোঠা বাড়ীতে অবস্থান করতেন হেতু শহরায়ণের একটা দিক উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠে। এছাড়া হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা অনেকগুলি পাকা দেবালয় ও মন্দির নির্মাণ করায় গৃহায়ণের আরও একটি সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়। কিন্তু এ সব সত্বেও শেরপুর শহরের তখনকার চিত্র ছিল অনুজজ্বল ও অকিঞ্চিৎকর-কারণ, শহরের $\frac{২}{৩}$ অংশ ছাড়া অবশিষ্ট সবটুকুই ছিল জংগলাকীর্ণ ও বন-বনানী পরিবৃত্ত। থানার পল্লী এলাকার ন্যায় শহরেও বাঘ-নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি হিংস্র জীব জন্তু বাস করতো। বলতে গেলে শহরের মূল চেহারা তখন, বন-বনানী ও বাগ-বাগিচার আড়ালে ঢাকা গড়ে থাক্‌তো। পাড়া-গাঁ আর মফঃস্বল তো বটেই, খোদ শেরপুর শহরেও তখন বিশুদ্ধ পানীয় জলের তীব্র সংকট ছিল। পাত-কূয়া, নদী ও ডোবার পানি তখন পানীয় জলরূপে ব্যবহার করা হতো। অবশ্য জমিদারগণ তখন শেরপুর শহরের কয়েকটি স্থানে ইন্দারা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। তখনকার শেরপুর শহরের একমাত্র রাস্তাটি ছিল গোঁসাই কাছারি হতে সেরুয়া পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিনে প্রলম্বিত। এই রাস্তাটির উভয় পার্শ্বদিয়ে পরবর্তী সময় জনবসতি ও গৃহায়ন শুরু হয়। সমগ্র শেরপুর থানা তথা সিরাজগঞ্জ পর্যন্ত তখন বার দুয়ারী হাট ও মির্জাপুর বাজারই ছিল উল্লেখযোগ্য স্থান। একটি দিয়াশলাই, কিংবা এক গজ কাপড় অথবা সূচের মত তুচ্ছ জিনিষটি কিনতে হলেও তখন পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী ক্রেতাদেক শেরপুরে উপস্থিত না হয়ে উপায় ছিলনা। তখনকার দিনে শেরপুর শহরের দত্ত পাড়াই ছিল একক এক বানিজ্যিক এলাকা। সেকাল হতেই শেরপুর ছিল স্বর্ণ ব্যবসায়ের এক

www.amarboi.org

রমরমা স্থান। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে অতীতে শেরপুর শহর কয়েকবার অচলাবস্থার মুখোমুখী হয়ে শেষ পর্যন্ত রক্ষা পেয়ে থেকে-গেছে। কারণ, কয়েকটি প্রয়োজনে শহরটির অস্তিত্ব ছিল অপরিহার্য। উৎকৃষ্টমাণের স্বর্ণালংকার উন্নত মানের মিষ্টি মন্ডা, দৈ, চিড়া ও বাদ্য যন্ত্র সরবরাহ ক্ষেত্রে শহরটি ছিল একক বৈশিষ্টের অধিকারী। এখানকার কপুদ্দল নামীয় মশারীর কাপড় ছিল অতুলনীয়। জংগলাকীর্ণ হলেও কষ্টে সৃষ্টে শেরপুর শহরে সকল ঋতুতেই কোন প্রকারে যাতায়াত করা যেতো। বগুড়া শহরের সহিত একমাত্র শেরপুরই ছিল যাতায়াত সাধ্য। রাজমিস্ত্রী ও অন্যান্য কারিগর পেতে হলে শেরপুর ছাড়া বিকল্প ছিলনা। জমিদারদের প্রধান কর্মস্থল হওয়ার কারণে খাজনা-খেরাজ পরিশোধ করার জন্য সকল অঞ্চলের লোকজনকে এখানে বাধ্য হয়েই আসতে হতো। তখন করতোয়া নদীর নাব্যতা থাকার কারনে জলপথে বানিজ্যিক লেনদেনের জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বনিকগণ এখানে আসতে বাধ্য হতো। বারদুয়ারীর মত প্রসিদ্ধ বানিজ্যিক হাটের গুরুত্ব উপেক্ষা করার উপায় ছিলনা। তাছাড়া প্রসিদ্ধ কেল্লা-পোষীর মেলার গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। পূর্ব হতেই শেরপুর ছিল খাদ্য সম্ভারের এক উদ্বৃত্ত অঞ্চল। এখানকার ভস্তাবিলের মাছ বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী করা হতো। উল্লেখিত স্থায়ী বৈশিষ্টগুলির কারণে শহরটির উন্নয়ন ও অগ্রগতি একাধিকবার বাঁধাগ্রস্ত হওয়ার পরও ইহার অস্তিত্ব একেবারে বিপন্ন হয় নাই।

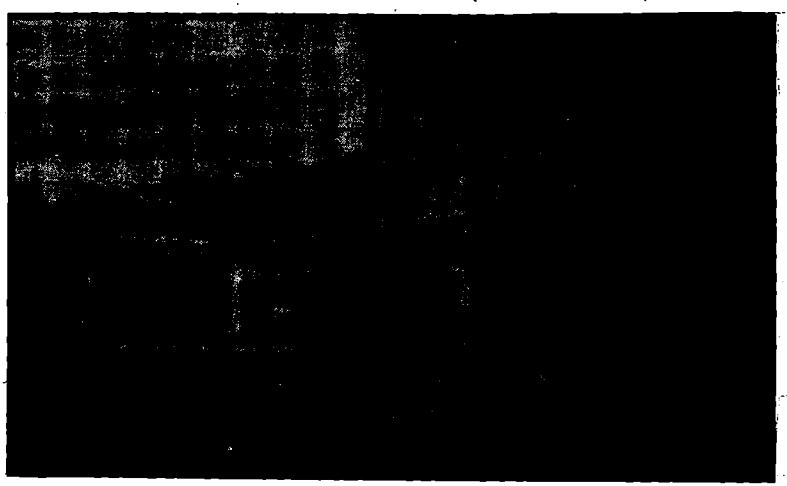

শেরপুরের আধুনিকায়ন ও উন্নয়নের স্বাক্ষর শেরশাহ নিউ মার্কেট

শহরটি ছিল এক স্থবির জনপদ। চতুর্থ পর্যায়ের পূর্ব পর্যন্ত এখানে শহরায়নের তেমন কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ও পরিবর্দ্ধন দেখা যায়নি। বস্তুতঃ চতুর্থ পর্যায়ের পর হতে ক্রমান্বয়ে এক-আধ টু লক্ষ্যনীয় উন্নয়ন সূচীত হতে থাকে।

www.amarboi.org

১৯৪৭ সালের পর এখানকার কয়েকটি বিত্তশালী পরিবার ইচ্ছাকৃত ভাবে শহর ত্যাগ করে ভারতে চলে যাওয়ায়, পরিবর্তে বিনিময় সূত্রে আগত মুসলমানগন শহরায়নের একটা ধারা শুরু করে। এভাবে হিন্দুদের পরিত্যক্ত স্থানে অন্যরা স্বত্তাধিকার লাভ করে, কিছুটা নতূনত্ব সূচনা করে। এর ফলে উত্তরোত্তর শহরটির শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। ১৯৫০ সালে ভারতের আসাম ও বিহার হতে বিতাড়িত অসংখ্য মুসলীম পরিবার বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিতাড়িতদের মধ্য হতে অত্র থানায় বিভিন্ন গ্রামে ৩৬০টি পরিবারের মধ্যে ৮০টি কে শেরপুর শহরে পুনর্বাসিত করা হয়- যা টাউন কলোনী নামে পরিচিত। ১৯৫২ সালে টাউন কলোনীতে পুনর্বাসিত ঐ আশিটি পরিবার শহরায়নে আর একটি মাত্রা যোগ করে। অন্য কথায় একটি জংগলাকীর্ণ বিশাল বাগান বাড়ী উল্লেখযোগ্য একটি নতুন মহল্লায় রূপান্তরিত হয়। মহল্লাটি এখন শহরায়নের আকর্ষনীয় অংশ বটে। সু প্রাচীন এই শহরটির রাস্তা পথের কোন নাম করণ ছিলনা। চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে কতিপয় নতূন প্রতিষ্ঠান ও অফিসাদি নির্মিত হওয়ায় স্বাভাবিক ও স্বরংক্রিয় ভাবেই ঐ সব প্রতিষ্ঠান অভিমুখী সড়ক ও রাস্তা গুলি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নামে প্রাধান্য লাভ করে। উদাহরনতঃ ইন্দারাপাড় রোডটি এক্ষনে কলেজ রোড নামে খ্যাত। একইভাবে অন্য বেনামি রাস্তাটি এখন থানা পরিষদ রোড নামে প্রচলিত। হাল নাগাদ ব্যক্তিগত অনেক আকর্ষনীয় দালান কোঠা নির্মিত হওয়ায় শহরটি আধুনিক চেহারা ধারন করেছে। থানা পরিষদের অফিস গৃহাদি, কর্মচারীদের আবাসিক গৃহ, থানা পুলিশের আকর্ষনীয় অফিস অঙ্গন, ডাকঘর, সাব রেজিষ্টারের মর্যাদাশীল অফিস গৃহ, পৌর সভার উন্নত মানের কার্যালয়, থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সুরম্য গৃহ, ট্রাক টার্মিনাল, যাত্রী ছাউনী, পাবলিক টয়লেট, তুলা শোধন অফিস, আদালত গৃহ (আপাততঃ পরিত্যক্ত) ইত্যাদি সরকারী প্রতিষ্ঠান গুলো শহরায়ণে উল্লেখযোগী স্বাক্ষর রেখেছে। শহরায়তনে বগুড়া-ঢাকা মহাসড়কটির অবদানও কম নহে। মহাসড়কটি শহরায়নে বর্দ্ধিত সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। শহর অংশের মহাসড়কের উভয় পার্শ্বে গড়ে উঠেছে আবাসিক গৃহাদি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মালা। শহরের চৌমাথাকে কেন্দ্রকে মহাসড়রে দুই পার্শ্বে গড়ে উঠেছে প্রখ্যাত শেরশাহ নিউমার্কেট, উত্তরা প্লাজা, মোহনা শপিং সেন্টার, ইসলামী ব্যাংক, বৈকালী হোটেল, রঙ্গিলা সিনেমা হল, জনতা ব্যাংক, প্রসিদ্ধ হোটেল সুপার সাউদিয়া, কতরতোয়া সুপার মার্কেট, সোনালী ব্যাংক, আমিন জিয়া আবাসিক হোটেল, অগ্রনী ব্যাংক, রূপালী ব্যাংক, বাস শ্রমিকদের অফিস গৃহ, বেকারী, বিভিন্ন দোকান পাট ও শাহী জামে মসজিদ। একই ভাবে ধনুট রোড মোড়ের চার মাথার পার্শ্বে শহরায়নের আর একটি মনোরম দৃশ্য সৃষ্টি হয়েছে। শহরায়নে মসজিদ মন্দিরের ভূমিকাও উল্লেখ করার মত। শহরায়নের আদিকালে সমগ্র শহর ব্যাপী উত্তর প্রান্তে উলিপুর জামে মসজিদ ও দক্ষিন প্রান্তে বার দূয়ারী জামে মসজিদ নামে মাত্র দুটি জীর্ণ শীর্ণ

www.amarboi.org

মসজিদ ছিল। আর এক্ষনে শহর বেষ্টনীর মধ্যে ২০ (কুড়ি) টি প্রথম শ্রেনীর পাকা জামে মসজিদ নির্মিত হওয়ায়, শহরের শোভা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই ভাবে শহরের হিন্দু মহল্লা গুলোতে বহু সংখ্যক উচ্চ মানের দেবালয় ও মন্দিরের অবস্থান, শহরায়নে সহায়ক হয়েছে। শহর অভ্যন্তরে কতিপয় মুসলীম আউলীয়ার প্রচীন সমাধি ছাড়াও উত্তর প্রান্তে প্রায় পাঁচশ বছরের পূর্ব নির্মিত এবং বর্তমানে ধ্বংস প্রাপ্ত কাদিম মসজিদটি দূর অতীতের সাক্ষ্য বছন করছে। দুঃখের বিষয় যে করতোয়া নদীর পশ্চিম তীরে প্রাচীন কালের মহানদী বন্দরের স্থানটি অরক্ষিত থাকায় শহরের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে।

শহরায়নের আর একটি পার্শ্ব চিত্র তুলেধরা প্রয়োজন। শেরপুর সংলগ্ন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান, যথা, সেরুয়া বটতলা, সাধুবাড়ী ফাসিতলা, দুবলাগাড়ি বটতলা, গোঁসাইবাড়ী বটতলা, রনবীরবালা বটতলা ও খন্দকার টোলার কথা উল্লেখ না করলে শেরপুর শহরের মর্যাদা খানিকটা খাটো করা হবে। মূলতঃ শেরপুর শহরকে কেন্দ্র করেই পার্শ্ববর্তী ঐসব স্থানে আকর্ষণীয় বাণিজ্যিক মহাল গড়ে উঠেছে। আলোচ্য মহাল গুলির মধ্যে সেরুয়া বটতলাও খন্দকার টোলা যেন আর এক শেরপুরের রূপধারন করেছে। পাশাপাশি করতোয়ার পূর্ব তীরের ফুলবাড়ি পয়েন্ট ও রণবীরবালা স্থানকে শেরপুরের চেলোপাড়া নামে আখ্যায়িত করা উচিত। বস্তুতঃ উক্ত দু স্থানের বেইলী ব্রীজ দুটি উভয় মহালকে শহরের বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছে। আলোচ্য বানিজ্যিক মহালগুলো শেরপুরের শহরায়নকে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ভাবে উৎসাহিত ও ত্বরান্বিত করছে। অদূর ভবিষ্যতে উল্লেখিত মহলগুলোর কয়েকটি শহরের অংশ বিশেষকে টেককা দিয়ে শহরতলীতে রূপান্তরিত হতে পারে। শহরায়ন ক্ষেত্রে প্রধানতঃ জমিদার ভৌমিক, ধনিক ও বনিকদের অবদান সর্বাধিক হলেও সাকুল্য নহে। বরং মজুর মুটে,কামার, কুমার মায় সকল শ্রেণীর মানুষের কিছু না কিছু অবদান রয়েছে। এছাড়া অবদান রয়েছে সমাজ কর্মী, রাজনৈতিক নেতৃত্বের ও গুনী জ্ঞানী ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের

যা হোক। শেরপুরের শাহরায়নের পঞ্চম পর্যায়ের পরি সমাপ্তি যদি অত্র পৌরসভার দ্বিতীয় শ্রেনীতে উন্নীত হওয়া তক সীমিত করা হয়, তাহলে এখন চলছে ষষ্ঠ পর্যায়ের পালা শুধু। দালান কোঠা আর আকর্ষণীয় ইমারত দ্বারা কোন স্থানকে বিন্যস্ত করলেই শহরায়নের কাজ শেষ হয়না। এই বিন্যাসের পাশা পাশি চাই, নাগরিক সুখ সুবিধার প্রয়োজনীয় বিধান করা। এক সময় বগুড়াও শেরপুর ছিল শহরতলী বাসীদের জন্য অভিশাপতুল্য। কারণ, তখন উভয় শহরের তামাম বর্জ্য ও মল ছড়িয়ে, ছিটিয়ে রাখা হতো শহর তলীর ঘন জন বসতির গুলোর আশে পাশে। এর ফলে মলের দুর্গন্ধ কয়েক মাইল ব্যাপী বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়তো। এই দুর্গন্ধ সয়ে যাওয়া কত যে কষ্টকর ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ

www.amarboi.org

করা কঠিন। বর্তমানে বিজ্ঞান সম্মত শৌচাগারের বহুল প্রচলন হওয়য় ঐ অভিশাপ হতে শহর বাসী ও শহর তলীর মানুষ মুক্তি পেয়েছে। শহরায়নে নাগরিক দায়িত্ব ও কম নহে। নাগরিক অসচেতনার কারণে শহরায়নের অনেক কাজ মন্থর গতি হয়ে উঠে। শেরপুর শহরের উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে। কিন্তু নাগরিক সুখ সুবিধা এখনও গৌণ। ষষ্টধাপের মধ্যে, অবশিষ্ট কোন্ কোন্ কাজ সম্পন্ন হবে তা এই মুহূর্তে বলা সম্ভব নয়। তবে প্রাচীন এই শহরটির ঐতিহ্য রক্ষা ও বর্দ্ধিত জনসংখ্যার কল্যাণের স্বার্থে আলোচ্য মেয়াদ মধ্যে পৌরসভাটি প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করণসহ পানি সরবরাহ, একটি গন মিলনাতনও ষ্টেডিয়াম নির্মান, নালা-নর্দমা সচল করা, গ্যাস সরবরাহ ও দমকল প্রতিষ্ঠার কাজ সম্পন্ন করা উচিত হবে। এছাড়া বারদুয়ারী হাট সম্প্রসারণ ও সংস্কার করা, একটি পর্যটন কেন্দ্র ও মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়। বর্দ্ধিত জন সংখ্যার আবাসিক সমাধান ও বাণিজ্যিক এলাকা সম্প্রসারনের স্বার্থে শহরের একান্ত পার্শ্ববর্তী কয়েকটি মহল্লা, পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত করা হলে শহরায়নের আর একটা মাত্রা যোগ হবে।

নগরায়ন ক্ষেত্রে শেরপুরের গৌরবময় ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্ব সহ এখানকার পৌর সভাটির অবদান কম নহে। তবে এই সেদিন পর্যন্তও পৌরসভাটি যেরূপ জীর্ণ-বিশীর্ণ অবস্থায় ছিল, তাতে এর অতীত মলিনতাই কেবল ভেসে উঠে। কোঠা বাড়ীর শহর নামে খ্যাত এই পৌরসভার ভবনটি সেকেলে আট চালা টিন শেডের মাটির দেয়ালে নির্মিত ছিল। দেখে মনে হতো যেন আস্ত একটি গৃহস্থালীর গুদাম ঘর। এরপর ঘটনাক্রমে চেয়ারম্যান পদে তরুণ নেতৃত্বের সুবাদে অতীত মলিনতা দূরীভূত হতে থাকে। ১৯৮০ সালে জনাব মজিবর রহমান মজনু চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে তিনি শহরায়নের নতুন ধারা শুরু করেন। মেটো গুদাম বৎ আট চালা প্রাসাদটির স্থলে নতুন দর্শনীয় বহু কক্ষ বিশিষ্ট প্রাসাদটি নির্মাণ করেন। ১৯৯১ সালে পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান মরহুম গাজি রহমানের পুত্র জনাব জানে আলম খোকা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলে, তিনিও শহরটির উন্নয়ন কল্পে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। জনাব মজিবর রহমান মজনু তিন দফায় চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত হন এবং তৃতীয় দফায় এখন পর্যন্ত (১৯৯৮) তিনি উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন। জনাব মজনু সাবের আমলে পৌরসভাটি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয় এবং এর ফলে শহরায়নের বর্দ্ধিত গতি সঞ্চারিত হয়। পৌর অঙ্গন লাগোয়া স্থানে অবস্থিত ঝাড়ুদার পট্টিটি অপসারিত হওয়ায় এক্ষণে পরিচ্ছন্নতা সংরক্ষিত হওয়া ছাড়াও, মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাশ্ববর্তী স্থানে শিশু পার্কসহ শহীদ মিণার নির্মিত হওয়ায়, পৌরসভাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হওয়ার পরও সমগ্র পৌর এলাকা এখনও কাংখিত মানে উন্নীত হতে পারেনি। প্রাচীন এই পৌরসভাকে ১ম শ্রেণীতে উন্নীত করতে পারলে হয়তঃ উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষে উপনীত হওয়া সম্ভব হবে।

www.amarboi.org

গাজি মিঞার পীরপাল

পাক,ভারত, বাংলা উপমহাদেশ ছাড়া বিশ্বের আর কোন্ রাষ্ট্রে পীরপাল ও দেবোত্তর প্রথার প্রচলন ছিল বা আছে কি তা জানিনা। তবে আমাদের দেশে প্রথাটি অতীব গুরুত্ব সহই এখন পর্যন্ত চালু আছে। প্রথাটির পেছনে অবশ্য ধর্মীয় প্রবনতাই প্রধানতঃ কার্যকর। তখনকার দিনে হয়তঃ শাসক গোষ্ঠী, ধর্মীয় প্রবক্তাদেক, বাগে রাখার জন্যই প্রথাটি প্রবর্তন করেছিলেন। বস্তুতঃ পীর ও দেবোত্তর সম্পদ সাধারণ্যে বড় একটা কাজে আসেনা। সংশ্লিষ্ট খাদেম ও সেবায়েত গণই এগুলোর মুখ্য ভোক্তা রূপে বিধৃত ও স্বীকৃত হয়ে আস্ছে। পীর পাল সম্পদ, সংরক্ষণ ও আয়ন-ব্যয়ন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দাবীদার কতিপয় ব্যক্তি উহা দেখা শোনার নামে খবরদারি করে থাকে এবং বছরে একবার অল্প বিস্তর গণ খিচুড়ি বিতরণ করে, হিসাব নিকাশ চুকিয়ে দেয়। দেবোত্তর সম্পদ ও হয়তঃ এভাবেই ব্যয়িত হয়ে আস্ছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে, সেবক নামীয় কতিপয় স্বার্থপর লোকজন পীর পাল সম্পত্তিকে নিজেদের নামে স্থায়ী বন্দোবস্ত নিয়ে ফেলে। যেখানে পীর পাল সম্পতি এখনও উন্মুক্ত রয়েছে, সেখানে লুটেরা বাহিনী ভাগ বাটোয়ারা করে খাচ্ছে। পীরপাল সম্পদ দ্বারা কোন গঠন মূলক, উন্নয়নের কাজ হচ্ছে বলে মনে হয়না। সারা দেশ ব্যাপী এখনও বহুল পরিমাণ পীরপাল সম্পত্তি ও সম্পদ রয়েছে। এগুলোর সদ্ব্যবহার করতে পারলে, সমাজ কল্যাণ মূলক উল্লেখযোগ্য কাজ হতে পারে।

কথিত পীর পাল সম্পদ ও সম্পত্তি সরকারী রেকর্ড পত্র মাধ্যমে যুগ যুগ ধরে সংরক্ষিত হয়ে আস্ছে। এগুলোর কোন খাজানা খেরাজ দিতে হয়না। মুঘল আমলে পীরপাল সম্পত্তি বরাদ্দ করনের অনুকূলে সনদ লিখে দেয়ার নিয়ম ছিল। তাম্র পাতেও কোন কোন বিশেষ সনদ লিখে দেয়া হতো। শেরপুরের গাজি মিঞার পীর পাল দাবীদার খাদেমদের উর্দ্ধনতন এক ব্যক্তিকে এরূপ সনদ দেয়া হয়েছিল। বগুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানের মধ্যে শেরপুরের পীর গাজি মিঞার মেলা, অন্য কথায় কেল্লাপোষি মেলাই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।

www.amarboi.org

উক্ত পীরপাল সংক্রান্ত দলিলাদি ও এক ঐতিহাসিক স্বাক্ষর বটে। সেকালে দলিল পত্র ও মামলা মোকাদ্দমার রায়ও ঘোষনা ফার্সি ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হতো। চাউল ভাজার নির্যাস দ্বারা তৈরী অমোছনীয় কালীতে লেখা দলিলাদির ভাষা সহজে বোধগম্য না হলেও লিখন পদ্ধতি ছিল ভারি চমৎকার। আজ হতে ১৪০ বছর পূর্বে গাজি মিঞার পীরপাল সংক্রান্ত মোকদ্দমার ফার্সি ভাষায় লিখিত রায়টি প্রনিধান যোগ্য বটে। অযত্নের ফলে রায়টির হুবহু পাঠোদ্ধার করা কঠিন। তবে ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে উহার অংবিশেষ সন্নিবেশিত করা হলো। তখন ফার্সি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায়ও কিছু কিছু দলিল পত্র লেখা হতো। কিন্তু সেইগুলি যেন আরও অধিক দুর্বোধ্য ছিল। সংস্কৃতও ফার্সি ভাষার অধিক প্রয়োগও মিশ্রনের কারণে, তখনকার বাংলা ভাষা যেন একেবারেই নাম মাত্র হয়ে পড়েছিল। তাছাড়া বাংলাভাষায় লিখিত ঐ সব অসাবলীল দলিলে পরলোকগত ব্যক্তিদের পরিচয় বুঝানোর জন্য হিন্দু-মুস্‌লীম নির্বিচারে,সকল মৃত ব্যক্তির নামের পূর্বে ৺ চিহ্নটি ব্যবহার করা হতো। একই ভাবে নর ও নারী ভেদে হিন্দু মুস্‌লীম প্রত্যেক নামের মাথায়,শ্রী,শ্রী যুক্ত ও শ্রী মতির বোঝা চাপিয়ে দেয়া ছিল অপরিহার্য।

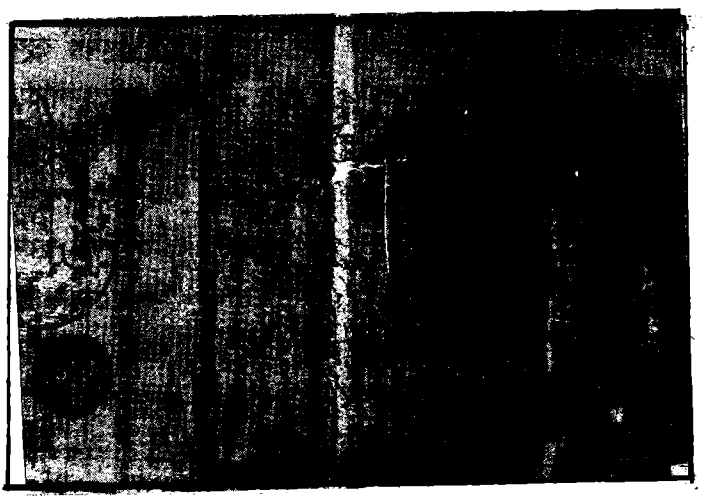

ইংরেজ শাসনামলের ফার্সিতে লেখা একটি মোকদ্দমার রায়

www.amarboi.org

গাজিমিঞার পীরপাল সম্পতির দাবীদার বর্তমান খাদেমদের নিকট হতে উল্লেখিত প্রাচীন দলিলগুলি পাওয়া গিয়েছে।

আলোচ্য খাদেমদের ধারা বাহিক তালিকা নিম্নরূপ ঃ

পীরগাজি মিঞা
মরহুম গরিবুল্লা মিঞা
মরহুম হোসেন আলী মিঞা
হরহুম খয়রাত আলী মিঞা
মরহুম আমজাদ মিঞা
কানু মিঞা- বাদল মিঞা
মরহুম হায়দার আলী মিঞা
রাজেক-রানা
মরহুমা তাইরন্নেছা বিবি
মরহুম তবিবর রহমান
মোঃ মজনুর রহমান মজনু
মোঃ আলতাফ মিঞা
মোঃ সামাদ মিঞা।

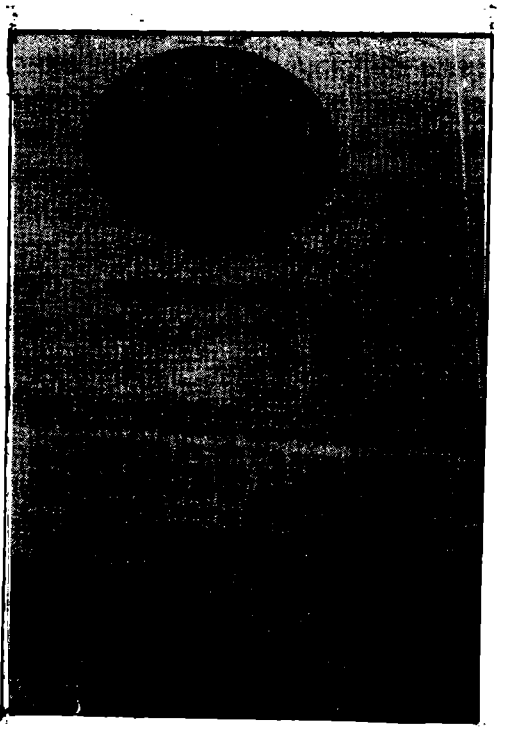

পীরপাল সংক্রান্ত ইংরেজ আমলে বাংলা লিখিত একটি ঐতিহাসিক দলিল

www.amarboi.org

যমুনা সেতুর আগে ও পরে।

চঞ্চলা যমুনাকে শাসন কৌশলে বাগে এনে নিজেদের ইচ্ছা মাফিক পরিচালিত ও প্রবাহিত করার জন্যে দেশের উত্তর জনপদের লোকজন বহুযুগ পূর্ব হইতে মনে মনে বিভিন্ন ধারনা ও আশাপোষণ করতো, কিন্তু প্রত্যাশা গুলো তখন বাস্তবায়নের কোন সূত্র খুঁজে পায়নি হেতু, উহা স্বপ্নাবেশও কল্পণাতেই থেকে যায় দীর্ঘকাল। আমাদের জাতীয় জীবনে যমুনার অবদান কিন্তু মোটেই তুচ্ছ নয়। তবে এর বেপরোয়া গতি মতি অতীতে নদী অধ্যুষিত অঞ্চলের অসংখ্য মানুষের বসত বাড়ি উজাড় করে দিয়েছে ভিটে ছাড়া করেছে। ক্ষ্যাপা যমুনা এক সময় আমাদেক তার বুকের তরতাজা পলিমাটি আর অঢেল মৎস্য ভান্ডার উপহার দিয়ে, চরাঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা কে স্বচ্ছন্দ করে তুলেছে। খুব বেশী দিনের কথা নয়, যখন এ নদীর গভীর জল ভেংগে কলকাতা হতে আসামের গৌহাটি পর্যন্ত বৃহদাকারের পণ্যবাহী জাহাজগুলো চলাচল করতো।

বঙ্গের প্রাণ কেন্দ্র ঢাকা মহানগরীর গুরুত্ব বর্তমানের ন্যায় অতীতেও ছিল একইভাবে অপরিসীম। সারা বঙ্গের উত্তর জনপদের লোকেরাও একই মাত্রায় ঢাকার অলিগলির সহিত অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্পৃক্ত ছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, তখনকার দিনের লোকজন যমুনার স্ফীত বক্ষ মাড়িয়ে উত্তর জনপদ হতে কচিৎপাড়ি জমাতে সক্ষম হতো। লক্ষ জন-মানুষের মধ্য হতে হাতে গণা দু'চার জন ছাড়া, অবশিষ্টরা জীবনে একবারও মহানগরীর চেহারা স্বচক্ষে দেখতে পারেনি। কাল ভদ্রে নৌকা যোগে জোট বন্দি হয়ে ভাটি স্রোতের টানে একবার ঢাকায় যেতে পারলেও উজান স্রোতে আবারও উত্তর বঙ্গে ফিরতে লাগ্‌তো প্রায় দশ পনের দিনে টানা সময়। দুঃস্থ অসহায় লোকেরা ঢাকার মোহে সুদূর হতেই বিমোহিত থাকতো আর জীবন সায়াহ্নে একবার অনুচ্চ স্বরে বলে উঠতো যে, একটা সরু সেতু হলেও গড়িয়ে গড়িয়ে ওখানে গিয়ে শেষ নিঃশেষ ত্যাগ করে মরেও ধন্য হতাম।

ফুলছড়ি আর বাহাদুরাবাদ ফেরিঘাটের বদৌলতে রেল চলাচল সুগম হওয়ায়, পরবর্তীতে পা মাড়াতে সক্ষম হয় বটে কিন্তু আসল ঝকমারিটা পুরো মাত্রায়ই থেকে যায়। দীর্ঘকাল পর যখন বাঘাবাড়ী, নগরবাড়ী, আরিচা- তরাঘাট, নয়ার হাট ইত্যাদি নাম গুলো উত্তর জনপদে কানে কানে ধ্বনিত হতে লাগলো, তখন হতেই চিরবঞ্চিত ও অবহেলিত উত্তর বঙ্গের ঘুমন্ত লোকজন, এক এক করে জেগে উঠে, ঢাকার পথে পা পা করে এগোতে লাগলো। পা পা করে এগোনোর উৎসাহে এবার সাঁ সাঁ করে ধাবিত হতে থাকে রাজধানীর পথে, কিন্তু নগরবাড়ী-আরিচার দীর্ঘ নদী পথ সহ বাঘাবাড়ী,তরাঘাট,নয়ার হাট প্রভৃতি ফেরিঘাটের পারাপারের ধক্কলে উৎসাহী যাত্রীদের গতিসীমা মন্থর হয়ে উঠে। এর পরও অদম্য উদ্যম অব্যাহতই থেকে যায়। কারণ, বহু প্রতীক্ষার পর ঢাকা যাতায়াতের

www.amarboi.org

www.amarboi.org

www.amarboi.org

যা হোক। সেতুটি চালু হওয়ার পর হতেই উত্তর পশ্চিম জন পদের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও ব্যবসায় বাণিজ্যে যে বর্দ্ধিত গতি সঞ্চারিত হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। সেই সঙ্গে দু'এক স্থানে বিশেষতঃ বগুড়া জেলার শেরপুরে কিছু অসুবিধা ও দেখা দিয়েছে। এখানে শহরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যস্ততম অথচ অপেক্ষাকৃত অপরিসর বাসষ্ট্যান্ডটি যেন এক অঘোষিত চলমান টার্মিনালে রূপান্তরিত হয়েছে। একেতো আগে থেকেই স্থানটি আবাসিক ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ঘনত্বে নিঃছিদ্র রূপ পরিগ্রহ করে আছে,তদুপরি এরই ফাঁকে ফাঁকে গড়ে উঠেছে চারটে প্রথম শ্রেনীর বড় মার্কেট, সিনেমা হল ও ছয়টি উন্নতমানের আকর্ষণীয় খাবারের হোটেল। এছাড়া বাসষ্টান্ড লাগোয়া স্থানে রয়েছে সোনালী ব্যাংক সহ পাঁচটি প্রসিদ্ধ ব্যাংক, ছোট খাট কলকারখানা, বিভিন্ন দোকান-পাট, কেন্দ্রীয় জামে মস্‌জিদ, স্থানীয় বাস ট্রাক, স্কুটার ভ্যান গাড়ি রিক্সা প্রভৃতি যান বাহনের দাঁড়াবার স্থান। প্রায় অর্দ্ধ কিলোমিটার প্রলম্বিত বাস ষ্টান্ডটির উভয় দিকে রয়েছে দু'টি ক্রসিং পয়েন্ট। সর্বোপরি ঢাকা,টাংগাইল,ময়মনসিংহ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ ও উত্তরাঞ্চলের বিভিন্ন জেলা হতে যাতায়াত কারী দূর পাল্লার যাত্রীবাহী বাস ও মালবাহী ট্রাকের অবিরাম আনাগণা।

সকাল ৯টা হতে বিকাল পর্যন্ত এ বাস ষ্টান্ডে দূরপাল্লার শত শত যাত্রীবাহী বাস এখানে দীর্ঘ বিরতি দিয়ে যাত্রীদের খানা পিনার সুযোগ করে দেয়। এরফলে গোটা স্থানটি লাগাতর অস্বাভাবিক জনাকীর্ণ হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় পায়ে হেঁটে চলার আর কোন সুযোগ থাকেনা। এরূপ অস্বস্তিকর অবস্থা নানা বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে।

এর একটা সমাধান খুঁজে বের করা আশু প্রয়োজন। বিজ্ঞ জনেরা হয়তঃ বাইপাস বা বিকল্প রাস্তা নির্মানের পরামর্শ দিতে পারেন কিন্তু ইহা আরও বিপর্যয় ও জনস্বার্থ বিরোধী ব্যাপার হতে পারে। হাযার হাযার মানুষের বসত বাড়ি উচ্ছেদ ব্যতীত এখানে বিকল্প রাস্তা নির্মানের কোন সুযোগ নেই। কাজেই উচিত হবে যে,সড়ক পার্শ্বস্থ অবশিষ্ট স্থান, মূল সড়কে অন্তর্ভূক্তকরে প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতঃ সড়কের মধ্যখান দিয়ে বিভাজন কংক্রিট প্রাচীর নির্মাণ করা। এরূপ করা হলে সমস্যাটির স্থায়ী সমাধান হয়ে যাবে। আর আপাতত এটিই হওয়া চাই।

www.amarboi.org

গ্রন্থসহায়িকা/শেরপুরের ইতিহাস

১। Inscriptions of Bengal, by Shams Uddin Ahmmed MA.

২। সিরাজগঞ্জের ইতিহাস- খন্দকার আবদুর রহীম

৩। দুই শতাব্দীর বুকে (বগুড়ার ইতিহাস প্রথম খন্ড) এ,কে,এম, শামছ উদ্দীন তরফদার

৪। বগুড়ার ইতিহাস- কে,এম, মেছের

৫। শেরপুরের ইতিহাস- হর গোপাল দাস কুণ্ডু

৬। বগুড়ার ইতিহাস- প্রভাষ সেন

৭। বাংলার ইতিহাস- আবদুল মান্নান তালেব

৮। বিশ্ব কোষ- মুক্ত ধারা প্রকাশিত

৯। Gazeteer of the Bogra District.

১০। মাসিক সুন্নৎ আল জামাত- মাওঃ রুহুল আমিন

১১। ভবানীপুর কাহিনী- বাবু তারিনী চরণ ঠাকুর

১২। চলনবিলের ইতিহাস- অধ্যক্ষ সরদার মোহাম্মদ আবদুল হামিদ

১৩। আজকের বগুড়া- আমানুল্লা খান

১৪। টাংগাইলের ইতিহাস- খন্দকার আব্দুর রহীম

১৫। পলাশী যুদ্ধোত্তর মুসলীম সমাজ ও নীল বিদ্রোহ- মেসবাহুল হক

১৬। রংপুর গেজেটিয়ার

১৭। সাপ্তাহিক মুসলীম জাহান

১৮। তাবাকতে আকবরী

১৯। গৌড় পান্ডুয়ার স্মৃতি কথা- অধ্যাপক কাজি মোঃ শহীদুল হক
,, মোঃ আবুল কাসেম ভূইয়া

২০। বিস্মৃত ইতিহাসের তিন অধ্যায়- মোঃ আবু তাহের

২১। Muslim Architecture in Bengal
Ahmad Hussain Dani, Dhaka University.

২২। ভস্তার বিল- সুবোধ চন্দ্র লাহিড়ী

২৩। একটি সার্থক জীবন- এ,কে এম- আবদুল আজিজ

২৪। বাংলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস- ফজল হাসান ইউসুফ

২৫। History of Bengal Voll- II, Muslim Period, Sir gadunath Sarker

২৬। তাবাকাতে নাসিরী- মিনহাজ-ই সিরাজ

২৭। রিয়াযুস সালাতীন- গোলাম হোসেন সলীম

২৮। বাংলার পুরাবৃত্ত- পরেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়।

২৯। শেরপুরের ইতিকথা (দশকাহনিয়া) অধ্যাপক মোঃ দেলোয়ার হোসেন

www.amarboi.org

লেখক পরিচিতি

লেখক শৈশবে ৩য় শ্রেণীতে অধ্যয়ন পর্যন্ত জন্মস্থান সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর থানার অন্তর্গত চর ডিক্রীদোরতা গ্রামে বসবাস করেন। জন্ম-সাল ১৯৪০, ১লা এপ্রিল। পিতামহ মরহুম ছমির উদ্দিন শেখ, জন্মসূত্রে সিরাজগঞ্জ সদর থানার অন্তর্গত ঐতিহ্যবাহী মেছড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পিতা মরহুম জামির উদ্দিন মোঃ আহসানুল্লাহ শেখ, আত্মীয়তা সূত্রে মেছড়া গ্রাম হতে কাজিপুর থানার চরডিক্রীদোরতা গ্রামে স্থানান্তরিত হন এবং ১৯৪৭ সালে সপরিবারে ভারতের আসাম প্রদেশের কামরূপ জেলার বড়পেটা মহকুমার অন্তর্গত, শৈলমারী গ্রামে বসবাস আরম্ভ করেন। এখানে অবস্থান কালে, লেখক স্থানীয় সোনাবাড়ী মাদ্রাসায় ভর্তি হয়ে অহমিয়া ভাষার মাধ্যমে লেখা পড়া করতে থাকেন। আসাম রাজ্যে অবস্থানের দু'বছর পর, ১৯৫০ সালে, সরকারের বাঙ্গাল খেদাও মার দাংগায় বিতাড়িত হয়ে সপরিবারে জন্মস্থানে ফিরে আসতে হয়। দু'বছর পর ১৯৫২ সালে তদানীন্তন সরকারের মোহাজের পূণর্বাসন কর্মসূচীর আওতায়, শেরপুর টাউন কলোনীতে পুণর্বাসিত হন। আসাম হতে বিতাড়িত হয়ে এসে ১৯৫০ সালে বগুড়া সদর থানায় অবস্থিত সুপ্রসিদ্ধ জোড়ানজমুলউলুম সিনিয়ার মাদ্রাসা হতে দাখিলী পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন এবং পরবর্তীতে উক্ত মাদ্রাসা হতে আলিম ও ফাজিল পরীক্ষায় কৃতিত্বের সহিত পাস করে ১৯৫৭ সালে বগুড়া মোস্তফাবিয়া আলীয়া মাদ্রাসায় কামিল শ্রেণীতে ভর্তি হন। ১৯৫৯ সালে উক্ত মাদ্রাসা হতে কৃতিত্বের সহিত হাদিস শাস্ত্রে কামিল পাস করে, পরবর্তী দু'বছর কাহালু ও শেরপুর সিনিয়ার মাদ্রাসায় চাকুরী করেন। ১৯৬১ সালে প্রাইভেট ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে, বগুড়া আজিজুল হক কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হন। এখান হতে ১৯৬৬ সালে বি.এ. অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ, শেষ বর্ষে ভর্তি ও ১৯৬৭ সালে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হতে মাষ্টার ডিগ্রী লাভ করেন। আজিজুল হক কলেজে অধ্যয়নকালে, পর্যায়ক্রমে ছাত্র সংসদের সমাজকল্যাণ সম্পাদক, এ,জি,এস ও ভি,পি পদে নির্বাচিত হয়ে ছাত্র আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য নেতৃত্ব প্রদান করেন। তা ছাড়া উক্ত কলেজ হতে ১৯৬৪ সালে, পাক-ভারত শিক্ষা সফরের অংশ হিসেবে কলকাতা, আগ্রা, দিল্লী, অমৃতসর লক্ষ্ণৌ, লাহোর, মহেনজোদারো, করাচি, পেশাওয়ার প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। মাষ্টার ডিগ্রী লাভের পর ১৯৬৭ সালে শেরপুর কলেজ প্রতিষ্ঠা কল্পে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং প্রতিষ্ঠাকাল হতে পর্যায়ক্রমে প্রভাষক ও উপাধ্যক্ষ পদে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। ঐ সালে হানাদার বাহিনী কর্তৃক প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ, শ্রদ্ধেয় মুহসীন আলী দেওয়ান নিহত হলে ১৯৭৩ সাল পর্যন্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং অতঃপর অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত হন। লেখক বাল্যকাল হতেই সংবাদ-পত্র ও সাংবাদিকতার সংস্পর্শকে পছন্দ করতেন। ছাত্র-জীবনে অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক জাহানে নও ও পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা দু'টিতে অনিয়মিত সংবাদ পরিবেশন করতেন। অতঃপর, জাতীয় দৈনিক সংগ্রামের নিজস্ব সংবাদ দাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। জাতীয় ও স্থানীয় দৈনিক সহ বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রায় শতাধিক গবেষণা ও সংস্কারমূলক লেখা প্রকাশিত হয়। তাছাড়া সাহিত্য পত্রিকায়ও লিখে থাকেন। ছাত্র জীবনে "যে চাঁদ মেঘ আড়ালে" নামে একটি পূর্ণাংগ সামাজিক উপন্যাস রচনা করে তা প্রকাশ নিমিত্ত প্রেসে দিলে উহা উধাও করা হয়। এছাড়া সিরাত স্মরণিকা নামে দু'দফায় দু'খানা মূল্যবান সংকলন তার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। শেরপুরের ইতিহাস প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো গ্রন্থ আকারে প্রকাশের ইচ্ছা রয়েছে। এতদ্ব্যতীত ইসলাম ও মুসলীম সমাজ ভিত্তিক লেখা অব্যাহত আছে।

শিক্ষকতা জীবনের শুরু হতেই শিক্ষা উন্নয়ন ও শিক্ষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের আন্দোলনে শরীক আছেন। বাংলাদেশ বেসরকারী কলেজ শিক্ষক কেন্দ্রীয় সমিতির শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক হিসাবে একাধিকবার দায়িত্ব পালন করেছেন এবং এখন পর্যন্ত সমিতির জেলা শাখার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত আছেন। শেরপুর প্রেসক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দীর্ঘ দিন দায়িত্ব পালন করেছেন। শেরপুর সাহিত্য চক্র, সাহিত্য পরিষদ ও অন্যান্য সাহিত্য কর্মের সহিত জড়িত আছেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের বর্দ্ধিত কামনা পূরণ না হলেও শিক্ষার বিভিন্ন মুখীতাকে অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে মাতৃভাষা ছাড়া ইংরেজী আরবী, উর্দ্দু, ফার্সি ও অহমিয়া ভাষায় অল্প বিস্তর চোখ বুলাতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। লেখক স্থানীয় সমাজ সংস্কার মূলক কাজে আত্মনিয়োগে প্রয়াসী বটে কিন্তু নানা সীমাবদ্ধতা হেতু অবদান খুবই কিঞ্চিৎকর। লেখক আল্লাহ তায়ালার করুণা সহ সমাজের সর্ব স্তরের মানুষের আন্তরিক দোয়া কামনা করেন।

বিমূর্ত, '০৯